দ্বিতীয় সংস্করণ : মে : ১৯৬০ । কবিপক্ষ : ১৩৬৭

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০ ০০৭ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দশ বছর পূর্বে যখন প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়, তখন মন চলে গিয়েছিল অন্যত্র—বাংলা উপন্যাস নিয়ে লেখালেখি করছিলাম—যার ফল 'কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঞ্চাশ বছর'। নোতুন সংস্করণের অর্থ পুনর্মুদ্রণ নয়, আদ্যোপান্ত সংশোধন পরিবর্ধন পরিমার্জন। এই সত্য থেকে বিচ্যুত হতে চাই নি বলে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হ'ল। প্রস্তুত সংস্করণকে সম্পূর্ণ নোতুন গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হবে না। পূর্ব সংস্করণে প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল বারো, বর্তমান সংস্করণে একুশ। পূর্ব সংস্করণের একটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বর্জিত ('রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা'), তার পরিবর্তে এলো সম্পূর্ণ নোতুন প্রবন্ধ। বাকি প্রবন্ধগুলি পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত। বর্তমান সংস্করণে যুক্ত হ'ল ন'টি প্রবন্ধ। তার মধ্যে চারটি নব সংযোজন—'পঞ্চভূত', 'চিত্রা', 'পুনশ্চ' ও 'শেষ সপ্তকে'র উপর আলোচনা। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধ পূর্বে অন্যগ্রন্থ- ও পত্রিকা-ভুক্ত : প্রস্তুত সংস্করণে পরিবর্ধিত মার্জিতরূপে সংযুক্ত—'রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকা', 'ছিন্নপত্রাবলীর রবীন্দ্রনাথ', 'কাব্যাদর্শের বিরোধ : রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল' এবং 'কালান্তর' ও 'মানুষের ধর্ম'-এর আলোচনা।

রবীন্দ্র-মনীষার বিচিত্র বিকাশের প্রতি আলোকপাত এই গ্রন্থের লক্ষ্য। এ কারণে যতটা সম্ভব বিচিত্র পথে আলোচনাকে প্রসারিত করে দিতে চেয়েছি।

শহর কলকাতার জীবনে অভূতপূর্ব প্লাবন, পরিবহণ- ও বিদ্যুৎ-সংকটের মধ্যে সাহিত্যপ্রাণ প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক হাসিমুখে গ্রন্থ-প্রকাশনার যাবতীয় দায় বহন করে লেখককে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়ে লেখককে ঋণী করেছেন শ্রীমান ধ্রুবগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম এ.।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-দর্পণ ঃ

রবীন্দ্র-সাহিত্য-দৃষ্টি ঃ

রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য ঃ

রবীন্দ্র-পত্র ও স্মৃতিকথা ঃ

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ ঃ

রবীন্দ্র-গদ্য-সাহিত্যতত্ত্ব-কাব্যরীতি ঃ

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতি ঃ

রবীন্দ্র-কাব্য ঃ

পরিশিষ্ট ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ / রবীন্দ্র-দর্পণ

১

রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়

এক

সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এক ভাষণে বলেছিলেন, "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"

আর আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে প্রবেশের লগ্নে এক রচনায় লিখেছিলেন, "আমি সাধু নই সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগল আমার।"

জীবনপ্রেমী কবি—এই হল রবীন্দ্রনাথের সার্থকতম পরিচয়। বস্তুতঃ এর চেয়ে সার্থক আর কোনো অভিধায় রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা সম্ভব বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু আত্মপরিচয়দানে উৎসুক যে কবি, তাঁর কাছে আমরা যদি ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী প্রত্যাশা করি, তাহলে নিশ্চিত ভুল করব। আধুনিক ত্বরা-তাড়িত পশ্চিমের প্রতি কবির মনোভাব সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না এবং একাধিকবার সে-কথা বলেছেন। সংসারের উত্তেজনা, কীর্তি, খ্যাতি ও আধুনিকতার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' পশ্চিমী প্রথার আত্মপরিচয় নয়, এতে ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ় কাহিনী উদ্ঘাটনের প্রয়াস নেই, চাঞ্চল্যকর গোপন তথ্য প্রকাশের উত্তেজনা নেই, অহং-এর স্ফীত অভিমানকে বড়ো করে দেখবার ঝোঁক নেই। বস্তুতঃ ও-পথে গেলে আমরা কবিকে ও তাঁর সত্য পরিচয়কে পাব না।[১]

জীবনী-রচনার ক্ষেত্রেও তাই, পশ্চিমী প্রথায় জীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না, সে-কথা তিনি বলেছেন। 'জীবনস্মৃতি'র ভূমিকাস্বরূপ কবি এ-কথাই লিখেছেন, "এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।" তাই কবির নিষেধাজ্ঞা 'কবিরে খুঁজিছ তাহারি

জীবনচরিতে ?' আর 'জীবনস্মৃতি'র শেষে মন্তব্য করেছেন, "মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।"

'জীবনস্মৃতি'র এই বক্তব্যই একটি সংহত বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের সূচনায়—'আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।' তাই জীবনকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন ও তাঁর জীবনকে যিনি রচনা করে চলেছেন, তাঁকে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়ে'র এই ভূমিকা।

ভারতবর্ষ ও য়োরোপের জীবন-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়, এই সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারলে 'আত্মপরিচয়ে'র মর্মসত্য অনুভব করা যাবে না। তাই গোড়াতেই এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করি।—

"য়ুরোপে মানুষের জীবনে দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা, তাহার পরে সংসারে কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু, কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা, কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্য স্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা, কোথাও ঘরে না পৌছানো। এইজন্যই জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase—শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।...

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্য স্থাপন করি তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এত বড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এত বড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ-কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ-কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে; সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যুর দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইষ্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, একথা ঠিক; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউ-খেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের সংসার-লীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল।...

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।" [ততঃ কিম্, 'ধর্ম']

আসল কথা এই, রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও জীবন একসূত্রে গেঁথেছেন এবং কর্ম অপেক্ষা ধর্মকে, কীর্তি অপেক্ষা ধ্যানকে, মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেবল মানবসংসার নয়, বিশ্বপ্রকৃতি কবির উপজীব্য: এ-কথা রবীন্দ্রনাথ কখনোই বিস্মৃত হন নি, এ-কারণে বস্তুসত্য অপেক্ষা ভাবসত্যকে, সাংসারিক দুঃখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মুক্তিকামনাকে বড় বলে মনে করেছেন। এবং খুব স্পষ্টভাষায় কবি বলেছেন, "জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে; জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে; যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।" [আত্মপরিচয়—প্রথম প্রবন্ধ]

দুই

'আত্মপরিচয়' নানা কারণে মূল্যবান। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তন, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম, তাঁর গভীর মানবপ্রীতি, তাঁর ধর্মবোধ অর্থাৎ দুঃখদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকে ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনকে সত্য বলে জানবার সাধনা আন্তরিকভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

'আত্মপরিচয়ে'র প্রথম প্রবন্ধ ['বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত] রবীন্দ্র-কাব্যের বিবর্তন ও জীবনদেবতা-সম্পর্কিত আলোচনার উৎসভূমি। আজ পর্যন্ত

রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনায় এই প্রবন্ধ আমাদের মুখ্য অবলম্বন। এটিকে উপলক্ষ করেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, তা এখানে স্মর্তব্য : "যে-আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে—আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো একরকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে-কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা অহংকার নহে, কারণ ইহা কাহারও একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবনবিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।"

এই প্রত্যুত্তরে বিশ্বাসের শক্তি ও প্রকাশের সাহস ব্যক্ত হয়েছে। সুদীর্ঘকালের কাব্যরচনার ধারা পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যে উপনীত হয়েছেন, "এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।···তাহাদের (কবিতাগুলির) রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন।···এই যে কবি, যিনি আমাদের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

এই কাব্যবিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ জীবনসত্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং ছিন্নপত্র, সোনার তরী, চিত্রা ও নৈবেদ্য থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের টেস্টামেণ্ট রূপে এই প্রবন্ধটিকে গ্রহণ করা যায়। প্রকৃতিরূপমুগ্ধ কিশোর কীভাবে জীবনসত্যকে উপলব্ধি করলেন, সংশয়-বেদনাদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে কীভাবে শান্তিকে পেলেন ও হারালেন, তার বিচিত্র ইতিহাস প্রথম প্রবন্ধের অনুস্মৃতিতে তৃতীয় প্রবন্ধে ['আমার ধর্ম'] প্রকাশিত হয়েছে। এ'দুটি প্রবন্ধকে একত্র করে রবীন্দ্রকাব্য ও নাট্যের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'উৎসর্গ', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'অচলায়তন' প্রভৃতি কাব্য ও নাটকে কবিমানসের বিস্তৃততর ও ব্যাপকতর পরিচয়টি সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

'ছিন্নপত্র'-'সোনার তরী' থেকে 'উৎসর্গ', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'রাজা' 'অচলায়তন' পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে গদ্য, কবিতা ও নাটকের বিচিত্র সমৃদ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে যে মহৎ জীবনশিল্পী নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তারই অন্তরঙ্গ পরিচয় এই দুই প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মহৎ কবি ও মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাই পঞ্চম প্রবন্ধটিতে। কবি বলেছেন, "আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা-ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তাঁর স্থূল মাংস।"

'মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ এখানে নিপুণভাবে নির্ণয় করেছেন। প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধের আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্যকে দেখলে আমরা এক মহৎ সাহিত্যসাধনা ও একজন মহৎ কবিকে পাই। তা আমাদের পরম লাভ। এই প্রবন্ধদুটি রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রবেশক রূপে গণ্য হতে পারে।

কেবল রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করেই আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহের সমাপ্তি ঘটে না। জীবনদেবতা-তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা প্রথম প্রবন্ধে পাই। কাব্যসাধনা সচেতন প্রয়াস নয়, তা অন্তরালবর্তী নিয়ন্তার ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন: এই ভাবটি এখানে বড় হয়ে উঠেছে। জীবনকে তিনি কর্মের দাপট বলে মনে করেন নি। 'করা' অপেক্ষা 'হওয়া'কেই জীবনের কাম্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

আর রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় মানসসুন্দরী-জীবনদেবতা-লীলাসঙ্গিনী-প্রাণেশ-মধুর-হাসিনী-বিদেশিনী-রহস্যময়ী প্রভৃতি নামে ভূষিত যে কবিজীবন-নিয়ন্তার বারবার উপস্থিতি লক্ষ্য করি, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় কবি এখানেই উদ্ঘাটন করেছেন।

'চিত্রা', 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি যাঁকে বরণ করেছেন, এখানে তাঁকে আরতি করে বলেছেন, "আমার অন্তর্নিহিত যে-সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে-শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসঙ্গে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া

বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম :

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।"

কবি এখানে ক্ষান্ত না হয়ে আরো বলেছেন,

"কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব।"

রবীন্দ্রসাহিত্যে কসমিক চেতনার সূত্রপাত হয়েছে এখানে।

তিন

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য : রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রকৃতিপ্রেম এতে ব্যক্ত হয়েছে। কবিমানসের বিচিত্র আত্মোদ্ঘাটনের একটি ধাপ : প্রকৃতিপ্রেম।

'নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা' কবিমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ছিন্নপত্র ও সোনার তরী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের সার্থক পরিচয়ভূমি, আত্মপরিচয়ে তারই সানন্দ স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি গদ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারেন নি বলেই কবি বারবার ছিন্নপত্রের আশ্চর্যসুন্দর পত্র ও সোনার তরীর অনুরাগসিক্ত কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন।

আশ্চর্য লাগে, অনুরাগসিক্ত ছত্র ও চরণগুলিতে প্রকৃতিপ্রেম কত তীব্র, কত গভীর!

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে। কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! অত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতর ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না।"

এই ব্যাকুল আকর্ষণের পর কবির স্বীকৃতি, "পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমিই মুগ্ধ, সেই মোহে আমাব মুক্তিরসের আস্বাদন।" রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান প্রত্যয় এই সংহত মন্তব্যে প্রকাশিত।

। এই প্রকৃতিপ্রেমের অপর দিক মানবপ্রেম—সংসারপ্রীতি। পঞ্চম প্রবন্ধে কবির কি আশ্চর্য আনন্দময় স্বীকৃতি: "আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্ররসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণমতং তত্তে পশ্যামি।" ।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের দিব্য অগ্নিস্পর্শে সাধারণ গদ্যবিবৃতি অসাধারণ কাব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

। প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে আপন পরিচয় দিয়েছেন এই বলে, "আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুলপাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র

রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।"

চঞ্চলের লীলাসহচর রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে।

চার

মানবপ্রেম : সংসারপ্রীতি—রবীন্দ্রমানসের অপর পরিচয়। সে পরিচয়ের স্বাক্ষর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে ছড়ানো রয়েছে।

পঞ্চম প্রবন্ধে কবির মানবপ্রেমের টেস্টামেণ্ট পাই—"আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।···আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।" পুনশ্চ-কাব্যে ও মানুষের ধর্ম ও Religion of Man ভাষণে যে মানবতার জয়ধ্বনি, এখানে তারই প্রতিধ্বনি শুনি।

এই গ্রন্থের শেষ (ষষ্ঠ) প্রবন্ধে 'আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে' দাঁড়িয়ে একই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ নোতুন করে উপস্থিত করেছেন, বলেছেন, "মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদয়াচলে সেই জ্যোতিঃপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম। এই আশ্রমে একদিন যে-যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেখানকার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে অতিথিদেবো ভব। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা।"।

নরদেবতাকে সংসারের সকল ক্ষেত্রে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তারই উজ্জ্বল উপস্থিতি।

পাঁচ

'আত্মপরিচয়ে'র অপর প্রধান পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের বিস্তৃত ব্যাখ্যান। দুঃখদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকে ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে সত্য বলে জানবার সাধনাকে কবি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সোনার তরী-কল্পনা-নৈবেদ্য-উৎসর্গ-খেয়া-গীতালী

কাব্য ও শারদোৎসব-রাজা-অচলায়তন-ফাল্গুনী নাটকের বক্তব্যকে কবি তাঁর বক্তব্যে সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর-একদিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর-একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর-একদিকে মুক্তি।"[১] ['আমার ধর্ম'; তৃতীয় প্রবন্ধ]

[১] এই সাধনপথে দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। ধর্মসাধনায় "যে-আনন্দ, সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। · ধর্মবোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ এই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে।···· ·ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে! সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।"[১] [তদেব]

সেকারণেই কবি জ্যোতির্ময়কে অভ্যর্থনা করেছেন এই বলে,—

এস দুঃসহ, এস এস নির্দয়
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
['নূতন প্রভাত', উৎসর্গ]

'শান্তিনিকেতন' ভাষণ-সংকলনে জীবন ও মৃত্যু, শক্তি ও প্রেম, স্বার্থ ও কল্যাণে যে দ্বন্দ্ব, তার সত্যকার সমাধানের পথনির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন, "জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায় যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।"

জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথ আর বলেন নি। ফাল্গুনী, পূরবী, পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী, শান্তিনিকেতন, প্রাচীন সাহিত্য, খেয়া, উৎসর্গ, প্রান্তিক,

শেষসপ্তক, রোগশয্যায়, জন্মদিনে, শেষলেখা : রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্র পথে এই এক বক্তব্যই উপস্থিত। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে-প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে-শান্তি, তা বন্ধন, তা-ই মৃত্যু, সেজন্যেই তা অগ্রাহ্য। শারোদৎসব নাটকে কিশোর উপনন্দ দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই হল সত্যকারের সাধনা। নিরন্তর বেদনায় আত্মোৎসর্জনের দুঃখই আনন্দ, তাই শ্রী, তাই উৎসব। আবার, ধর্ম কী ?—এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, "অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ-কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন-করা আনন্দ নয় দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গল রূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়; তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে তাকে অস্বীকার করে নয়।"

এই বক্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এ-ধরনের কবিতা তিনি নিজেই খুব কম লিখেছেন। কবির কথাতেই তা উদ্ধার করি, "ইহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই মৃত্যু নেই. কিন্তু যে-স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে-স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়, তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তোমার নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ এই কঠিন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল কাব্যজীবনে নয়, ব্যক্তিজীবনেও কবি এই দুঃখ আবাহনে কখনো পশ্চাৎপদ হন নি, দুঃখের মধ্যেই

আনন্দকে আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের আলোয় রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় আলোকিত হয়ে আছে।

চঞ্চলের লীলাসহচর রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' আশ্চর্য গ্রন্থ। গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধির উপর আত্মপরিচয়ের সত্য প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চাশ থেকে আশি: এই তিরিশ বছরের মধ্যে লেখা ছ'টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-পরিচয় এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তার আলোকে কবিকে আরো মহনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু কবি কখনো মহত্ত্বের নিঃসঙ্গ শিখরচূড়ায়—পরিচিত পৃথিবী থেকে বহুদূরে—অধিষ্ঠান করতে চান নি। তিনি এই মর্তসংসারের জীবনস্রোতে ভেসে যেতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধের শেষ ক'টি বাক্যে মর্তমমতার সুন্দর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তা উদ্ধার করে 'আত্মপরিচয়ের' পালা শেষ করছি। কবি বলেছেন, "লীলাময়ের ছন্দ মিলিয়ে [আশ্রমের] এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর হতে আমি পারব না; শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যারা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধূলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু,-আমি কবি।"

'আত্মপরিচয়' এই মর্তানুরাগের আলোয় দীপ্ত। বর্তমান গ্রন্থ রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, রবীন্দ্রমানসের দর্পণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ / রবীন্দ্র-সাহিত্যদৃষ্টি

২

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য

এক

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য-সাধনার যে সম্পদ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তার যোগফল অপেক্ষা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বেশি, এ-কথা নিরপেক্ষ রসিক পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। এক এক সময় ভাবি যদি রবীন্দ্রনাথ না থাকতেন তা হলে বাংলা সাহিত্যের অবস্থাটা কী দাঁড়াত? বস্তুত আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, লালিত হয়েছি এবং বেড়ে উঠেছি; বিশ্বের দরবারে জোর করে বলতে পেরেছি—'বাঙ্গালী আজ গানের রাজা, বাঙ্গালী নহেক' খর্ব'। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ কতদূর, সে-কথা অগ্রণী কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন: "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মান নি এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সুদ্ধ তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায়নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত তাঁর দ্বিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থান্তর ঘটেছে তা এই: তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র। ফসলের জাত বদ্‌লাতে পারে নি!" ['কুলায় ও কালপুরুষ', পৃঃ ৮] বাংলা সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা পুরুষ রূপেই রবীন্দ্রনাথ আগামী একবিংশ শতাব্দে স্বীকৃত হবেন, এ-কথা বলা যেতে পারে। বিচার্য এই: হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করেছেন? প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ কতটা? তাঁকে প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ অঙ্গ মুগ্ধ করেছে?

এ সম্বন্ধে ভেবে দেখলে মনে হয়, বৈষ্ণব কবিতা ও লোকসংগীত ছাড়া প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শাখা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ করে বাল্মীকি ও কালিদাস এবং ইংরেজি সাহিত্য—বিশেষ করে রোমান্টিক রিভাইভাল্ পর্বের কাব্যসাধনার দ্বারা বিশেষ ভাবে

প্রভাবিত হয়েছেন। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিমুখতার কারণ আলোচনা করলে রবীন্দ্রচরিত্রের উপরে নোতুন ভাবে আলোকসম্পাত করা যেতে পারে বলে' আমার ধারণা।

বাংলা সাহিত্য রসপরিণতি লাভ করে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণায়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন ; তার আগে বাংলা সাহিত্যের নাবালকত্ব ঘোচেনি বলেই তাঁর ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ এই পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভাণ করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেথান হইতে হউক, যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।" [বাস্তব —'সাহিত্যের পথে']।

বিশুদ্ধ স্বদেশী সাহিত্য ও খাঁটি বাঙালি কবিত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তা এই কথায় বোঝা যায়। সাহিত্যে বিদেশী প্রভাবের অনুযোগ যাঁরা তোলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেছেন, "বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়, তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্যে য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত। বাংলা-দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেবকাওয়ালি অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না। তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত ; যাঁরা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরী হয় এই কারণেই প্রতিভার

ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।"
[সাহিত্য বিচার—'সাহিত্যের পথে']।

আশা করি এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির পর আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাকে সাগ্রহে সমস্ত অন্তর দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন।

দুই

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচার নানা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এই বিচারের সূত্রটি কবি নিজেই উপস্থিত করেছেন,—"আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতি-নির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, আর আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে।...নীলনদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন—যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি।" [সাহিত্য বিচার—'সাহিত্যের পথে']।

সাহিত্যপ্রেরণার ভূগোল নেই এবং সাহিত্যরচনার জাতিবিচার নেই—এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-দর্শনের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কর্মকলহের ও আধ্যাত্মিক অরাজকতার মূল সন্ধান করেছেন বৌদ্ধযুগের পরবর্তী ভারতবর্ষে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন, "এক কালে ভারতবর্ষে প্রবলতা-প্রাপ্ত অনার্যদের সহিত ব্রাহ্মণ-প্রধান আর্যদের দেবদেবী ক্রিয়াকর্ম লইয়া এই-যে বিরোধ বাধিয়াছিল সেই বহুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্যন্ত বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য']।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'মেয়ে-দেবতার' প্রবল প্রতাপ ও যথেচ্ছাচার প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে উচ্চতর ভাব বা সাহিত্যকর্ম আশা করে লাভ নেই, একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। শিবের বিরুদ্ধে শক্তির লড়াই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু; এই লড়াই বিদ্রোহের ঝড়, নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতর ঝড় রূপে দেখা দিয়েছিল। মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য শক্তির উপাসনা ও বন্দনামূলক সাহিত্য; এর জোর ভয়ের জোর, ছলনার জোর, প্রতিহিংসার জোর। "কিন্তু কী আধ্যাত্মিক, কী আধিভৌতিক, ঝড় কখনোই চিরদিন থাকতে পারে না। ..তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তনব্যাকুল দুর্গতির

দিনে শক্তিপূজারূপে এই-যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্রকঠিন শক্তিকে যদি বা প্রাধান্য দেয় শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মী রূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে—দরিদ্র বাঙালির ঘরে রসসঞ্চার করিয়াছেন।" [তদেব]

মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব কাব্যের জয় প্রমাণিত হল, "ভক্তির পথ কখনোই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না; প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে।···চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।" [তদেব]

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রবীন্দ্রনাথ শাক্ত মঙ্গলকাব্যকে ভৎর্সনা করেছেন, শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলীকে অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে এই অনুরাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

বৈষ্ণব কবিতার উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী।···এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন।···বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে।" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য']।

এরপরে রবীন্দ্রনাথ একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস স্থায়ী হল না কেন? তিন শতাব্দের জীবনে প্রেরণানিঃশেষিত হয়ে ব্যর্থ অনুকরণের মরুবালুতে শুষ্কতায় পর্যবসিত হল কেন? "কারণ এই যে, ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলা দেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।" [তদেব]। অনুরূপ কথা কবি অন্যত্রও বলেছেন, "আমাদের সাহিত্যে ভোজের আয়োজন পনের আনা, শক্তির আয়োজন এক আনা।" ['শিক্ষার বিকিরণ']।

"বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, আর দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাইরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য')। ভাবের স্রোতকে স্থায়ী করার মতো চরিত্রশক্তির অভাব আছে বলেই সেদিন এই দুই ধারা স্থায়িত্ব অর্জন করেনি, মহত্ত্বে উন্নীত হয় নি। 'দুঃখক্লেশকে ভাঙিয়ে ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা' গড়ার কাজে মানবচিত্তের সকরুণ বেদনা আছে বটে, কিন্তু তা সাহিত্যকে তার বিশেষ দেশকালের বাইরে নিয়ে যেতে পারে না, এজন্যই তা মানবমুক্তির বাহক হতে পারে নি।

বাংলার সাহিত্যে এই চরিত্র ও পৌরুষের পরাজয়, মেয়ে-দেবতার বিজয় এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অসংযত বিস্তারকে রবীন্দ্রনাথ বার বার ভৎর্সনা করেছেন। বাংলার গ্রাম্যছড়া, রাধাকৃষ্ণ ও শিবদুর্গা-বিষয়ক ছড়ার আলোচনায় এই ধারণার সমর্থন পাই।

রবীন্দ্রনাথ কঠোর তিরস্কার করেছেন এই কথায়—"বাংলার গ্রাম্যছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসার সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণকথার একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত।···সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমনি শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।" [গ্রাম্য-সাহিত্য—'লোক-সাহিত্য']।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে নারীস্বভাব ক্রন্দনশীল রামচন্দ্রকে পাই, তিনি 'নরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ' বলে মনে হবার কোনো কারণ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে জাতীয়

কাব্য বলা হয়—বাঙালী জাতির ক্রন্দনশীলতা, নমনীয়তা, ঔদরিকতা, অশ্লীলতাপ্রীতি, ভীরুতা, হীনতা, চাটুকারিতা, অনৈক্য—সবই কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণে ও অপরাপর রামায়ণকাব্যে আছে। তা থেকে শিক্ষা পাবার মত বিশেষ কিছু নেই। বাংলার রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্যের মেয়ে-দেবতার হীন ষড়যন্ত্র ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাস—এগুলি রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে সমর্থন করে—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে চরিত্রের শোচনীয় অভাব ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের উপরিধৃত মন্তব্য নতমস্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তিন

প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য এবং কবিগান। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালা, দুই পক্ষকেই ভৎ‍র্সনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" [কবি সংগীত], তথাপি এ'কথাও বলেছেন, "বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছেন সে সুড়ঙ্গ মধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস।" [গ্রাম্য সাহিত্য—'লোকসাহিত্য']।

রবীন্দ্রনাথ কঠিনতম ভৎ‍র্সনাবাক্য উচ্চারণ করেছেন কবিগানের প্রতি। তর্জা, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়া-কবি প্রমুখ কবি-সংগীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। কবিগানের অগভীরতা ও লঘুতাকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নি এবং একে পাস-মার্কা দিতে রাজী ছিলেন না। সেজন্যই তিনি মন্তব্য করেছেন, "উপস্থিত মত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে; ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববর্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ।...আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য

এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। বারংবার রাধিকা এবং রাধিকার সখীগণ কুব্জাকে অথবা অপরাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র সরস পরিহাসে শ্যামকে গঞ্জনা করিতেছেন। তাঁহাদের আরও একটি রচনার বিষয় আছে, স্ত্রী-পক্ষ এবং পুরুষ-পক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-প্রকাশ-পূর্বক দোষারোপ করা, সেই শখের কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্কার জন্মে।" [কবিসংগীত,-'লোকসাহিত্য']। তিনি আরও বলেছেন, "বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।" [সাহিত্যবিচার—'সাহিত্যের পথে']।

কবিগান ও পাঁচালীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো দুর্বলতা ছিল না। কোনো কোনো মহল থেকে এগুলিকে বিশুদ্ধ জাতীয় সাহিত্যসম্পদ বলে চালাবার ও উচ্ছ্বসিত হবার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তা এখানে ধিক্কৃত হয়েছে।

এই নিম্নরুচি ও শব্দচাতুরি যেখানে দেখা যায় সেখানেই সাহিত্যগুণের শোচনীয় অভাব ঘটে, একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। আর সেই কারণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেও ধিক্কার দিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের সাহিত্যের প্রথম ডিক্টেটার ছিলেন, 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা মারফত আধুনিক সাহিত্যের প্রথম পর্বকে তিনি চালনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু ও মনোমোহন বসু তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করেছিলেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করে বলেছেন, "বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।" [বঙ্কিমচন্দ্র—'আধুনিক সাহিত্য']।

সাহিত্যে নিম্নরুচি ও সস্তা মনোরঞ্জন-বিদ্যাকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সমর্থন করেন নি, এইজন্যই মঙ্গলকাব্যের কবিকুল, কবিওয়ালা, ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুকে প্রশংসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

চার

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় মনকে সব রকম যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে তিনি সেই বুদ্ধির উদ্বোধনের ধারাটি দেখিয়েছেন। তথাকথিত 'ন্যাশনাল' সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। যেখানে বুদ্ধির মুক্তি ও মনের স্বাধীনতাকে পেয়েছেন, সেখানে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন। ভাব-সৃজনের শক্তিই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই রক্ষা করার শক্তি। এই শক্তির আধার চরিত্র। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রের শোচনীয় অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক বলে নয়, চরিত্রবলে ও স্বীকরণ-ক্ষমতায় বলীয়ান বলেই রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করেছেন। এই শক্তিকেই তিনি প্রতিভা বলে মনে করেন আর তা পেয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে। তাই কেবল এই চারজনকেই তিনি স্বীকার করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে, সেজন্যই তা অভ্যর্থনীয়। ইংরেজ শক্তি এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের ফলে বর্তমান কালের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপিত হওয়াকে তিনি শুভকর বলে মনে করেছেন।

ইংরেজ রাজ্যবিস্তার "উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানব চিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।··· পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস।.. এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।......চিত্তসম্পদকে

সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।" [বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—'সাহিত্যের পথে']

সত্যের কোনো জিওগ্রাফি নেই, শিল্পপ্রেরণার কোনো সংকীর্ণ সীমা নেই, তাই পশ্চিমী সংস্কৃতির সত্য ও সাহিত্যের প্রেরণা আমাদের পক্ষ থেকে যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নমস্য। রবীন্দ্রনাথ যে চারজন বাঙালির মধ্যে পশ্চিমের চিত্তসম্পদকে আপন বলে স্বীকার করার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন, এবার তাঁদের কথায় আসা যাক।

নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি ও নবতর সৃষ্টির পরিচয় প্রথম আমরা পাই রামমোহন রায়ের রচনায়। "সেদিন তিনি যে বাংলা ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে ভাষার পূর্ব পরিচয় এমন কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো, এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনায় ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না। এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন।" [তদেব]

পরের প্রেরণা ও চিত্তসম্পদকে আপন করে নেবার বিস্ময়কর ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রমাণ বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" [বিদ্যাসাগর চরিত—'চারিত্রপূজা']।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—এই দুই চরিত্র অনন্যতন্ত্রতা ও অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন ; আর কোনো তৃতীয় বাঙালি এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন নি। প্রতিভা অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়ো, কেননা প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই বিরল মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল [বিদ্যাসাগর চরিত—'চারিত্রপূজা']।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই : "তাঁহার প্রধানকীর্তি বঙ্গভাষা। ......বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষায় উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাতে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন —এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া

সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।" (তদেব)

মধুসূদনের কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের সূচনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন; তাই বলেছেন, "আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য সুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন।" [সাহিত্যরূপ—'সাহিত্যের পথে']। পুনশ্চ, "আমি জানি, এখনও আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতন কালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশানাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। ··নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নব-প্রভাতে উদ্বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" [বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ —'সাহিত্যের পথে']।

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন যে রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান মাত্র, তার রূপটাই চরম। শিল্পের দিক থেকে বিচারের সময় আমরা রূপটাকেই দেখি। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে ইতিহাসে অর্থনীতিতে। কিন্তু রূপের গৌরব রস-সাহিত্যে। মাইকেল বাংলা কাব্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেইজন্যেই মধুসূদনের মহাকাব্যকে রবীন্দ্রনাথ নোতুন যুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। বঙ্কিম সম্পর্কে কবি বলেছেন, "তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ। তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার বর্জিল মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথা-সাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।" [সাহিত্যরূপ— 'সাহিত্যের পথে']। পুনশ্চ, "একথা মানতেই হবে, বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক

রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ, কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে, পাশ্চাত্ত্যের আদর্শের অনুগত তাতে কোন সন্দেহ নেই।⋯ এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে—যেন অসূর্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে; কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে। এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলা-সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হ'ল সর্বত্র।" [বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—'সাহিত্যের পথে']।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আশা করি এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, সংকীর্ণ 'ন্যাশনাল' সাহিত্যের বেড়া ভেঙে বৃহত্তর মানবসংসারের সঙ্গে যোগস্থাপনের কৃতিত্ব এই চারজন মনীষীর ছিল এবং এখানেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি চিত্তের অনুরাগ, স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকার ও আত্মীকরণ প্রমাণ করে যে, উনিশ শতকের বাঙালির প্রতিভা নিজেকে সার্থক করে তুলতে পেরেছে। সাহিত্যে বাঙালির মন বহুকালের আচারসংকীর্ণতা ও অভ্যাসের দাসত্ব থেকে যে এত শীঘ্র মুক্তিলাভ করেছিল, তাতে বাঙালির চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণিত হয় বলে' রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে বুদ্ধির উদ্বোধনের ধারাটি দেখিয়েছেন; সাহিত্যের তালিকা তৈরী না করে বাঙালি চিত্তের নবজাগরণের মর্মকথাটিকে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় রবীন্দ্রকৃত ভাষ্য আমাদের পথনির্দেশক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ / রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য

৩

গল্পগুচ্ছের পটভূমি

বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ একবার সাহিত্যের সার্থকতা আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ মানুষকেই সব চেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয়, কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে রেখে দেয়; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ করে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অকলঙ্কিত ভাবে গঠিত হয়—আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালবাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান-দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।" [আলোচনা, 'সাহিত্য']

বন্ধুবরকে আর-একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুকরো সাহিত্য তুলে নিয়ে বল 'এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা' তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে দেখ তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর-কোথাও থাকছে না—কেবল সাহিত্যে থাকছে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।" [সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য']

এই দুই পত্রের তারিখ যথাক্রমে ফাল্গুন ১২৯৮ ও আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি গল্পের ['ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'] রচনাকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ। পরবর্তী তেইশটি গল্পের ['দেনাপাওনা' থেকে 'দানপ্রতিদান'] রচনাকাল ১২৯৮-৯৯ বঙ্গাব্দ। সবটা মিলিয়ে দেখলে বলা যায়, মানবসঙ্গব্যাকুলতাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মৌল প্রেরণা এবং গল্পগুচ্ছের প্রেরণাউৎস।

'মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা' আর এই ব্যাকুলতাই গল্পগুচ্ছের পটভূমি। 'চিরমনুষ্যের সঙ্গলাভে'র গভীর আন্তরিক ব্যাকুলতা গল্পগুলিকে অভিষিক্ত করেছে। মানবপ্রবাহের মধ্যে যে চিরন্তনতা ও নবীনতা আছে, তা রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে অনুভব করেছেন। আসল কথা এই গল্পগুচ্ছের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিত্যপ্রবহমান মানবজীবনকেই প্রত্যক্ষ করেছেন ও বাণীরূপ দিয়েছেন। গল্পগুচ্ছে মানবজীবনের খণ্ড রূপ নয়, অখণ্ড রূপটাই প্রধান। লেখক যখন 'আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপন মানবাকার গোপন করে না। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, এবং মানবজীবনের সঙ্গে সাহিত্যকর্মকে মিলিয়ে নিতে চায়, তখনই লেখক সার্থকতা অর্জন করে।' রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস গল্পগুচ্ছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গল্পগুচ্ছের পটভূমি তাই নিত্যপ্রবহমান মানবজীবনের পটভূমি। আর সেই সঙ্গে তা বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তনতা, বৈচিত্র্য, নিত্যপরিবর্তনশীলতা ও নিত্যনবীনতা বর্তমান, তা গল্পগুচ্ছেও বর্তমান। প্রকৃতি যে চিরপুরাতন ও চিরনবীন, তার পরিচয় পাই ঋতুতে ঋতুতে। একইভাবে আষাঢ়ের নবীন মেঘ চেনা পৃথিবীর 'পরে অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে, একইভাবে শিউলির সুবাস হেমন্তের দূতরূপে আসে। সেই একইভাবে ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া মনকে ব্যাকুল করে, চৈত্রে ঝরাপাতার দল বসন্তকে অভ্যর্থনা করে। এই লীলা প্রতি বৎসরের ও চিরকালের। প্রকৃতির জীবনের এই আদিমতা ও নবীনতাকে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনেও পেতে চেয়েছেন, পেয়েছেন। তার পরিচয়স্থল গল্পগুচ্ছ। গল্পের পটভূমিতে প্রকৃতি বর্তমান, তা গল্পের ফ্রেম নয়, গল্পের মধ্যেই তা অনুস্যূত হয়ে আছে। একে বাদ দিয়ে, ঋতুকে বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্রনাথের গল্পকে সত্যরূপে পাই না। একটি মাত্র উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। 'সমাপ্তি' গল্পের কিশোরী নায়িকা মৃন্ময়ী যৌবনবতী রমণীতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে : এই জীবনসত্যকে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কৌশলে প্রকৃতি-বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মৃন্ময়ী একদা-প্রত্যাখ্যাত দয়িতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এসেছে। সংসারের সঙ্গে মৃন্ময়ীর মিলনের একটি আশ্চর্যসুন্দর উপমা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, বলেছেন : 'তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার

যেরূপ মিল' মৃন্ময়ীকে সেরূপ মিলনের মাধ্যমে সংসার আপন করে নিল। আশ্চর্যতর বর্ণনা পাই তারপর—মৃন্ময়ীর বাল্য অংশ যৌবন থেকে বিচ্যুত হল, অপূর্ব বেদনা ও বিস্ময়ে এই যৌবনবতী স্বামিসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হল।

গল্পবিধাতা রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর জীবনে এই গুরুতর পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন প্রকৃতি-বর্ণনার মাধ্যমে ; বলেছেন : "এই-যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল।"

গল্পগুচ্ছে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রতন, তারাপদ, ফটিক, সুভা, গিরিবালা, খোকাবাবু—এরা সবাই গ্রামপ্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির পটভূমি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না। গল্পগুচ্ছে বর্ষাঋতুর আধিপত্য [রবীন্দ্রসংগীতেও তা-ই]। কেবল ঘটনা নয়, কথা নয়, সেইসঙ্গে প্রকৃতিও গল্পগুচ্ছের অপরিহার্য অঙ্গ। বোধ হয়, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বে রচিত সকল গল্পে প্রকৃতি প্রধান চরিত্র। এই প্রধান চরিত্রের আশ্রয়ে ছোট ছোট মানব-চরিত্র বেড়ে উঠেছে, পরিণতি লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে নিত্যতা আছে, গল্পগুচ্ছেও তা বর্তমান। কথাটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বিশ্বপ্রকৃতির চিরনবীনতার রহস্যটি কি? বসন্ত সারা বৎসর থাকে না, নির্দিষ্ট সময়সীমার পথ অতিক্রম করে সে বারবার ফিরে আসে। চৈত্রের বিবর্ণ হলুদ ঝরাপাতা প্রতিবারই বিদায়ের গান গায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চলে যায়, আবার ফাল্গুনের উন্মনা বাতাসে বসন্ত নবরূপে ফিরে আসে। নিত্যতার মধ্যেই তাই প্রবাহমানতা চলে-যাওয়া ও ফিরে-আসা রয়েছে। জীবনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ এই নির্মম সত্যটিকে দেখতে চেয়েছেন। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মানবজীবনকে বৃহৎ ব্যাপ্ত বিশ্বজীবনের পটভূমিতে স্থাপনা করেছেন, মরণের কালো পর্দাখানা জীবনের পটভূমিতে নিত্য বর্তমান, তারি উপর দিয়ে জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলেছে অন্তিম অঙ্কের দিকে ; তাই জীবনে মৃত্যু অনিবার্য, গল্পে মৃত্যুর পদক্ষেপ অপ্রতিরোধ্য। গল্পগুচ্ছে সেজন্যে দেখি মৃত্যু বার বার হানা দিয়েছে, কিন্তু তাতে বৃহৎ উদাসীন বিশ্বপ্রকৃতি নির্বিকার থেকেছে, ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গিয়েছে। মরণের পর্দাখানা গল্পগুচ্ছে ভয়ংকর নয়, কালো নয়, নিশ্চল নয়, সেটি রঙিন ও গতিশীল। গোড়ার দিকের গল্প (গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্ব) যখন লেখা হয়েছে, সে-সময়ের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' [প্রথম

প্রকাশ—১২৯২ বঙ্গাব্দ, 'বালক' পত্রিকা। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' সঙ্কলিত]। শোকের আঘাতে জীবনে সত্যদৃষ্টি লাভের পরিচয় ঐ দুটি রচনায় আছে। স্মরণের আবরণে মরণকে ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু জীবনকে কে বেঁধে রাখতে পারে? তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে। 'বলাকা'র 'শাজাহান' কবিতার এই সত্য ১২৯২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। ঐ দুটি রচনা এবং গল্পগুচ্ছ তার পরিচয়স্থল। বস্তুতঃ এই সত্যানুভূতি গল্পগুলিতে একটি অসাধারণ মাহাত্ম্য অর্পণ করেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির উদাসীন বৃহৎ পটভূমিতে মানবজীবনের ছোট দুঃখশোকের কোনো মূল্য নেই, সত্য হ'ল জীবনের চিরন্তন প্রবাহ। বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে মানবজীবনের তুচ্ছ ঘটনাবিক্ষোভের অকিঞ্চিৎকরতাকে রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই স্পষ্ট করে তুলেছেন।

গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা'। এখানেই এই বৃহৎ সত্যের ইশারা পাই। ঘাটের মুখে আমরা শুনি, "আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়—কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে। আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়।"

জীবনে এটাই সত্য। তাই ঘাট বহু মানবলীলার সাক্ষী, কিন্তু সবই ভেসে যায়, কিছুই থাকে না। সেইজন্য বালবিধবা কুসুমের অসহ্য হৃদয়বেদনা ও জীবনবিসর্জনের কাহিনী উদাসীনকণ্ঠে ঘাট বর্ণনা করেছে। কুসুম জলে ডুবে মরল। তখন—"চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না! অন্ধকারে বাতাস হূ হূ করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।"

কোথাও কুসুমের চিহ্নমাত্র রহিল না, ছিন্ন শৈবালের মতো স্রোতে ভেসে গেল। এই নির্মম উদাসীন সুর গল্পগুচ্ছে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে এই উদাসীনতার নবরূপ লক্ষ্য করি। মানবহৃদয়ের একটি সাধারণ অথচ গভীর বেদনা এখানে শিল্পরূপ লাভ করেছে। গ্রাম্যবালিকা রতনের স্নেহ-ভালবাসা যেভাবে উপেক্ষিত হ'ল, তাতে আমাদের সমস্ত মন করুণরসে অভিষিক্ত

হয়। পোস্টমাস্টার কর্মস্থল ত্যাগ করে এবং আপন অজ্ঞাতে একটি বিবশ প্রেমব্যাকুলা হৃদয়ের আবেদনকে পদদলিত করে শহরে ফিরে যাচ্ছেন এবং একবার মনেও হয়েছে যে রতনকে নিয়ে আসি, কিন্তু হায় তা আর হল না!

পোস্টমাস্টার যখন—

"নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল,—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই। জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি, পৃথিবীতে কে কাহার।"

এই বিচ্ছেদ সত্য, এই-ই জীবন। 'পৃথিবীতে কে কাহার'—এই নিষ্ঠুর মন্তব্যটি যোগ করে দিতে লেখকের বাধে নি।

'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রায় সমকালে রচিত 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় [রচনা-কাল: ১২৯৯ বঙ্গাব্দ] একই নির্মম বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। চার বছরের শিশু-কন্যার স্নেহডোর ছিন্ন করে প্রবাসগামী পিতার যাত্রা-আয়োজন—'যেতে দেব না' এই আবেদন ব্যর্থ হয়েছে, চিরকাল হচ্ছে:

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব-চেয়ে পুরাতন কথা, সব-চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে নির্মম বিশ্বপ্রকৃতির আবার দেখা পাই। মানব-জীবনের ক্ষণিক ঘটনাবিক্ষোভের প্রতি বিশ্বপ্রকৃতি কত উদাসীন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন এইভাবে,—খোকাবাবু

"গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে গেল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলা-ঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত

শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্য-মুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু - খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্ছল্ খল্খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।"

উদাসীন পদ্মার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি মানবকের মৃত্যু বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির কাছে কিছুই নয়, এই ভাবটি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এই অনুভূতি কি আমাদের মনে নোতুন ভাবে উপস্থিত হয় না যখন আমরা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প পড়ি? গিরিবালা আর তার শশিদাদার কাহিনী তো বিশ্বপ্রকৃতির নির্বিকার উদাসীনতার কাছে মানবজীবনের বড় বড় ঘটনার ক্ষুদ্রতার ও অকিঞ্চিৎ-করতারই কাহিনী। গিরিবালা ও শশিভূষণের বন্ধুত্বকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে' গিরিবালার বিয়ে হলো। শশিভূষণ নদীতীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু অশ্রুমতী নববধূ গিরিবালা জানতেও পেল না যে তার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি কাছেই রয়েছেন। নৌকা ছেড়ে দিলো, গ্রাম ছেড়ে অজানা নদীপথে ভেসে চল্‌লো, ক্রমশ দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দুটি হৃদয়ের মর্মান্তিক বিচ্ছেদবেদনায় কিন্তু পৃথিবীর কিছুই আসে যায় না। তাই নৌকা যখন চলে গেল, তখন—

"জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্‌ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়া নৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়-যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! 'শশিদাদা'!—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।"

শেষের এই নিষ্ঠুর মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির নির্মমতা ও উদাসীনতাকেই ভাষা দিয়েছেন।

'শাস্তি' গল্পে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের দায় যখন সরলা গ্রামবধূ চন্দরার কাঁধে তারই স্বামী চাপিয়ে দিল, তখন সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই চরম প্রতারণা দেখে নিদারুণ অভিমানে চন্দরা ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকল, এবং সে স্বীকারোক্তি করল। অগত্যা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিরপরাধ চন্দরাকে সেশনে চালান দিলেন। "ইতিমধ্যে চাষবাস, হাটবাজার, হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।"

এই বৃহৎ জগতে চন্দরার বিপৎপাতে কিছুই আসে যায় না, কোনো কাজই বন্ধ হয় না, উদাসীন পৃথিবী একটি মানবীর দুঃখে কিছুমাত্র বিচলিত হলো না।

এই-সব বিপরীত ছবি আমাদের মনের মধ্যে একটা ধাক্কা দেয়, আমরা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠি, আমাদের দুঃখের অনুভূতি তীব্রতর হয় এবং বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে মানবসমাজের ছোটবড়ো ঘটনার অকিঞ্চিৎকরতা নোতুন করে' উপলব্ধি করি। ফলে বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতি ও চিরন্তন বিশ্ব-জীবন-সম্পর্কিত একটি নবতর চেতনায় উদ্বোধিত হই। মনে মনে প্রশ্ন করি, এর কী দরকার ছিলো। তখন ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ বেদনা শোককে বৃহতের পটভূমিতে আমরা স্থাপন করতে বাধ্য হই, এবং এই চিরন্তন অনশ্বর বিশ্বজীবনকে উপলব্ধি করি। ব্যক্তিগত দুঃখ বিশ্বের পটভূমিতে উন্নীত হয়ে নবরূপে দেখা দেয়।

পৃথিবীর বন্দনা রচনা করতে গিয়ে যে-কবি পরবর্তীকালে বলেছিলেন,

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে,
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।

সে-কবি গল্পগুচ্ছের এই সব জীবনচিত্রে পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৃথিবী মানুষের জীবনকে নিয়ে খেলা করে, শ্রেয়কে করে দুর্মূল্য, কৃপা করে না কৃপাপাত্রকে। এই বিশ্বচেতনা ও তীব্র দুঃখের আলোকে কবি জীবনের সত্যমূল্য পেতে চেয়েছিলেন, জেনেছিলেন জীবনের কোনো একটি ফলবান্ খণ্ডকে যদি পরম দুঃখে জয় করা যায়, তবে পৃথিবীর স্বীকৃতি পাবেন। দুঃখের এই মহৎ উপলব্ধি বাণীরূপ লাভ করেছে আলোচ্যমান গল্পগুলিতে। গল্পগুচ্ছে ক্ষুদ্র মানবজীবনকে বৃহৎ উদাসীন নির্বিকার বিশ্বজীবনের পটভূমিতে স্থাপন করে' রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রকৃতি ও মানবজীবন এক সুরে বাঁধা, সেখানে চিরমনুষ্যের মঙ্গলাভের ব্যাকুলতার সুর বেজে উঠেছে। সে সুর আমাদের মুগ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে, নবতর জীবনচেতনায় উদ্বোধিত করে।

৪

গল্পগুচ্ছকারের পিতৃহৃদয়

এক

'জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা।'

এই শিশুদের একটি নিজস্ব জগৎ আছে, সেখানে বিষয়ী লোকের প্রবেশ নিষেধ। বাস্তবের মাপকাঠিতে বিচার সেখানে অচল। সেখানে স্বপ্নকথাই একান্ত বাস্তব। এদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায় পেয়ে সাজায় বসি ঢেলা।
রতন-ধন খোঁজেনা তারা, জানেনা জাল-ফেলা ॥'

'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে শিশুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র চলচ্ছবি এঁকেছেন। বস্তুত মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিমন ছাড়া পেয়েছে, সাহিত্যের কঠোর শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে কবি এখানে শিশুদের খেলায় যোগ দিয়েছেন। 'লিপিকা' গ্রন্থের 'গল্প' ও 'রাজপুত্তুর' এই কাহিনী দুটিতে শিশুমনের উপর রূপকথার আশ্চর্য প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন এবং বাস্তবের চেয়ে এই রূপকথার জগতের মূল্য যে অনেক বেশি, তা বলেছেন। সংশয়হীন, অগাধ কৌতূহলপূর্ণ ফ্যাণ্টাসির রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাচারী যে শিশুমন, কবি তাকে সস্নেহে লালন করেছেন। এই পিতৃস্নেহ, এই বাৎসল্য, এই সহানুভূতির পরিচয় এই ছত্রগুলিতে :

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র এ প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ—
ইহাদের করো আশীর্বাদ।...
কোলে তুলে লও এরে,
এ যেন না কেঁদে ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ।
বুকের মাঝারে নিয়ে
পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ ॥

রবীন্দ্রনাথের এই বাৎসল্যবৃত্তি সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর' নাটকে, 'গোরা' উপন্যাসে, 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় এই স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়টিকে সহজেই খুঁজে নিতে পারি।

গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এই বাৎসল্যবৃত্তির অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে কথাই আলোচনা করবো। গল্পগুচ্ছের পঁচিশ-ত্রিশটি গল্পের মূল রস বাৎসল্যরস ; নায়ক বালক, নায়িকা বালিকা। এই ছোট নায়ক-নায়িকার উপর কবির পিতৃহৃদয়ের স্নেহ অজস্রধারায় বর্ষিত হয়েছে। নায়কেরা সাধারণতঃ চিরচঞ্চল স্নেহবুভুক্ষু কিশোর, অথবা বিবাগী স্নেহ-উদাসীন পলাতক বালক। নায়িকারা যতটা না প্রিয়া তার চেয়ে বেশি কন্যা। মনে হয় গল্পগুচ্ছকার প্রিয়া অপেক্ষা কন্যাকেই তাঁর গল্পে নায়িকারূপে দেখতে চেয়েছেন।

দুই

গল্পগুচ্ছে যেগুলি মূলতঃ প্রেমের গল্প—যেখানে নায়িকার প্রত্যাশাই স্বাভাবিক —সেখানেও রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে পেতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির নায়িকা রতনের কথা। রতনের যে ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা একটি স্নেহব্যাকুলা বন্ধনপ্রত্যাশী কিশোরীর ছবি। তাকে প্রণয়িনী বলে মনে হয় না। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, রোগশয্যায়, বান্ধবহীন কর্মক্ষেত্রে পোস্টমাস্টারের স্নেহব্যাকুল সঙ্গীরূপেই আমরা রতনকে দেখেছি। জরাক্রান্ত পোস্টমাস্টার যখন সেবাপ্রার্থী হ'ল, তখন "বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল।" রতনের মধ্যে পোস্টমাস্টার স্নেহময়ী জননী ও দিদিকে পেয়েছিল। পোস্টমাস্টার যখন কর্মত্যাগ করে শহরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন নৌকায় উঠে "হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।" লেখক তখন 'জগতের ক্রোড়বিচ্যুত অনাথিনী'র প্রতি তাঁর পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ বর্ষণ করেছেন।

'সমাপ্তি' গল্পেও ঠিক তাই হয়েছে। নায়িকা মৃন্ময়ীর কিশোরী থেকে যুবতীতে পরিণত হবার আশ্চর্য কাহিনী বা একদা-প্রত্যাখ্যাত স্বামীর জন্য তার ব্যাকুল উন্মুখতা গল্পে প্রাধান্য লাভ করে নি, প্রাধান্য লাভ করেছে তার দুরন্ত দামাল রূপটি। গল্পশেষে যে আনন্দময় সমাপ্তি, তা পাঠকের উপরি-পাওনা। মৃন্ময়ীর বর্ণনায় লেখকের পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। "পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে।

কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শংকান্বিত। ..বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেই জন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ।" কেবল ঈশানবাবুর নয়, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 'সমাপ্তি' গল্পের স্রষ্টিকর্তারও আদরের মেয়ে মৃন্ময়ী। লেখকের সস্নেহ প্রশ্রয়ের জোরেই এই বন্ধনহীন বালিকাটি এতো প্রাধান্য পেয়েছে। মৃন্ময়ীর রূপবর্ণনাতেই লেখকের এই সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরটি ধরা পড়ে: "মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়। না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প, সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না।" এ বর্ণনা আর যাই হোক, যে মেয়ে স্বামীবিরহিণী প্রণয়িনী হবে, তার বর্ণনা নয়। কবি এখানেই ক্ষান্ত নন, মৃন্ময়ীর রূপবর্ণনা আরো করেছেন—সে বর্ণনা লোভী যৌবনের আয়োজন নয়, কৈশোরের প্রতিমা-নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা যায়, খেলা করে; সেই জন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।" একেবারে পাঠকহৃদয়ে পাকাপোক্ত স্থান অধিকার করে। মৃন্ময়ীর মধ্যে নায়িকাকে না খুঁজে সরলা অরণ্যমৃগীকে খোঁজাই উচিত।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে লেখক আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। এখানে প্রণয়কথা নেই, আছে গিরিবালা ও তার শশিদাদার কথা। যুবক শশিভূষণ (একটি সদ্যবিকশিত এম এ, বি-এল) কিশোরী গিরিবালার প্রতিবেশী মাত্র। এই দুই অসমবয়স্ক বন্ধু দুটি "ভাবের আলোচনা ও সাহিত্যচর্চা" করতো। গিরিবালার বর্ণনাটা এই ধরনের: "শশিভূষণ অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্যহৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।" এইভাবে সাহিত্যচর্চা ও পাকা জাম খাওয়ার অবকাশে দুজনের মধ্যে ভাই-বোনের একটি স্নেহসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লেখক এই সম্পর্কের উপরেই জোর দিয়েছেন এবং সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে এই সম্পর্ক ও এই

আনন্দময় গৃহকোণের খেলা কি ভাবে ভেঙে গেল, তা দেখিয়েছেন। অভিমানিনী কিশোরীর বকুলফুল ও পাকা জামের উপঢৌকন দিয়ে শশিদাদার সঙ্গে ভাব করতে আসার যে মনোরম চিত্রটি লেখক এঁকেছেন, তাই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে, পরবর্তী ঘটনাগুলি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি। লেখকের বলার ভঙ্গিতেই ধরা পড়ে, তাঁর ঔৎসুক্য শশিভূষণের মামলা-মোকদ্দমায় হারজিতে নয়, গিরিবালার সঙ্গে ছদ্ম স্নেহ-কলহে জয়পরাজয়ে। গিরিবালার প্রতি লেখকের বাৎসল্যরস ক্ষরিত হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনায়—"যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল-বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখদুঃখের বীজ অংকুরিত করিয়া তুলিতেছিল।"

আর দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্য ক্ষরিত হয়েছে দুটি বোবা বালিকার প্রতি। একজন 'সুভা' গল্পের সুভা, অপরজন 'শুভদৃষ্টি' গল্পের অবোধ কিশোরী। নিষ্ঠুর সংসার যখন এই বোবা মেয়ে দুটিকে পীড়ন করেছে, নিষ্ঠুরতম দণ্ড বিধান করেছে, তখন লেখক তাঁর পিতৃহৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে এদের রক্ষা করতে চেয়েছেন। গল্প দুটির বর্ণনাতেই এই স্নেহব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুভার কী আশ্চর্য বর্ণনা লেখক দিয়েছেন:

"সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাস মাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত। ...কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত, কখনো মুদ্রিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে; কখনো অস্তমান-চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া ওঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত। তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।"

এই সঙ্গীহীন বোবা বালিকা যে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এই ভাবে:

"প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা

কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষু-পল্লববিশিষ্ট সুগভীর যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরব পূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস। ··রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।"

এই বর্ণনায় যে সহৃদয়তা, যে করুণা, যে সুগভীর স্নেহের পরিচয় পাই, তা পিতৃহৃদয়ের। সংসারের সমস্ত বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে লেখক তাঁর পিতৃহৃদয়ের সকল স্নেহ এই বোবা মেয়েটির প্রতি উজাড় করে দিয়েছেন।

'শুভদৃষ্টি' গল্পের সেই বোবা মেয়েটি—হাঁস ও খরগোস কোলে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, তার সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের এই সুগভীর স্নেহের পরিচয় পাই। এই মেয়েটিকেও কবি নিস্তব্ধ গ্রামপ্রকৃতির পটভূমিকায় অঙ্কিত করেছেন। এই সরলা বোবা মেয়েটির বর্ণনা লেখক এককথায় দিয়েছেন এইভাবে: "সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌছে নাই।" বোটবিহারী তরুণ জমিদার কান্তিচন্দ্র তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই দুই ক্ষেত্রে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এ মেয়েকে নায়িকা বলতে ইচ্ছা করে না, লেখকের পিতৃহৃদয়ের তলদেশ থেকে উত্থিত প্রতিমা বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। তার প্রমাণ এই বর্ণনা: "সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনী-তীরে তরুণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।" এ বর্ণনা গভীর পিতৃস্নেহের—বাৎসল্যের পরিচায়ক। বিশেষতঃ শেষ বাক্যটিতে রবীন্দ্রনাথ এই সরলা বোবা বালিকাটিকে মহাকাব্যের নায়িকার মর্যাদা দিয়েছেন।

আরো কয়েকটি মেয়ের ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। প্রভা ('সম্পাদক'), উমা ('খাতা'), মিনি ('কাবুলিওয়ালা'), হৈমন্তী ('হৈমন্তী'), কুসুম ('ঠাকুরদা'): এদের ভূমিকা কোথাও বা স্ত্রীর, কোথাও বা কন্যার। কিন্তু মূলত তারা লেখকের পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হয়েছে, বিশেষ বেড়ে ওঠে নি।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে লেখকের পিতৃহৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—এখানে তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। মিনির বিবাহোদ্যোগের বর্ণনা: "আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ!"

জেলফেরত রহমৎ কাবুলির পিতৃস্নেহ ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর পিতৃস্নেহ—এ দু'য়ে কোনো পার্থক্য নেই, এটা সেদিন মিনির পিতা বুঝতে পারলেন। "তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।"

'হৈমন্তী' গল্পের নায়িকা হৈমন্তীর বর্ণনাতেও এই উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে। "এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসরকাল অন্তরে বাহিরে কতো বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে।" এখানেও লেখকের পিতৃহৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ শ্বশুর-বাড়ীতে নির্যাতিতা এই বালিকাটিকেও রক্ষা করতে চেয়েছে।

তিন

গল্পগুচ্ছের নায়িকা-চরিত্রে যেমন কন্যার ভাবটি প্রবল, নায়ক-চরিত্রে তেমনি অগাধ পিতৃস্নেহধারা-স্নাত কিশোরের ভাবটি প্রবল। এই চরিত্রগুলি অঙ্কন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতৃহৃদয় শিল্পীর উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই নায়কেরা সাধারণত চিরচঞ্চল স্নেহবুভুক্ষু কিশোর অথবা চির-পলাতক উদাসীন প্রকৃতিসন্তান।

স্নেহবুভুক্ষু বালক ও কিশোরদের পরিচয় বহু গল্পেই আছে। যেমন: বৈদ্যনাথের দুই ছেলে ('স্বর্ণমৃগ'), গোকুল ওরফে নিতাই পাল ('সম্পত্তি-সমর্পণ'), আশু ('গিন্নি'), সুশীলচন্দ্র ('ইচ্ছাপূরণ'), কালিপদ ('রাসমণির ছেলে'), রসিক ('পণরক্ষা'), নীলকান্ত ('আপদ'), চুণিলাল ('চিত্রকর'), হরিদাস ('হালদার-গোষ্ঠী'), সুবোধ ('ভাইফোঁটা'), নীলমণি ('দিদি')। শৈশবের নানা বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষায় দুঃখবেদনায় মথিত এই চরিত্রগুলি আমাদের কাছে অম্লানরূপে বিরাজ করছে। কেউ বা পাঠশালা-পলাতক, কেউ বা পুতুল-নৌকা পেয়ে খুশী, কেউ বা বাইসাইকেল-অন্তপ্রাণ, কেউ বা ভগিনী-অন্তপ্রাণ, কেউ বা দুর্বল নিরাহ ক্ষীণজীবী, কেউ বা দুর্দান্ত অস্থির চঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই তাঁর পিতৃহৃদয়ের

স্নেহরসে সঞ্জীবিত করেছেন। আর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের সেই ক্ষুদ্র চঞ্চল শিশুটি যে দুরন্ত পদ্মায় মাছ ধরতে চায় তাকে আমরা ভুলতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় চরিত্র হচ্ছে চিরপলাতক স্নেহউদাসীন প্রকৃতিসন্তান। এই চরিত্র বারেবারেই দেখা দিয়েছে। কেবল গল্পগুচ্ছে নয়, অন্যত্রও এর দেখা পাই। 'ডাকঘর' নাটকের অমল এই শ্রেণীর চরিত্র। গল্পগুচ্ছে এই শ্রেণীর কিশোর আছে তিনটি : ফটিক ('ছুটি'), তারাপদ ('অতিথি') ও বলাই ('বলাই')।

'ছুটি' গল্পের নায়ক ফটিক গ্রামের বালকদের সর্দার ছিল। লেখক সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে তার বিবিধ দৌরাত্ম্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বালকটির সঙ্গে গ্রামপ্রকৃতির একটি আশ্চর্য সংগতি স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতায় মামার বাসায় এসে ফটিক যে মুহূর্তে বুঝতে পারল সেখানে সে অবাঞ্ছিত, সেই মুহূর্তে সে তার গ্রামে ফিরে যেতে ব্যগ্র হ'ল। এই ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা কেবল নিজের মায়ের জন্য নয়, গ্রামপ্রকৃতির জন্যও বটে। তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলের মনোভাবটি লেখক আশ্চর্য সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম রস-দৃষ্টির সাহায্যে ধরেছেন! সেই সময়কার মনোভাবটি—স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা ও স্নেহের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়ের ব্যাকুলতা—রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন ও তার অভাবেই ফটিকের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একথা বলেছেন। পিতৃহৃদয়ের গভীর দরদ ছাড়া এ মনোভাবটি ধরা অসম্ভব। স্নেহহীন মামার বাসায় ফটিকের বেদনার কী আশ্চর্য বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, মনে হয় লেখক যেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এটি বর্ণনা করেছেন। "প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা —কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত আকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।"

এই বর্ণনার পিছনে যে আবেগ ও দরদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা সহজেই অনুভববেদ্য। ফটিকের মৃত্যু-বর্ণনার সংযত ভাষা লেখকের পিতৃহৃদয়ের স্নেহের পরিচায়ক—"যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।"

'অতিথি' গল্পের তারাপদ প্রকৃতির স্নেহে লালিত। তার মধ্যে সমস্ত গ্রামপ্রকৃতি ধরা দিয়েছে। এই ঘরছাড়া স্নেহউদাসীন বালকটির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ পিতৃহৃদয়ের

সকল অনুরাগ ও স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তারাপদর বড়ো বড়ো চোখ এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পেয়েছে। লেখক তারাপদকে 'তাপস-বালক' আখ্যা দিয়েছেন। সংসারের ও গ্রামের সকল আদর, প্রলোভন ও প্রশ্রয়কে উপেক্ষা করে সে ঘরছাড়া হয়ে গেল। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন: "স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।" কোনো নিয়মের বাঁধনে সে ধরা দেয় নি। "সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত।" একবার যাত্রার দলে, একবার জিম্‌ন্যাষ্টিকের দলে, একবার নৌকারোহী দোকানীর সঙ্গে, আবার কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবুর সঙ্গে তারাপদ ঘুরে বেড়ায়। সকল ব্যাপারেই তার পটুত্ব আছে, কোনো ব্যাপারেই তার আগ্রহের অভাব নেই, অথচ কিছুতেই তার আসক্তি নেই।

প্রকৃতির সঙ্গে তারাপদর ঘনিষ্ঠতা যে কতটা সুনিবিড়, তা এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার বর্ণনায় সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুর লক্ষ্য করা যায়: "তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতোই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষ মাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ, ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।"

ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়ানো, অকাজের রাজা, উদাসীন এই বালকটিকে লেখক তিরস্কার করেন নি, এর প্রতি স্নেহ বর্ষণ করেছেন। জমিদার মতিলালবাবু বা নিজের আত্মীয় বন্ধু—কারুর স্নেহের দাম তারাপদ দিল না, পুনর্বার সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার নিরুদ্দেশের বর্ণনাটি কী মমতাপূর্ণ: "স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর

নিকট চলিয়া গিয়াছে।" 'অতিথি' গল্প পড়লে এই কথাই মনে হয়, তারাপদর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবারিত সহানুভূতি ও প্রশ্রয় ছিল।

আরেকটি গল্পের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাতে চাই। সে গল্পের নাম 'বলাই'। এটি ঠিক গল্প নয়, আসলে একটি কবিতামাত্র। সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের শৈশবজীবন-স্মৃতির কবিতা। 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে যে বন্দী কিশোর রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা আছে, এ যেন তারই প্রতিরূপ। 'সোনার তরী', 'বনবাণী' কাব্যে বৃক্ষ-প্রকৃতির প্রতি কবির যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, এই গল্প তারই গদ্যরূপ। মাতৃহীন এই কিশোর (বলাই) সংসারের সন্তান নয়, প্রকৃতির সন্তান। তার প্রকৃতিতে গাছপালার মূল সুরগুলোই প্রবল হয়ে উঠেছে। ঘাসের মাঝে নামহারা হল্‌দে ফুল, কণ্টিকারী গাছের নীলফুল, শিমুল গাছ: সবের প্রতিই বলাইয়ের অসাধারণ অনুরাগ। সারা গল্প এই অনুরাগের গুঞ্জনে মুখর আর এ অনুরাগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ সমর্থন ও প্রশ্রয়—এই হ'ল 'বলাই' গল্প।

সাংসারিক অর্থে নিষ্কর্মা, ফাঁকিবাজ, উদাসীন ফটিক, তারাপদ, বলাইয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গুরুগিরি করেন নি, তাদের সমর্থন করেছেন ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। পিতৃ-হৃদয়ের অজস্র বাৎসল্যরসধারায় এই সব কিশোর-কিশোরীরা স্নাত হয়েছে।

৫

খেয়াল-ছবি : সে

এক

গল্প বলছে টেকোমাথা বুড়ো :

"তারপর ওদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনই ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ হৈ রৈ রৈ মার-মার কাট-কাট—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, পক্ষিরাজ যদি হবে, তা হলে ল্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভাল কথা। ল্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না। সব সুরসুর করে পালাতে লাগল।"

আশা করি রসিক পাঠককে বলে দিতে হবে না যে এই অংশটি স্বনামখ্যাত সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' থেকে গৃহীত হয়েছে। এই স্বপ্নমঙ্গলের কাহিনী রচনা করে সুকুমার রায় অবিনাশী গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। জাগ্রত বাস্তব জগতের বিচারে এ কাহিনী উদ্ভট, খাপছাড়া, বিশুদ্ধ গাঁজা মাত্র। কিন্তু না, এ হল প্রতিভার জাগ্রত স্বপ্নের ফসল। সুকুমার রায় সেই বিরল প্রতিভা।

বিখ্যাত অঙ্কবিদ্ চার্লস ডজ্‌সনের কথা আমরা মনে রাখি না, কিন্তু 'লুই ক্যারল' এই ছদ্মনামে যে অপূর্ব খাপছাড়া গ্রন্থ—'অ্যালিস ইন্ ওআণ্ডারল্যাণ্ড' তিনি রচনা করেছেন, তা অমর হয়ে আছে ও থাকবে। জগতের কোটি কোটি শিশু এই বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে ও পাবে। এবং সম্ভবতঃ শিশুদের জনকজননীরাও এই বই পড়ে আনন্দ পান।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রার, পরশুরাম এই জাতীয় উদ্ভট রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরেজীতে লুই ক্যারল, এডোঅর্ড লীয়র, ইউজিন ফীল্ড, অগডেন ন্যাশ 'ননসেন্স' কবিতা রচনা করেছেন। উদ্ভট স্বপ্নমঙ্গলের কথা ও এলোমেলো কবিতা রচনা করা সোজা নয়, তার জন্য প্রয়োজন গভীর কল্পনা, অবাধ উৎকল্পনা ও মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা। ইমাজিনেশন ও ফ্যান্সি, দুয়ের উপরই দখল চাই।

অতিশিষ্ট অতিভদ্র নিয়মশাসিত প্রথাবদ্ধ সংসারের পেষণে যখন মন বিদ্রোহ করতে চায় খেপে যেতে ইচ্ছে করে, তখন এই ননসেন্স ও ফ্যাণ্টাসির জগতে, খাপছাড়া ও উৎকল্পনার রাজ্যে পালিয়ে যাবার তীব্র বাসনা জাগে।

এই স্বপ্নমঙ্গলের কথায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল সমগ্র জীবনব্যাপী। 'হিং টিং ছট' ('সোনার তরী') থেকে 'গল্পসল্প' তার পরিচয়স্থল।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'সে' একটি আশ্চর্য রচনা। 'সে' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সৃষ্টিতে তাঁর সমগ্র জীবনে অস্বীকৃত ছায়াময় জগতের আভাস ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে, গদ্যকবিতায়, 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে স্থূল অসুন্দর ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছায়ালোকের ও অবচেতনের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে যে অ-রূপ জগতেব রূপ ফুটে উঠেছে, তা এতদিনের রবীন্দ্র-সাহিত্যে অস্বীকৃত ছিল। আর 'তিনসঙ্গী' গল্পে বিজ্ঞান-উপাদানের সমাবেশ ও বিজ্ঞান-মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) লেখেন ও বিজ্ঞানকর্মীদের সান্নিধ্যে আসেন। 'সে' গ্রন্থে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও খেয়ালিপনা দুই-ই আছে। 'সে' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানী-অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। এটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

দুই

উৎসর্গ-পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'সে' গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন। সেটি আলোচনা করলে এর স্বরূপ বুঝতে সহায়তা হবে বলে আমার ধারণা।

কবি বলেছেন :

'আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।
যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া।
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।

যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।'

মনের গহন থেকে ভেসে-আসা খেয়াল-ছবির মিছিল 'সে' গ্রন্থে দেখা গিয়েছে। ফসল কাটার পর শূন্য মাঠে যে তুচ্ছ আগাছার ফুল ফোটে, রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থকে তার সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। ফ্যান্টাসির ধর্ম তিনি এর উপরে আরোপ করেছেন, নিরুদ্দেশ বাউলের বেশে এ ভেসে বেড়ায়। খেয়ালী লঘু কল্পনার উদ্দেশ্যহীন খাপছাড়া সঞ্চরণ বলেই একে তিনি মনে করেন।

'সে' কি কেবল ছোটদের জন্য লিখিত? 'সে' পড়ে তা মনে হয় না। শিশুর অবাধ বিস্ময় ও কৌতূহলের খোরাক 'সে' জোগায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে যে বিজ্ঞান-মনস্কতা 'সে' গ্রন্থে আছে, তা সম্পূর্ণরূপে শিশুবোধ্য নয়। শিশুর কল্পনা-সীমান্ত ছাড়িয়ে গেছে 'সে'। বিশ্বসৃষ্টিকে অবলম্বন করে শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, তা প্রতিভার স্পর্শে অ-সাধারণত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

তিন

'সে' গ্রন্থের প্রধান চরিত্র তিনটি—'আমি' (গল্পকথক), 'তুমি' গল্পের শ্রোতা (অর্থাৎ পুপুদিদি) আর 'সে' (অনামিকতার আবরণে আবৃত)। 'সে' মানুষটি সম্পূর্ণ খেয়ালী, বলা যায় উদ্ভট ও খাপছাড়া। একে নিয়েই যত গল্প। তার চরিত্রে যত হাস্যকর উপাদান আছে বা থাকা উচিত ছিল, সে-সবকে নিয়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য গল্প 'আমি' খাড়া করেছেন।

'সে' গ্রন্থের সূচনায় প্রথম পরিচ্ছেদে গল্পকথক 'আমি' মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি—গল্প শোনার প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। গল্পরসের সঙ্গে এখানে মিলেছে উদ্ভটরস আর বিজ্ঞানরস; সবটা মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি। 'সে' গ্রন্থ রচনার কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে, "অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তারপরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের

মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।"

এই ভূমিকা থেকেই বোঝা গেল এই গল্প বাঁধা-ধরা পথে চলবে না। 'সে' পরিচিত সংসারের লোক, তার খিদে পায় এবং খায় ভাল। এমন একটি ঘোরতর সংসারী চরিত্রকে নিয়েই যত কাণ্ড।

প্রথম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী 'সে'-র টানে চলে এসেছে। 'সে'-র নানা কীর্তিকলাপের সরস বর্ণনা পাই। 'আমি' ও 'পুপুদিদি'—দুজনে মিলে 'সে'-কে নিয়ে কত মজাই করেছেন। গোড়াতেই লেখক বলেছেন, এ রূপকথা নয়। "এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনেব পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প।···তারপরে এই রকমই আরও কত কী—বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।"

গল্পকথক বলেছেন, "আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা আমার আজগুবি গল্পের এত বড়ো উত্তর-সাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি—দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়। - লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদার পাড়া গলির চম্‌চম্। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।"

এই অনামিক অথচ অতি-প্রত্যক্ষ 'পয়লা নম্বরের মানুষ' 'সে'-কে নিয়েই যত গল্পের সূচনা। হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস, শিবাশোধান সমিতির রিপোর্ট, গেছোবাবা, সে-র বরযাত্রা ও বিয়ে, তাস্‌মানিয়ার শ্রীযুক্ত কোজুমাচুক্ ও শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কনা, আধুনিক বাঘেদের প্রগতি-আন্দোলন, সে-র চেহারাহারানো, স্বামীস্বত্ব-দাবিতে পাতুখুড়োর গিন্নির মামলা, সে-র মগজে বাঁদরের মগজ, খরগোস-ঘণ্টাকর্ণ, শুক-সারীর দ্বন্দ্ব—পর পর এই এগারোটি কাহিনীতে গল্পকথক আমাদের ফ্যাণ্টাসির রাজ্যে নিয়ে গেছেন। এর মধ্যে যোগসূত্র আদি ও অকৃত্রিম 'সে'। তাই কখনই বাস্তব জগৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। 'সে' এই জগতেরই লোক, তাকে নিয়ে বঙ্গ করতে করতে গল্পকথক স্মৃতিতে গাঁজার গল্প রচনা করেছেন। শিশুর জগতে 'সে' এক নোতুন আনন্দের বার্তাবহ হয়ে এসেছে। পুপুদিদির উপর গল্পগুলির প্রতিক্রিয়াতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শেষাংশে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাই। এখানে অলৌকিক রসের সঙ্গে মিশেছে বিজ্ঞান-কৌতূহল। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞান-কাহিনীকে সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব বর্ণনচ্ছলে গল্পকথক উপস্থিত করেছেন। 'পত্রপুটে'র 'পৃথিবী' কবিতায় সৃষ্টিকাহিনীর যে অপরূপ কবিতামূর্তি, এখানে তারই অলৌকিক ফ্যাণ্টাসিপ্রতিমা। শেষে পাই কবির নিজস্ব বক্তব্য: "আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভাণ করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।" শেষ মন্তব্যটি প্রফেটের উক্তি বলে মনে করা যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ' মাস্টারমশাইকে উপলক্ষ করে কথক সৃষ্টিকাহিনী বর্ণনা করেছেন এবার জীবের জন্ম ও বিবর্তনের পালা—মনের সঙ্গে মাংসের ঠেলাঠেলি মারামারি—মনোবাহী মানুষ সৃষ্টির শেষতম অধ্যায়। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে কিশোর সুকুমারকে কেন্দ্র করে গল্পের বুনুনি—জীবের বিবর্তনের কথা এল স্বপ্নবর্ণনার মাধ্যমে —গাছপালা নদীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পের সমাপ্তি হয়েছে সুকুমারের বিদায়পত্রে। সে লিখেছে : "য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই।···ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেচি।"

'বনবাণী' ও 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের রচয়িতাকে এখানে চিনে নিতে পারি। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে কাব্যরসে ও গভীর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানমনস্কতায় ও খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রতিভার লীলার এক অভিনব পরিচয়স্থল হয়ে রইল 'সে' গ্রন্থ।

চার

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে এই গ্রন্থের গভীর যোগ রয়েছে। 'সে' রচনার পূর্বেই বিদেশে রবীন্দ্রচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে ও বিদেশী চিত্ররসিকদের সমাদর লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে মূলতঃ আলোর জগৎ, রবীন্দ্র-চিত্র অন্ধকারের জগৎ।

সৃষ্টিসূচনায় যে অন্ধকার ছিল, তার বিবরণ 'সে' গ্রন্থে কেবল রঙে নয়, রেখায় ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রকৃত রেখাচিত্রগুলি 'সে'-র অন্যতম আকর্ষণ। মলাটের রঙিন পেনসিল ড্রয়িং, 'সে', 'পান্নারাম', ও 'পুপু'—জলরঙে আঁকা এই তিনটি ছবি, এবং বহুসংখ্যক পেনসিল-ড্রয়িং দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে অন্ধকারের জগৎ এখানে কবির নিকট সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে এতে যে-সব পশুর ছবি আঁকা হয়েছে সেগুলি যে রকম প্রথাচ্যুত দুঃসাহসিক কল্পনানির্ভর, তা রবীন্দ্রনাথের এক অন্য পরিচয় বহন করে। 'গাণ্ডিসাঙ্‌তুং', 'গেছো বাবা', 'ঘণ্টাকর্ণ', 'হিংস্রজাতের ঘণ্টাকর্ণ', 'জিবরেরকরা কাঁটাওয়ালা', 'পাতুখুড়োর গিন্নি', 'শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা', 'পাঁড়েজি', 'স্মৃতিরত্নমশায়', 'কনে-দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে' প্রভৃতি ড্রয়িংগুলি এর প্রমাণ।

৬

গল্পে নোতুন পরীক্ষা : তিন সঙ্গী

এক

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে ছয়টি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সন্ধ্যাসংগীত থেকে ছবি ও গানের কালে রচিত চারটি গল্প [ভিখারিণী, ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট], তখন লেখকের বয়স ষোল থেকে চব্বিশ। দ্বিতীয় পর্ব, স্বল্পকালস্থায়ী হিতবাদীর যুগে রচিত ছয়টি গল্প [দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি], লেখকের বয়স তিরিশ। তৃতীয় পর্ব, সাধনার যুগ বা মানসী-সোনার তরী-চিত্রার যুগ, এর পটভূমি পদ্মা। লেখকের বয়স তিরিশ থেকে চৌত্রিশ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি এই পর্বেই রচিত হয়েছে। এই পর্বে রচিত গল্পের সংখ্যা আটত্রিশ। চতুর্থ পর্ব ভারতী-র যুগ, লেখকের বয়স ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশ, গল্পের সংখ্যা তেইশ। এর পর পঞ্চম পর্ব, সবুজপত্রের যুগ, লেখকের বয়স বাহান্ন থেকে ছাপ্পান্ন। এই পর্বের গল্পে বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা গেল, [হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, পয়লানম্বর—তার পরিচয়স্থল]। ষষ্ঠ ও শেষ পর্ব—'তিনসঙ্গী', অশীতিস্পৃষ্ট লেখকের হাতে সৃষ্ট অতিশয়-স্বাতন্ত্র্যধর্মী তিনটি অ-সাধারণ গল্প [রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি]।

'তিনসঙ্গী'র রচয়িতা ও 'গল্পগুচ্ছে'র রচয়িতার পরিচয় এক নয়। গল্পগুচ্ছ যিনি রচনা করেছেন তাঁকেই আমরা গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বলে গ্রহণ করেছি। তিনি প্রকৃতিপ্রেমী লিরিক কবি। তিনি মানবমনের কোমল অনুভূতিনিচয়ের নিপুণ রূপকার। 'শাস্তি' গল্পের মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে পদ্মালালিত ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের ছোট সুখ দুঃখই সেদিনের গল্পের একমাত্র প্রেরণা। এমনকি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের সবুজপত্রীয় বিদ্রোহী যৌবনের উচ্চ আত্মঘোষণাও রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে সুলভ নয়। গল্পগুচ্ছের তলে তলে একটি করুণা ও সমবেদনার ফল্গু প্রবহমান। গল্পগুচ্ছের লেখক-বিধাতা-সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার প্রায় সকলেই কিশোর-কিশোরী, তাদের প্রতি লেখক-বিধাতার স্নেহ-বাৎসল্যই প্রকাশ পেয়েছে। সাধনা-যুগের গল্প সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তিতেই এই লিরিকধর্মিতার প্রমাণ পাই। কবি বলেছেন : "একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করেছি, তারই চারিদিকে এই রৌদ্র, বৃষ্টি, নদী-স্রোত, এবং নদী তীরের শর-বন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলেছে।" (ছিন্নপত্র, ২৮ জুন, ১৮৯৫)। সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ সংসারের ভালবাসা আর নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে উদাস পদ্মাপ্রবাহের ফ্রেমে গল্পগুচ্ছের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি বিধৃত হয়েছে। গিরিবালা, উমা, মিনি, মৃন্ময়ী, ফটিক, সুভা, রতন, খোকাবাবু সেদিনের গল্পরাজ্যের নায়ক-নায়িকা, তারা কৈশোর উত্তীর্ণ হয় নি। সেদিন কবির মনে হয়েছিল, "যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না।" (ছিন্নপত্র, ১৬ জুন, ১৮৯২)। তাই এইসব গল্পের মূল কথা শৈশবের সরলতা ও পবিত্রতা, প্রকৃতির কোমলতা ও মাধুর্য।

সবুজপত্রের পর্বে—বলাকা, ফাল্গুনী, পলাতকা রচনাকালে আমরা যে গল্পগুলি পাই, তাদের সুর নোতুন। সে সুর বিদ্রোহের, নবীন যৌবনের। নারীকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেবার আহ্বান শোনা গেল। হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, অপরিচিতা, পয়লানম্বর, তপস্বিনী—এই সাতটি গল্পের সুর ব্যঙ্গের, সমালোচনার, বিদ্রোহের। প্রকৃতিপ্রেমমুগ্ধতার দিন গল্পে এখন অবসিত, নারীর মূল্যবোধ ও যৌবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনার সঙ্গে অচল সমাজের সংঘর্ষ এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। পদ্মাপ্রকৃতির পরিবর্তে এসেছে নাগরিক পরিবেশ, হৃদয়াবেগের জায়গা দখল করেছে বিচার-বিশ্লেষণ, কোমল কাব্যধর্মী গদ্যের পরিবর্তে এসেছে খরধার বাকচাতুর্য, কিশোরী মৃন্ময়ী-গিরিবালা-উমার স্থানে এসেছে পরিণত-বয়স্কা নারী মৃণাল (স্ত্রীর পত্র), অনিলা (পয়লা-নম্বর)। অভ্যাসের অন্ধকার পেরিয়ে মিথ্যা দাসত্বমোহের খোলস ফেলে নারী তার আপন মূল্য অধিকারের জন্য খোলা আকাশের নীচে নীল সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আর মেজো-বৌ নেই, তার স্থানে এসেছে স্পর্ধিতা মৃণাল। আর এদের সকলের চেয়ে অগ্রবর্তিনীরূপে দেখা দিল সোহিনী [ল্যাবরেটরী : তিন সঙ্গী]।

গল্পগুচ্ছের অপর আকর্ষণ তার অতিপ্রাকৃত-রস। সে রসের আধারে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প রচনা করেছেন—কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, মাস্টার-মশাই। কিন্তু প্রাকৃত-রস ও অতিপ্রাকৃত রস—দুয়েরই দিন আজ অবসিত। সবুজপত্রের যুগে এসেছে বাস্তবচেতনা, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, নাগরিক পরিবেশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ঘোষণা, প্রখর ভাষা, প্রখরতর বুদ্ধিযোগ। এর পরের ধাপ 'তিন সঙ্গী'।

দুই

'তিন সঙ্গী' প্রকাশিত হয় যখন তখন রবীন্দ্রনাথ আশী বছরকে স্পর্শ করেছেন (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। এখানে বিজ্ঞানবুদ্ধি ও রিয়ালিজমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

'তিন সঙ্গী'তে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতি যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য : "তিন সঙ্গী বইখানির তিনটি গল্পেরই প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞানসাধনা, প্রধান ব্যক্তিরা সবাই বৈজ্ঞানিক। এমন কি আর্টিষ্ট অভীককুমারকেও বৈজ্ঞানিক বলিতে বাধা নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তাহার আসক্তির জন্য একথা বলিতেছি না, জীবনের প্রতি তাহার নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষাহীন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি—তাহাকে শিল্পের বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে। শেষ কথা গল্পের নবীনমাধব ও অধ্যাপক দুজনেই বৈজ্ঞানিক। ল্যাবরেটরি গল্পটার আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিকতায় পূর্ণ। সোহিনী নিজে বৈজ্ঞানিক না হইয়াও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দীপটির চারিদিকে মুগ্ধ মক্ষিকার মতো ঘুরিয়া মরিয়াছে। 'তিন সঙ্গী'তে বৈজ্ঞানিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণের কারণ কি? ১৩৪৪ সালে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিন সঙ্গীর গল্পগুলি ১৩৪৬ সাল হইতে ১৩৪৭ সালের মধ্যে লিখিত। 'বিশ্বপরিচয়' লেখা শেষ হইয়া গেলেও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াটা কবির মনে সক্রিয় ছিল। তাহারই রূপান্তর কি 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলি? বিশ্বপরিচয়ে যাহা নির্গুণ, তিন সঙ্গী-তে তাই যেন মনের কার্য ও নামধাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত। তিন সঙ্গীর বৈজ্ঞানিকতার ইহা একটা কারণ মনে হয়।" ('বাংলা সাহিত্যের নরনারী')।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে গল্পের উপাদানরূপে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ অশীতিস্পৃষ্ট জীবনে নোতুন করে প্রমাণ দিলেন যে, তাঁর শরীর জরাগ্রস্ত হলেও মন জরার অধীন হয় নি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা নবীন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সখ্য, 'বনবাণী' ও 'বিশ্বপরিচয়'-রচনার যোগফল দেখা গিয়েছে 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে। গল্পগুচ্ছ কবি-অভিলাষের ফল, তিনসঙ্গী বিজ্ঞান-কৌতূহলের ফল। তাই 'তিনসঙ্গী' সবচেয়ে আধুনিক—সে কারণে নির্মোহ সত্যোপাসক, অকুণ্ঠ যৌবনানুরাগী, অলজ্জ রিয়ালিজমের পূজারী।

এই রিয়ালিজম রবীন্দ্র-সাহিত্যে আশ্চর্য ঘটনা। 'এখানকার যুগের সাদায়-কালোয় মেশানো খাঁটি রিয়ালিজম সোহিনী-চরিত্রে বর্তমান', এ'কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবুল করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল কথা শান্তি ও সৌষম্য, ভারসাম্য ও সংযম, শালীনতা ও আস্তিকতা। শেষ জীবনে ছবিতে, গদ্যকবিতায় ও 'তিনসঙ্গী'

গল্পগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘকালের সযত্ন-পোষিত শান্তি ও সংযমের দুর্গ ভেঙে বেরিয়েছেন। চেতন মনের সুনির্বাচিত সুন্দর উপাদান নয়, অবচেতন মনের বিশৃঙ্খল ভয়ঙ্কর উপাদান প্রাধান্য লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। এই মুক্তির পরিচয় গদ্যকবিতায় ভাঙাচোরা জগতে ও 'তিন সঙ্গী'-র সোহিনী-চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে স্বভাবতই আলোকের উপাসক, তাঁর চেতনায় জগৎ যে স্বভাবতই আলোকময়, তা এইসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়েছে। 'প্রান্তিক' ও রোগশয্যায়' কাব্যে অবচেতন অর্ধ-জাগর দুঃস্বপ্নের যে জগৎ ধরা পড়েছে, তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনপেক্ষিত, অপ্রত্যাশিত। অবচেতন লোকের অন্ধকার, ছায়াময় জগতের ভয়াবহতা খুব স্পষ্ট করে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। এই অবচেতন ছায়াময় জগতকে সচেতনভাবে গল্পে-উপন্যাসে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আনেন নি। আর আনেন নি বলেই তিনি টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কী, টমাস মানের সমকক্ষ ঔপন্যাসিক হতে পারেন নি। কিন্তু ছবিতে তা তিনি পেরেছেন। শেষ জীবনের কিছু কিছু কবিতায় তা তিনি প্রকাশ করেছেন যেমন,—

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ।

[প্রান্তিক]

কিন্তু এই দেখা স্বল্পকালস্থায়ী, কবি চেতনার সুষম শান্তি ও আলোকের জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বোদলেঅরের কবিতায় এই ছায়াময় অবচেতনের পরিচয় পাই। তাই মানুষের অপর অর্ধের চেতনা রবীন্দ্রনাথে কচিৎ দেখা যায় বলেই আমাদের স্বীকার করতে হয়। 'তিন সঙ্গী'র নায়িকাচিত্রণে, বিশেষ করে সোহিনীতেই তা খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। অবচেতনলোকের পরিচয়লাভের ফল সোহিনী-চরিত্র। সোহিনীর সতীত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর সমগ্র জীবনের নারীতত্ত্বের মূর্তিমান প্রতিবাদ।

'তিনসঙ্গী'র গল্প উপস্থাপনের ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শেষকথা' গল্পের গোড়াতেই জিওলজিষ্ট নায়ক নবীনমাধব সেনগুপ্তের মুখে লেখক সে-কথা বলেছেন: "জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধরে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। পিছন থেকে সেই প্রাক্‌গাল্পিক

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়।……কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোমান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাই নে।"

নবীনমাধব আরো বলেছেন, "এই জাগ্রত-বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি।" এ তো গল্পকারের নিজের কথাই, তিনি এখন বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই বুদ্ধিভিত্তিক রিয়ালিষ্টিক গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

'ল্যাবরেটরি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ গল্পের গঠন সম্পর্কে একটি সুপ্রযুক্ত মন্তব্য ব্যবহার করেছেন: "জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে, অকস্মাৎ ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।"

'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পেই এই কৌশল অনুসৃত হয়েছে। গল্পের আরম্ভ মন্থর, বাঁধুনি নিপুণ; কিন্তু যখন একটি নিশ্চিত পরিণতি প্রত্যাশিত, তখন লেখক এক ঘায়েই নিশ্চিত পরিণতিকে ভেঙে দিয়েছেন। বিভার প্রতি অভীককুমারের আকর্ষণের পরিণতি ঘটেছে অভীককুমারের অন্তর্ধানে ('রবিবার')। অচিরার নবীনমাধবের প্রতি আকর্ষণের পরিণতি ঘটেছে অচিরার আকস্মিক বিদায়-গ্রহণে ('শেষ কথা')। আর রেবতী-নীলার বিবাহ যখন নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে, তখন উপসংহারে লেখক-বিধাতার অট্টহাস্যে পাঠকের সকল প্রত্যাশা ভেঙে পড়েছে ['ল্যাবরেটরি']।

তিন

'শেষ কথা' গল্পের পরিবেশ ছোটনাগপুরের অরণ্য। ফোর্ডের কারখানায় যন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত ও ইওরোপের নানা কেন্দ্রে খনিজবিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়ে ভূতপূর্ব বিপ্লবী বর্তমানের কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধব সেনগুপ্ত যেদিন আরণ্য পরিবেশে উপস্থিত হল, সেদিন সে ভাবতেও পারে নি তার জন্য কী আশ্চর্য রহস্য এই অরণ্যে রয়েছে। রোদে-পোড়া তার রঙ। প্রাণসার লম্বা দেহ, শক্ত বাহু, দ্রুতগতি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, স্পষ্ট নাক চিবুক কপাল নিয়ে নবীনমাধবের জোরালো চেহারা।

'শেষ কথা' নিঃসন্দেহে প্রেমের গল্প। নবীনমাধব বাংলাদেশের কন্যাদায়িকদের ও ইউরোপ-আমেরিকার মোহিনী নারীকুলের আশাভঙ্গ করেছে। সে নিজেই বলেছে এ ব্যাপারে তার 'স্বভাবটা কড়া'। 'মেয়েদের ভালবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে', সে তাদের ঘৃণা করে। আবার 'মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তারপরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করা'ও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; তার ব্রত জিওলজি-চর্চা, পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা তার কাজ।

ছোটনাগপুরের অরণ্য ধীরে ধীরে নবীনমাধবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সে কবুল করেছে যে তার নিজের মধ্যে যে আরণ্যক লুকিয়ে ছিল, সে আজ বেরিয়ে এসেছে, সে যুক্তি মানে না, মোহ মানে। অরণ্য-প্রভাব সে কবুল করেছে এই সংহত মন্তব্যে—'বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত সুর। রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।' যে এই ভাবে তার জীবনে আরণ্য-প্রভাবকে গ্রহণ করেছে, তাকে নির্মোহ কঠোর বিজ্ঞানী বলে সম্পূর্ণ মেনে নিতে মন সায় দেয় না, সোনারতরী বনবাণীর কবির অনুভূতি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে নবীনমাধব যখন রেডিয়ম-কণা সন্ধান করে চলেছে, তখন দেখা পেল অচিরার। তার 'শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করেছে' বলে নবীনমাধবের মনে হল।

বিজ্ঞান সাধকের গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে এই অরণ্যভূমির আবশ্যকতা আছে; কিন্তু তার জীবনে আরণ্য-প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার আবশ্যকতাও কম নয়। আর অচিরা? তার আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্ররূপেও অরণ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

অচিরাব সাধনা আদর্শের সাধনা। ভালবাসার, সতীত্বের সাধনা। অচিরা তার একদা-প্রত্যাখ্যাত প্রেমকে মনে মনে পূজা করেছে, প্রেমিকের ব্রতচ্যুতিতে তার সংকল্পচ্যুতি ঘটে নি। অচিরা বলেছে—"ভালবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস।· তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। ·· এখন আমার কাছে ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই। ···আপনাদের (পুরুষদের) সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু · বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ—অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

কিন্তু অরণ্যের প্রভাবে, সেইসঙ্গে নবীনমাধবের আকর্ষণে অচিরা এই তপস্যা থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে বলে আক্ষেপ করেছে, বলেছে—"দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি—যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছে থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।"

অরণ্যের অন্ধশক্তি নবীনমাধবকে আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি শুনিয়ে যাদু করেছে, আর অচিরা তাকে প্রবৃত্তিরাক্ষস বলে মনে করেছে ও তার হাত এড়াবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে। নবীনমাধব ও অচিরা—উভয়েরই চরিত্র-প্রকাশের যোগ্য পটভূমি এই আরণ্য পরিবেশ। এই সুপ্রাচীন অরণ্যের মধ্যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে। তাই অচিরাকে নবীনমাধবের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়েছে। 'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুস চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শ গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে।' এরই প্রভাবে অচিরা পালাতে চেয়েছে এবং আকস্মিকভাবে পরিচয়কে খণ্ডিত করেছে। এই পলায়নের মধ্য দিয়েই অচিরা প্রাণশক্তিকে স্বীকার করে গেছে। সতীত্বের আদর্শ আদিম প্রাণের শক্তির কাছে অসহায়ভাবে পরাজিত হতে বাধ্য, নবীনমাধবকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে অচিরা স্বীকার করেছে।

'শেষ কথা' গল্পের অরণ্যপটভূমি গল্পের প্রয়োজনেই এসেছে। তবু তার স্বতন্ত্র মহিমা আছে। তার উদাত্ত সুর, তার মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, তার রহস্যময় গুঞ্জন প্রাণে যে সাড়া জাগায়, এই গল্পে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

চার

"রবিবার গল্পটি ও ল্যাবরেটরি গল্পের পারিপার্শ্বিক একজাতীয় এবং দুটিই শেষের কবিতার ইঙ্গ-বঙ্গী সমাজ, না এদেশী না ওদেশী, শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার আচরণে কলিকাতার বিত্তশালী কুশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের চিত্র। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কাছে হইতে এই সম্প্রদায়টিকে কটাক্ষে দেখিয়াছেন। এবং সময়মতো ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে স্মৃতিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি যে ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বাস্তবপন্থী হইতে পারেন এই সব চিত্র তাহার প্রমাণ।"

[প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প']

'রবিবার' গল্পের অন্যান্য পাত্রপাত্রী থেকে নায়িকা বিভা স্বতন্ত্র। সে আস্তিক। তার চারদিকে শুচিতা ও সম্ভ্রম বিরাজমান, তার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। প্রগতি-সমাজের প্রধান পুরুষ দুর্দান্ত নাস্তিক অভীককুমার তাকেই ভালোবাসে। "বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ কবে আবিষ্কার করবে বলো"—এই বলে' অভীক আত্মসমর্পণে উন্মুখ। কিন্তু বিভার মৃত পিতার নির্দেশানুযায়ী অভীক পাত্র হিসাবে অনুপযুক্ত।

আর বিভার কথায় অভীক 'অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার অট্টহাসি।' "অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ,

চিবুকটা ঝুলছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে।" অভীক ঘোরতর নাস্তিক, আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণ পিতার ত্যজ্য-পুত্র। অভীক চিত্রকর, আবার মেকানিক। সে মোহমুক্ত আর্টিস্ট, ভক্তের দল জয়ধ্বনি দিয়ে বলে, অভীক বাঙালি টিশিয়ান। অভীককুমার আসলে অমিত রায়ের (শেষের কবিতা) চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। যে সমাজের বিরুদ্ধে অমিত রায়ের প্রতিবাদ তাকেই সে স্বীকার করে বিবাহ করেছে। অভীকও অদূর ভবিষ্যতে হয় তো তাই করবে অথবা না-ও করতে পারে, আপাততঃ অভীকের আর্টিস্ট-খ্যাতির আশায় সমুদ্রযাত্রায় কাহিনীর আকস্মিক সমাপ্তি ঘটেছে।

এই গল্পরচনার আগেই ইওরোপ-আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অস্বীকৃত ছায়ালোক, অন্ধকার জগৎ, স্থূল আদিম পরুষ রুক্ষ অবচেতন-লোকের প্রতিভাস ধরা দিয়েছে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। চিত্রী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ দুর্ধর্ষ, নিয়মের বাইরে তাঁর দুঃসাহসী পদক্ষেপ। অভীককুমারও শিল্পজগতের কালাপাহাড়। চিত্রীর মর্যাদা দ্বারা সে বিভাকে অভিভূত করতে চেয়েছে। তার জীবনে সবই অস্থায়ী, কেবল 'বী মধুকরী' বিভা তার কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ-শক্তি। সেকারণে বিদেশযাত্রার পূর্বে লিখিত পত্রে বিভার কাছে অভীককুমারের স্বীকৃতি: 'তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাওনি, কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, এই নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারেনি—বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো একভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি।—তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ আমার মনের মধ্যে। যুক্তি-তর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছ আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।' এখানেই বিভার জয়।)

অশীতিস্পৃষ্ট রবীন্দ্রনাথের চরম কীর্তি সোহিনী-চরিত্র। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন পাঠকমনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। এই গল্পের নায়ক-নায়িকা অ-সাধারণ, ততোধিক অসাধারণ তাদের ভালোবাসা। এঞ্জিনিয়র নন্দকিশোর আর পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনীর মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন, তা শাস্ত্রনিয়মাধীন নয়। সোহিনী তার বিয়ে করা স্ত্রী নয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু। নন্দকিশোর অসবর্ণ-বিবাহ পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।' সোহিনী নন্দকিশোরের যোগ্যা সহধর্মিণী, নন্দকিশোরের বিজ্ঞানসাধনাকে সোহিনী প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল, ল্যাবরেটরিতে

সোহিনী ছিল নন্দকিশোরের যোগ্যা সহকর্মিণী। তথাকথিত সতীত্ব রক্ষায় সোহিনীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, নীলা তার মেয়ে বটে, কিন্তু সে নন্দকিশোরের ঔরসজাত কন্যা নয়, কার তা বলা কঠিন। সোহিনী নিজেই বলেছে যে তার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে আর নন্দকিশোরের মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। সোহিনী আরও বলেছে: 'অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি। কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম।' এইভাবে উভয়ের মিলন হল। এই মিলনের মর্যাদা নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সোহিনী প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছে। স্বামীর প্রতি আনুগত্য তার কাছে সতীত্বরক্ষা নয়, সায়ান্সে উৎসাহ, ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজকে ঠিকমতো চালানোই সতীত্ব। সোহিনী বলেছে, 'আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না।'

এই অকুণ্ঠ অলজ্জ আত্মস্বীকৃতি রবীন্দ্র-গল্পে তথা বাংলা গল্পে দ্বিতীয়রহিত।

নন্দকিশোর দুর্ধর্ষ পুরুষ। কর্মীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা স্বোপার্জিত। মেধাবী ছাত্র, পরিশ্রমী এঞ্জিনিয়র সংসার থেকে নিজের মূল্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর কোনো খুঁতখুঁতানি ছিল না। অর্থ করেছিলেন প্রচুর। বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নন্দকিশোর অর্থলোভী ছিলেন না, বিদ্যালোভী ছিলেন। এই পোড়া দেশে জ্ঞানের উদার ক্ষেত্র—গবেষণার প্রশস্ত অবসর সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই কাজে তিনি যোগ্যা সঙ্গিনী পেলেন সোহিনীকে। সোহিনীর পূর্ববর্তী জীবন নির্মল নয়, নিভৃত নয়। তার সঙ্গে নন্দ-কিশোরের মিল ব্রতের মিল। সুকঠোর সুন্দর তার চেহারা। নন্দকিশোর 'দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ঝক্ করছে ক্যারেকটরের তেজ—বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।' নন্দকিশোরের মনের কষ্টিপাথরে দাগ পড়ল সোহিনী নামক দামী ধাতুর।

এহেন সোহিনীর মেয়ে নীলিমা ওরফে নীলা। মায়ের সঙ্গে তার মিল এইখানে যে পুরুষসঙ্গলাভের তার কোনরকম বাছবিচার নেই, অমিল এইখানে যে সোহিনীর দুর্লভ ক্যারেকটরের তেজ নেই। তাই সে নিজে ডুবেছে, তরুণ বিজ্ঞানী ডক্টর রেবতী ভট্টাচার্যকে ডুবিয়েছে এবং জাগানী ক্লাবের দলবল নিয়ে সোহিনীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে নন্দকিশোরের সাধনক্ষেত্র ল্যাবরেটরি ডোবাতে চেয়েছে।

নীলা সোহিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট চরিত্র, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। 'পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে—তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই।

শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে সে লোভের বিষ জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত।' এই মতলবে নীলা পিসিমার অঞ্চলাশ্রয়ী কাপুরুষ রেবতীকে লোভ দেখিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে।

আর সোহিনী? সে বলেছে: 'তাঁর (নন্দকিশোরের) ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝো মাঝো ধূপধূনা জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। —আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। —মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে—পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।'

সোহিনীর কনফেশ্যন এত মৌলিক যে আমরা বিস্মিত হবার অবকাশ পাই না। তার ক্যারেকটরের তেজ ঝক্‌ঝক্ করছে, 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি তার আভায় উজ্জ্বল। নীলার মতো আত্মতৃপ্তা ভোগবিলাসিনী ও রেবতীর মতো কাপুরুষের পক্ষে সোহিনীকে বুঝা কঠিন। একমাত্র নন্দকিশোর মল্লিক বুঝে সোহিনীর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। আর বুঝেছেন অধ্যাপক চৌধুরী।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের উপসংহারে নীলা-রেবতী মিলন-পরিণতি আকস্মিকভাবে খণ্ডিত, রেবতীর অধঃপতনে লেখক-বিধাতার অট্টহাস্য শুনতে পাই। আর বিজ্ঞানী রেবতীর এই শোচনীয় অধঃপতনের পটভূমিতে নন্দকিশোরের যোগ্যা উত্তরসাধিকা সোহিনীর চরিত্র আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সোহিনী-চরিত্রচিত্রণে অশীতিপর কবি যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তা সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য। আজ পর্যন্ত বাংলা গল্পে কারেকটরের এই তেজ আর কোনো মেয়ে দেখাতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজন্মকালের সংস্কারের বন্ধনকে অস্বীকার করে তাঁর মনের সজীবতা ও তারুণ্যের আশ্চর্য পরিচয় এখানে উপস্থিত করেছেন।

নন্দকিশোরের মতো বাঙালি পাঠক কি সোহিনীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেবে?

'ল্যাবরেটরি' গল্প প্রকাশিত হবার পর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: 'আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি করছে তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে, এটা লেখা ওঁর উচিত হয় নি?—আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কি রকম,—তার মনের জোর, তার লয়ালটি,

এই হল আসলে বড় কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে। কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাত সেইটেই তো বেশী করে দেখিয়েছি।' [শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ : 'কবিকথা' প্রবন্ধ : বিশ্বভারতী পত্রিকা' কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ]।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথের শক্তির শেষতম ও নবতম পরিচয় সোহিনী-চরিত্র।

পাঁচ

'তিন সঙ্গী'র স্বাতন্ত্র্য কেবল গল্প-উপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণে নয়, ভাষাতেও পরিস্ফুট। জরাবিজয়ী দুঃসাহসী তারুণ্যশক্তিসম্পন্ন শিল্পীর যোগ্য বাহন এই সাবলীল নমনীয় অলংকৃত ভাষা। এই গল্পগ্রন্থের বর্ণনায় যে অনায়াসনৈপুণ্য, ভাষাচালনায় যে ক্ষিপ্রতা, শব্দপ্রয়োগে যে মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়, তা গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবাহক। 'তিন সঙ্গী'র ভাষায় যে নাটকীয় উপাদান ও সর্বগামিতার লক্ষণ বর্তমান, তা এককথায়, চলতি বাংলা গদ্যের চরম ঐশ্বর্যরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে অলংকার দৃশ্যমান নয়, কলাকৌশল স্পষ্ট নয়। নমনীয়তা ও কাঠিন্যের রমণীয় পরিণয় এই ভাষায় সাধিত হয়েছে।

'শেষকথা' গল্পের নায়ক যখন অরণ্যে 'পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে' বেড়াচ্ছিল, সে সময়ের বর্ণনা এইরূপ।—

'পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে যখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা মৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া-ফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম—তনিকা।'

'তিন সঙ্গী'র ভাষা এই ছিপ্ছিপে নদীর মতো। যৌবনের উচ্ছলতা ও বসন্তের সরসতা, রঙের মত্ততা ও প্রাণের চাঞ্চল্য এই ভাষায় বর্তমান। চলতি বাংলা গদ্যের উচ্ছ্রিত রূপ 'তিন সঙ্গী'র ভাষা। পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রইল এই ভাষায়।

৭

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকা

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকারা গত শতকের শেষপাদ থেকে এই শতকের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত বাঙালি নারীসমাজের প্রতিনিধি। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা আমাদের চেনা সংসারের নারী নয়। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, শৈবলিনী, দেবীচৌধুরাণী, শ্রী, জেবুন্নিসা রোমান্সলোকের অধিবাসিনী। আমরা তাদের নিয়ে ঘর করতে পারি না, দূর থেকে তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করি। সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী,কমলমণি, ইন্দিরা, সুভাষিণী, ভ্রমর, রোহিণী দূরবর্তিনী নয়, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি, একথা স্বীকার্য। তবু একথা মনে হয়, সূর্যমুখী-কুন্দ-ভ্রমর-রোহিণী সুলভ নয়, পরিচিত সংসারে সর্বদা তাদের দেখা পাই না। তেমনি রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্বের নায়িকা - বিভা, সুরমা—দূরবর্তী ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সলোকের অধিবাসিনী।

আমাদের পরিচিত সংসারের নায়িকার আবির্ভাব ঘটল 'চোখের বালি'তে। দমদমের বাগানে চড়িভাতিতে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাসে যখন তরুপল্লব মর্মরিত হতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের পাতার মধ্য থেকে কোকিল ডাকতে লাগল, তখন বিহারীর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বিনোদিনীর রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নৈপুণ্যে বিনোদিনীর কোমল হৃদয়টুকু দেখিয়েছেন: "বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই।" [চোখের বালি, পরিচ্ছেদ ১৭]

বিলাসিনী বিদ্রোহিণী নয়, কল্যাণপরিপূর্ণা পূজারতা নারীরূপেই রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে দেখেছেন। বিহারীর মনে হয়েছে 'সেবায় সান্ত্বনায় নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে বিনোদিনী মর্তবাসিনী দেবী।' [পরিচ্ছেদ ১৯]

তবু এই মর্তবাসিনী দেবীকে বিহারী ভুল বুঝেছে। ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় যেদিন বিহারীর বাড়িতে বিনোদিনীর আকস্মিক আগমন ও শর্তহীন আত্মসমর্পণ ঘটেছে, সেদিন বিহারী তাকে প্রত্যাখান করেছে। প্রত্যাখ্যাতা বিনোদিনীর তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প দূর হয়েছে। বিহারী তার প্রেমকে নাটক, নভেল বলে ব্যঙ্গ করেছে, বলেছে, 'নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।'

বিহারী তাকে বারাসতের নিকটবর্তী গ্রামের বাড়িতে ফেরত পাঠাতে চেয়েছে।

"বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'ওইটুকু দুর্বলতা রাখো, ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।'

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগল বার বার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, 'জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তার পরে আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।' বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্তকালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, 'আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন আছে।'

বিনোদিনী একটুখানি স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, 'সেই ট্রেনেই যাইব।'

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্ফুট গৌরসুন্দর

দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, 'শুতে যাসনি যে।' বসন্ত কোনো উত্তর না দিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।" [পরিচ্ছেদ ৩৫]

দুর্দম প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির নায়িকা এভাবেই ক্রন্দনে স্নেহে বাৎসল্যে তার সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনাকে ভুলতে চেয়েছে। রবীন্দ্র-রচিত নায়িকাদের পুরোবর্তিনী বিনোদিনীর কাছে এই লগ্নে আমরা বিদায় নিতে পারি।

নৌকাডুবির দুই নায়িকা কমলা ও হেমনলিনী সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য কম, কারণ 'নৌকাডুবি' শেষ পর্যন্ত গল্প থাকে নি, রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে, উপন্যাসে ঘটনা-প্রাচুর্য প্রাধান্য পেয়েছে। রমেশ-কমলার দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি অনায়াসে মোচিত হয়েছে, নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার মিলন সাধিত হয়েছে। গল্পের মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনা অস্বীকৃত, রমেশের নায়কত্ব অকস্মাৎ খণ্ডিত, হেমনলিনীর কাহিনী অসম্পূর্ণতায় খণ্ডিত। কমলা হিন্দুনারীর উদাহরণ, সজীব চরিত্র নয়। নৌকাডুবির গল্পে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, জীবন-জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত থেকে যায়। কিন্তু হেমনলিনী-চরিত্র সুচরিতা-লাবণ্য-কুমুদিনীর পুরোবর্তিনী রূপে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বিশাল আয়তন 'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা যতটা আছে উপলব্ধি ততটা নেই। কারণ এই উপন্যাসকে আমরা এপিক উপন্যাস বলে ধরে নিয়েছি, এর বিশ্বাত্মবোধ, ভারতবোধ ও সুগভীর জীবনবোধে বিমুগ্ধ হয়েছি। গোরার অনেক বক্তব্যই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথেরও। আনন্দময়ীর প্রতি গোরার শেষ উক্তি—'মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ'—আমাদের শ্রুতিকে আচ্ছন্ন করেছে, জীবনধর্মী কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের সংলাপে কান পাতি নি। তথাপি সুচরিতা ও ললিতার ব্যক্তিগত জীবন, তাদের প্রেম ও প্রেমের পরিণতি কম আকর্ষণীয় নয়। গোরার ভাবধর্মী আদর্শবাদী চরিত্রের বিশালতা ও মানবিক আবেগ-দীপ্তি এবং ভারতসত্তার মূর্তিমতী প্রতিমা আনন্দময়ীর চরিত্রের ব্যঞ্জনা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। তার ফলে সুচরিতা ও ললিতা আমাদের উপযুক্ত মনোযোগ পায় না। শান্ত নম্র আত্মমগ্ন মাধুর্যময়ী সুচরিতা আর কঠিন চরিত্রশক্তি-দৃপ্ত যুক্তিনির্ভর সুনিশ্চিত ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠিতা ললিতাকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকা নায়িকারূপেই গড়ে তুলেছেন।

পরেশবাবুর বাড়িতে পানুবাবুর সঙ্গে প্রবল তর্কযুদ্ধের অবসানে গোরার দৃষ্টিতে সুচরিতার যে রূপ ধরা পড়ল, তাতে বাসনার প্রগল্‌ভতা নেই, যৌবনের প্রমত্ততা নেই। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ যত্নের সঙ্গে এই মুহূর্তটি গড়ে তুলেছেন। গোরার প্রতি সুচরিতার আকর্ষণের প্রকৃতি বর্ণনা করে' রবীন্দ্রনাথ একটু আগেই বলেছেন,

"আজ সুচরিতা তাহার (গোরার) মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়া যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।" [পরিচ্ছেদ ২০]

এই মুহূর্তে প্রেম নিঃশব্দ অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে সুচরিতার হৃদয়কে অধিকার করল। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-মানুষকেই বড়ো করে তুলে ধরেছেন, গোরাকে তার সকল মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের গণ্ডীর বাইরে এনে দেখেছেন, সুচরিতা তার সকল অভ্যস্ত সংস্কার ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এসে গোরাকে দেখেছে।

পরাজিত পানুবাবুর প্রস্থানের পর-মুহূর্তে তর্কের ধূলা অপসৃত হতেই গোরা সুচরিতাকে আবিষ্কার করেছে—

"গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়! তাহার মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডৌলটি কী সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশ খণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে। নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্বে কোনোদিন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে-সমস্তের প্রতি তাহার একটা ধিক্‌কারভাব ছিল—আজ সুচরিতার দেহে তাহার নূতন ধরনের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভালো লাগিল; সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইল। দীপালোকিত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি,

তাহার গৃহসজ্জা, তাহার পরিপাট্য লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল।" [পরিচ্ছেদ ২০]

বারো বছর আগে 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে 'কল্যাণী' নারীর ছবি এঁকেছিলেন, আজ 'গোরা' উপন্যাসে তা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিল—

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে।

বঙ্কিম-প্রণীত নায়িকা থেকে রবীন্দ্র-রচিত নায়িকা যে দূরবর্তিনী, তার স্পষ্ট পরিচায়ক সুচরিতা।

মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের দুটি পূর্বতন উক্তি: 'প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব।'

[অখণ্ডতা, পঞ্চভূত]

"আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুবলক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে—......যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেইদিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা।" [নরনারী, পঞ্চভূত]

স্বীকার করতেই হয়, বঙ্কিমের নারীচরিত্রে এই ভাবটি অনুপস্থিত।

স্টীমারযাত্রায় সহযাত্রিণী ললিতার কথা শুনে, তার আচরণে ও ব্যবহারে বিনয়ের মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে।

"ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।" [পরিচ্ছেদ ২৯]

এখানেই বিনয়ের পরাভব সম্পূর্ণ হল, সে ললিতার প্রেমে বিক্রীত হল। অন্ধকার রাতে স্টীমারের ডেকে পায়চারি করতে করতে নিদ্রিতা ললিতার এক অনাস্বাদিত-পূর্বরূপ বিনয়ের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হল।

"একটি অপরিচিত শয্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্যটুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া

অতি শান্তভাবে যাতায়াত করিতেছে, সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারীহৃদয়ের কল্যাণকোমলতায় মণ্ডিত হাত দুইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানার উপর পড়িয়া আছে, কুসুমসুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমণীয় গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সংগীতের মতো স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে—বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।"

[পরিচ্ছেদ ৩০]

চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়িকা দামিনী বিদ্যুৎ-শিখা। 'আকাশের চাঁদের' উপাসনায় দামিনী নিজেকে শূন্য করে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, শ্রীবিলাসের উদার নিশ্চন্ত-নির্ভর বাহুর আশ্রয়ে। কিন্তু তখন আর সময় নেই, জীবনের পরম লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহিনী দামিনীর নানা রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। চঞ্চলা দামিনী গুরুজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে 'স্থির সৌদামিনী' হয়ে উঠেছে যখন তখনই একদিন শীতের দুপুরের বেলায় শচীশ—"দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো। ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।"

[শচীশ, ৭, চতুরঙ্গ]

শচীশের ডায়ারিতে অন্তরীপের গুহায় হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা অবস্থায় তার উপলব্ধিতে দামিনীর আর এক রূপ ধরা পড়েছে :

"জানি না কতক্ষণ পরে—সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়—অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

তারপরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু।······

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোঁয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর এক রাশি কেশর আসিয়া

পড়িয়াছে। ধড়ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না ?" [শচীশ, ১০, চতুরঙ্গ]

দামিনীর বঞ্চিত নারীজীবনের সংকেতচিত্র হিসাবে এই বর্ণনা তুলনারহিত।

দামিনী রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনন্যা নায়িকা। চঞ্চলা বিদ্যুৎ স্থির সৌদামিনীতে পরিণত হয়েছে, পুনর্বার জলে উঠেছে, অসহ্য হৃদয়জ্বালায় আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে, তারপরই নারীহৃদয়ের বেদনা গুহামধ্যে ক্রন্দনে উৎসারিত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। পর মুহূর্তে দামিনী কঠিন হয়ে উঠে পুনর্বার কোমল হয়েছে।

"পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না।····· তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল ; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।" [দামিনী, ৫, চতুরঙ্গ]

এখানেই দামিনীর গতি ক্ষান্ত হল না। আবার সে শচীশের কাছে ফিরে এল, রসের রাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ চাইল। আগুন দিয়ে আগুন নেভানো যায় না— এই উপলব্ধিতে দামিনীর জীবনে মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজল। শেষ পর্যন্ত মাটির পৃথিবীতে সে ফিরে এসেছে, শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে। কিন্তু দামিনীর মধ্যে যে প্রলয়ের আগুন জলছিল, তার দাহনে দামিনীর জীবনীশক্তি ক্ষয়ে হয়ে এল। গুহা থেকে ফিরে আসার পর তার বুকে যে ব্যথা হয়েছিল, সে ব্যথা তাকে গ্রাস করেছে। শ্রীবিলাসকে নিয়ে মাটির পৃথিবীতে দামিনীর ভালোবাসার স্বর্গ গড়ে তোলার অভিলাষ পূরণ হল না। ফাল্গুনের প্রথম রাতে জোয়ারের ভরা অশ্রু বেদনায় শ্রীবিলাসের পায়ের ধূলা নিয়ে দামিনী চিরবিদায় নিল। তার শেষ কথা, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

বিদ্যুৎশিখাময়ী দামিনীর জীবনের এই করুণ উপসংহার রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থায়ী দাগ রেখে গেল।

এই সঙ্গেই দেখা দিল 'ঘরে বাইরে'র নায়িকা বিমলা। বিমলার মধ্যেও বিদ্যুৎ ছিল, অনলচ্ছটায় সে-ও আত্মবিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ হয়ে ফিরে এসেছে আপন গৃহকোণে। বিমলার মতো আধুনিকা দীপ্তিময়ী নায়িকা সংখ্যায় বিরল। কী তার আত্মবিশ্লেষণক্ষমতা, কী তার চরিত্রবল, কী তার সৌন্দর্যবল !

নিজের কথা এত নিপুণ ভাবে এর পূর্বে আর কোনো বাঙালি নায়িকা উপস্থিত করতে পারে নি।

"আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের

কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। একালের সঙ্গে যদি আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম—মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ-কথা। এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কিনা সেটা এক মুহূর্তের জন্য ভাববার দরকার নেই।"

আত্মশক্তির উদ্বোধন, আত্মপ্রকাশের তাগিদ, যুগের তরঙ্গবিক্ষোভের মধ্যে আত্মস্থ হবার সাধনা সবুজপত্রের যুগকে চিহ্নিত করেছে। বিমলার মধ্যে যুগের এইসব লক্ষণ নির্ভুলভাবে উপস্থিত। সে-কথা বিমলা নিজেই বলেছে:

"সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বার বার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে 'আমরা চাই'—সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ কোনো সম্ভব অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টিকতে পারবে না"। তাদের কেবল এক কথা 'আমরা চাই'।......সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা, সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি!"

বিমলার এই বিদ্রোহিনী মূর্তি দেখতে দেখতে প্রলয়ংকরী নারীমূর্তি রূপে দেখা দিয়েছে। তার অনলশিখায় বিমলার দাম্পত্যজীবনের নিভৃত লোক আলোকিত হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যজীবনের সম্পর্ক, সীমা ও স্বাধীনতাকে সে যাচাই করে নিতে চেয়েছে। সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বঙ্গদেশের চিত্ত জেগে উঠেছে, রাজনীতির রুদ্রপন্থা শান্ত বাঙালি ঘরের আঙিনায় এসে মেঘ-গর্জনে বলে উঠেছে—অয়মহং ভোঃ! সেদিন ইতিহাস-রথের চক্রনেমিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। সে আগুন স্পর্শ করেছে বিমলাকে, নিখিলেশকে, সন্দীপকে। এই দেশব্যাপী প্রবল আবেগ বিমলার জীবন-মূলে নাড়া দিয়েছে। বিমলার কথায়, "আমার জীবনের মধ্যে আর এক সুর শোনা গেছে। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করছে। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগল একটা কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল বলে, তার জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে-ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে-ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে-ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে।"

এই বাঁধন-ছেঁড়া মত্ততার মাঝে বিমলা বেরিয়েছে আত্মানুসন্ধানে। তার সেই পরমাশ্চর্য আত্মসমীক্ষার ইতিহাস 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিমলার মনে হয়েছে, এক জনমে ঘটল জন্মান্তর। কিন্তু সে নিখিলেশকে টলাতে পারল না, তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করতে পারল না। এ তার পরাজয়, এ তার লজ্জা!

"এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এখন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপরে পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে! তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা!"

বিমলা এইখানে এসে প্রথম ধাক্কা খেল। তারপরই কিশোর অমূল্যের কাছ থেকে ভাইফোঁটার প্রণামী বলে তার পিস্তলটা চেয়ে নিল।

"অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের মধ্যে নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।"

আবার সন্দীপের আবির্ভাব, আবার বিমলার হৃদয়ের উলঙ্গ পাগলামি। কিন্তু টাকার সন্ধানে বেরিয়ে বিমলা যখন উদ্‌ভ্রান্ত, তখনি সন্দীপ সম্পর্কে তার মোহ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। ঝক্‌ঝকে গিনিগুলো দেখে সন্দীপ আনন্দে লাফিয়ে উঠে বিমলার কাছে ছুটে এল, তখনি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিমলা সন্দীপকে ঠেলা দিল। "পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তারপরে সেখানে সে মাটিতে পড়ে গেল।" সেইমুহূর্তে বিমলার আত্মবিশ্লেষণ নির্ভুল।

"মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্য ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।"

এখানেই বিমলার জীবনের স্রোত বিপরীত গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করল।

এবার বিমলার ঘরে ফেরার পালা শুরু হল। সন্দীপ সম্পর্কে সে যতই মোহমুক্ত হতে থাকল, নিখিলেশের প্রতি তার প্রেম ততই ফিরে এল। গয়না বিক্রি করে টাকা পূরণ করে দেবার মধ্যে বিমলার মানরক্ষার প্রয়াস ছিল, সেই সঙ্গে ছিল মোহমুক্তির সূচনা। "যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। সেইজন্য সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই।"

বিমলার জীবনে বিপরীত স্রোত প্রবাহ শুরু হতেই তার জীবনে সংকট এল। "দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ।"—নিখিলেশের এই উপলব্ধিতে বিমলাকেও পৌঁছতে হবে, এই-ই তার বিধিলিপি। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতবেগে এই উপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়েছে, সন্দীপের মোহ থেকে বিমলার সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে, বিমলা ফিরে এসেছে নিখিলেশের কাছে—"আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন? কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা যাব। তারপরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম।"

বিদ্রোহিণী নায়িকা বিমলা ফিরে এল তার আবাসক্ষেত্রে। পূর্বোবর্তিনী দামিনীও ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু তার জীবনে পরমলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলেই তার আর ফেরা হল না। দামিনী মৃত্যু-মুহূর্তে শ্রীবিলাসের পায়ের ধূলো নিয়ে বলেছিল, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।' আর বিমলার এ জন্মেই জন্মান্তর ঘটে গেছে, তাই সে নিখিলেশের পা বুকের মধ্যে চেপে ধরে প্রার্থনা করেছে: 'ওই পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ওইখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?' বিমলার যাত্রার লক্ষ্য সেই সাগরসঙ্গমে যেখানে ভালোবাসা পূজার সমুদ্রে মিশেছে। দামিনী সেই সাগরসঙ্গমের কথা শুনেছে, কিন্তু এ জন্মে সেখানে পৌঁছবার সময় আর পেল না।

এই দুই বিদ্রোহিণী নায়িকার পরে যে দুই নায়িকার দেখা পাই—'যোগাযোগে'র কুমুদিনী আর 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য—তাদের পুরোবর্তিনীরূপে সুচরিতা পূর্বেই দেখা দিয়েছে। সুচরিতার মতো কুমুদিনী আর লাবণ্য শান্ত, নম্র, লজ্জাবতী, মাধুর্যময়ী, কল্যাণী নারী।

মধুসূদনের জগতের রূঢ়তা, স্থূলতা, ধনের মত্ততা আর আস্ফালনের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে রজনীগন্ধার মতো শুভ্র পবিত্র শান্ত নম্র এক নারী—তার নাম কুমুদিনী।

বস্তুত তারা দুজনে দুই লোকের অধিবাসী; দুজনের বিবাহ অ-সম বিবাহ। এই বিবাহে কল্যাণ নেই, মাধুর্য নেই, শান্তি নেই, আছে বিরোধ, তিক্ততা। মধুসূদনের মূঢ়তা, রূঢ়তা, স্থূলতা, মত্ততার কাছে কুমুদিনীর সকরুণ আত্মদান যে ট্রাজিক পটভূমি রচনা করেছে, তারই পটে কুমুদিনীর মানস-মৃত্যুবেদনাকে রবীন্দ্রনাথ রেখান্বিত করেছেন। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুদিনীর সম্পর্ক যেন খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক: "একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কুমুদিনী দেবতাকে ডাকছে।" [পরিচ্ছেদ ২৩] মোতির মা'র চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য পড়ে চমকে উঠি, কুমুর অসহায়তা বড় বেশী চোখে পড়ে।

উষালগ্নে সদ্যস্নাতা কুমুর ছবিটি রবীন্দ্রনাথ বারবার দেখিয়েছেন।

"অন্ধকার থাকতেই স্নান করে পূর্বদিকে মুখ করে কুমু ছাদে এসে বসেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া—সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সুতোর সাদা শাড়ি, সরু কালো পাড, আর শীত নিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি রেশমের ওড়না।" [পরিচ্ছেদ ২৮]

কুমুদিনীর এই ধ্যানরতা মূর্তিটি আমরা বার বার দেখেছি। লেখকের মমতায় অভিষিক্ত হয়েছে কুমু। কুমুকে আমরা বাইরে থেকে ভুল বুঝি, তার মনের জোর বুঝতে পারি নে। আত্মশক্তিতে কুমু অজেয়, মধুসূদন তার কাছে বারবার হেরে গেছে। মধুসূদন অর্থ আর শক্তির দম্ভ করেছে, নত হয়েছে, অভিমান করেছে, ক্রোধ করেছে, অনুতাপ জানিয়েছে, ঈর্ষায় জ্বলেছে, কিন্তু কুমুদিনীর মনকে জয় করতে পারে নি। আসলে মধুসূদনের ভূমিকাই করুণ, লেখক ধিক্কার দিয়েছেন তার মূঢ়তাকে, স্থূলতাকে, বর্বরতাকে। কুমুদিনীর অধিষ্ঠান তার জগৎ থেকে অনেক উর্ধ্বে—যেখানে বসে কুমু গান করে 'পিয়া ঘর আয়ে', গাইতে গাইতে কুমুর দু চোখ ভরে ওঠে, এক অপরূপ দর্শনে অন্তরের আকাশ আলো হয়ে ওঠে। মধুসূদন তার লোভ, ঈর্ষা আর দম্ভের দীর্ঘ বাহু বাড়িয়েও কুমুকে ছুঁতে পারে না।

যোগাযোগের ভৈরোঁ রাগিণীর আলাপে মুখর নূরনগরের আকাশ থেকে আমরা শিলঙের পাইনবনের কাজল-কোমল ছায়ায় ঝর্ণার কলতানমুখরিত পাহাড়ী পথে উত্তীর্ণ হই, তখন এক নোতুন সৌন্দর্যলোকে পদার্পণ করি। আর সেখানেই দেখা হয় নায়িকা লাবণ্যের সঙ্গে। লাবণ্যের আবির্ভাবের পটভূমিটি আশ্চর্য; একদিকে জঙ্গলে ঢাকা খাদ, অপরদিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা। সেই সরু পথে দুটি মোটরগাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা, পরস্পর আঘাত লাগল, অপঘাত ঘটল না।

"একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দরপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। ... ...

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনুদীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মছায়ায় নিবিড়স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দুহাতে দুটি সরু প্লেন্ বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।"

লক্ষণীয়, এর পূর্বে রবীন্দ্র-উপন্যাসের আর কোনো নায়িকাকে এত খুঁটিয়ে স্পষ্টরূপে আঁকা হয় নি। শেষের কবিতা উপন্যাসের আধুনিকতা এই বর্ণনায় সঞ্চারিত। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, শাদামাঠা উপমা, দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি বর্ণনা, ধারাবিবরণ: সবটা মিলিয়ে এক নোতুন ঢঙের বর্ণনা। তবু এই বর্ণনাতেই লাবণ্য সম্পর্কে পূর্বাভাস পাই,—সে যেন সমুদ্র-মন্থন-উত্থিতা লক্ষ্মী। চারদিকের সব-কিছু হতে স্বতন্ত্র। এই লাবণ্যময়ীকে বস্তুজগতের প্রবল চাঞ্চল্য ও প্রাণাবেগের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। তাই অমিত তাকে ধরে রাখতে পারল না। আবার লাবণ্যের দিক থেকেও দেখা যায়—অমিতের স্বপ্নরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের কলগুঞ্জন আছে, কিন্তু তাকে স্থায়িত্ব দেয়া যায় না, বর্ষার নিবিড়-নীল মেঘ একদিন অপসারিত হয়ে যায়, সেদিন ধরণীর আমন্ত্রণকে—স্থিতি ও ধৃতিকে মেনে নিতে হয়—তাই লাবণ্য শোভনলালের নীরব করুণ প্রেমের অলক্ষ্য বন্ধনকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছে। তারপরে 'তব অন্তর্ধান-পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন'। এর মূলে আছে এই তত্ত্ব—

'আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন,
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।'

অমিতের প্রেমারতি—

'পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,

মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজ,
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।'

এর উত্তরে লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বলেছে—'যতই আমার আলো থাক, আর ধ্বনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।'

লাবণ্যের এই প্রত্যাখ্যান স্পষ্টতর হয়েছে যোগমায়ার কাছে লাবণ্যের উক্তিতে—'বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে।' অমিতের কাছে সে ক্ষণকালের মায়া-রূপেই থাকতে চায়।

এই প্রত্যাখ্যানের অন্তরালে যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নারীমন ক্রিয়াশীল তাকে রবীন্দ্রনাথ অশেষ যত্নে গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকামাত্রেই ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্টা, লাবণ্য তার ব্যতিক্রম নয়।

শেষ তিনটি উপন্যাস—দুই বোন, মালঞ্চ আর চার অধ্যায়-এ যেসব নারীচরিত্র দেখা দিয়েছে তাহা পুরোপুরি একাকিনী। তবে শর্মিলা ও উর্মিলা [দুই বোন] চরিত্রে যতটা সারল্যের অঙ্গীকার আছে, নীরজা ও সরলা [মালঞ্চ] এবং এলা [চার অধ্যায়] চরিত্রে তা নেই, আছে চিন্তার জটিলতা, অনুভবের নিবিড়তা ও প্রেম-প্রকাশের সাংকেতিকতা। বস্তুত ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র-চিত্রণে শেষকীর্তি রূপে উপস্থিত নীরজা, সরলা আর এলা।

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য একই—প্রেমের মার্জনা। প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা বা মার্জনা করে দুঃখের মধ্যেও সুখী থাকার সাধনা—প্রেমের সাধনা। এ দুটি উপন্যাসে এই সত্যেরই শিল্পরূপ। তবে প্রথমটিতে তা সরল, দ্বিতীয়টিতে জটিল। [এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন" গ্রন্থের আলোচনা পড়ে।]

শর্মিলা ও উর্মিলা দুই বোন। কাহিনীর প্রয়োজনে, সমাজবুদ্ধির তুষ্টিসাধনে, ঔপন্যাসিক উর্মিকে শর্মিলার সহোদরারূপে চিত্রিত করেছেন। তার ফলে পরিবেশ-রচনা সহজসাধ্য হয়েছে। শর্মিলাকে লেখক বলেছেন মায়ের জাতের প্রতিনিধি—অসাধারণ চরিত্র। এরই স্নেহচ্ছায়ায় শশাঙ্কর জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত। কাহিনীতে সংকট এলো যখন শ্যালিকা উর্মিলাকে নিয়ে শশাঙ্ক মত্ত হয়ে উঠেছে।

এর ফলে শর্মিলা-চরিত্রে ঈর্ষা জাগবার কথা। কিন্তু ঈর্ষা জাগে নি, জেগেছে বেদনা ও অস্বস্তি, তা দমনের শক্তি আছে শর্মিলা-চরিত্রে। শর্মিলা উর্মিকে ঈর্ষা করে নি, শশাঙ্ককে সন্দেহ করে নি। এখানে শর্মিলার প্রেমের মার্জনার রূপটি ফুটে উঠেছে। তার ফলে শশাঙ্ক মনে মনে শর্মিলার ব্যক্তিত্বের কাছে নত হয়েছে, বাইরে তার প্রকাশ ঘটেছে শর্মিলার ফটো-পূজোয়। শর্মিলার ঈর্ষার ইন্ধনে শশাঙ্কর উত্তেজনা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠতে পারত। শর্মিলার অসীম ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও মার্জনা লঙ্কাকাণ্ড ঘটায় নি। পরন্তু সে শশাঙ্কর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, লজ্জিত ও পরাস্ত হয়েছে শশাঙ্কর উত্তেজনা, আর উর্মিলাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে—কারণ শর্মিলার সংসারে তারই প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে বাস করবার শক্তি নেই উর্মিলার। প্রেমের এই মার্জনা 'দুইবোনে' প্রাধান্য পেয়েছে।

যেখানে এই মার্জনা নেই, আছে ঈর্ষা ও সন্দেহ, সেখানে কী ঘটতে পারে, তা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন মালঞ্চ-এ। রবীন্দ্রনাথের এই উনশেষ উপন্যাসের জটিল রূপ আধুনিক উপন্যাসের সর্বাধিক লক্ষণকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আধুনিক জটিল নারীচরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসামর্থ্যের পরিচায়ক নীরজা-চরিত্র।

আধুনিক মানুষের অহং-এর যাবতীয় বিকার (ঈর্ষা, সন্দেহ, সংশয়) যখন জীবনকে ছেয়ে ফেলে, তখন জীবনে থাকে না সুখ, থাকে না আনন্দ। যখনি বিশেষ কোনো একটা সংকীর্ণ হৃদয়াবেগ বা অনুভূতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে দেখতে থাকে, তখনি চলে যায় জীবনের সুখ আর আনন্দ ; যার জন্য ব্যাকুলতা, তাকেও দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। মালঞ্চ উপন্যাসে এই তত্ত্বেরই শিল্পরূপ।

নীরজা যতদিন সহজ বিশ্বাসে স্বামীর প্রেমকে গ্রহণ করেছে, স্বামী আদিত্যও ততদিন তাকে নিয়ে রচনা করেছে আনন্দের জগৎ। দুজনের মিলিত প্রেমসাধনা রূপ পেয়েছে তাদের উদ্যান-চর্চায়। দুজনের মাঝে ছিল সরলা। আদিত্যের মনে সরলা সম্বন্ধে গোড়ায় ছিল না কোনো জটিলতা। নীরজা যখন শয্যাবন্দী হল তখন তার মনও হল রুগ্‌ণ, অসুস্থ, সন্দেহপরায়ণ। আদিত্য আর সরলার সম্পর্ক নীরজা পূর্বের মতো আর সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। সংসারে এলো বিপর্যয়, ঈর্ষা এলো অবারিত প্রাবল্যে। স্বামি-সোহাগিনী নীরজার সুখ গেল, স্বস্তি গেল। নীরজার ঈর্ষার খোঁচায় নষ্ট হল আদিত্যের সহজ ভাব, তার অতল মনের অবচেতনায় দেখা দিলো সরলার প্রতি আসক্তির পুনরুন্মেষ। নীরজার মনে হল, সরলাকে না তাড়ালে শান্তি নেই। আদিত্যের মনে হল, সরলাকে না পেলে শান্তি নেই।

আর সরলা? সে তার মনের মধ্যে বহুদিনের আদিত্য-প্রেমকে চেপে রেখে আদিত্যর সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক বজায় রেখে আসছিল। নীরজার ঈর্ষার খোঁচায় সব বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এতদিনে আদিত্য অনুধাবন করল সরলার অতল মর্মবেদনা, বুঝতে পারল এতদিনেও সরলা অন্য কাউকে বিবাহ করেনি কেন। আদিত্য যখন সরলাকে বলেছে—'অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ', তখন সরলা মর্মবেদনা চেপে রেখে বলেছে—'তোমরা পুরুষ মানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো। মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য—এছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।'

শয্যাবন্দী রোগগ্রস্তা নীরজা কখনই ক্ষমা করে নি সরলাকে, আদিত্যকে। তেইশ বছর ধরে সরলা যে মর্মবেদনা নিঃশব্দে সহ্য করেছে, আজো তা-ই করতে চেয়েছে। আদিত্যর কাছ থেকে সরে যেতে চেয়েছে। সরলাই অনুরোধ করেছে আদিত্যকে, নীরজাকে সেবা করো। নীরজার জীবনাবসানে আদিত্যর জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করে দেবে সরলা, এই অনুক্ত ভরসায় আদিত্য ফিরেছে নীরজার কাছে। তখন নীরজা আদিত্যর কাছে মাপ চেয়েছে, আর সরলাকে দিয়েছে নিজের একখানি মুক্তার মালা। কিন্তু সরলা তা গ্রহণ করে নি। সরলা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছে, আর স্বামীকে কাছে পেয়ে প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছে নীরজা। কিন্তু যখন শুনেছে, সরলা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে, তখনি নীরজার সব ঔদার্য আর সুখ তিরোহিত হয়েছে, ফিরে এসেছে আতঙ্ক আর ঈর্ষা— 'তাহলে তো আর দেরী নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।'—বলতে বলতে মূর্ছা গেল নীরজা। সংজ্ঞা লাভ করে মনকে দৃঢ় করেছে, নিজেকে বুঝিয়েছে মৃত্যুকালে মহত্ত্ব দেখিয়ে, ত্যাগ দেখিয়ে, ক্ষমা প্রকাশ করে সে চলে যাবে। তাই রমেনকে বলেছে—'ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।' কিন্তু সরলা যে-ই তার কাছে এলো, নীরজা নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি, অস্থির হয়ে বলে উঠল—'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না, জায়গা হবে না তোর রাক্ষুসী, জায়গা হবে না, আমি থাকব, থাকব, থাকব।'

অস্বাভাবিক উত্তেজনার শেষে, জীবনীশক্তির অবসানে পরমুহূর্তে নীরজার মৃত্যু ঘটেছে।

নীরজার ঈর্ষা, সন্দেহ, স্বার্থপরতা ডেকে এনেছে অশান্তি। জলে পুড়ে গেছে নীরজা-আদিত্যর প্রেম-মালঞ্চ। নীরজা জীবনে সহজকে বরণ করে নিতে পারে নি, তাই ক্ষোভ, সংশয়, অশান্তি, নৈরাশ্য। নীরজা তাদেরই শিকার। নীরজা তাদেরকে

উত্তীর্ণ হতে পারেনি, আসক্তির অন্ধতায় ও কৃপণতায় কেবলি হাতড়ে ফিরেছে, শেষ পর্যন্ত নিজেকে বিনষ্ট করেছে।

অপরদিকে সরলার প্রেম আসক্তিকে আঁকড়ে থাকে নি। তার প্রেম যথার্থ প্রেম, কারণ তা দুঃখ সইতে পারে, অপ্রাপ্তির বেদনাকে বহন করতে পারে, ঈর্ষা বা সংশয়কে বর্জন করতে পারে, জীবনের আনন্দকে পেতে পারে। তার আছে সহজের প্রতি প্রেম।

অনেক দুঃখ সহেও জীবনের আনন্দের প্রতি আকর্ষণ ছিল সরলার স্বভাবে। তা না ছিল নীরজার, না ছিল আদিত্যর। নীরজার প্রেম কৃপণ, সংশয়ী, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্ষমা করতে সে শেখে নি। আদিত্যর নীরজাপ্রেম প্রেম-ই নয়, সুখাশ্রয়ী মোহবিলাস, তার সরলাপ্রেম আত্মপ্রতারণা। আসলে আদিত্যর প্রেম আত্মপ্রেম, আত্মসুখাশ্রয়, মোহতৃপ্তির স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস। 'থাকব থাকব থাকব' বলে পরাভূত নীরজার আর্ত ক্রন্দন প্রকাশ করেছে তার অসহায়তাকে, পরাজয়কে, অনুদার প্রেমিক-স্বভাবকে।)

'চার অধ্যায়ে'র এলা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছিল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। এর জন্য তার না ছিল উপযুক্ত পটভূমি, না ছিল মানসিক প্রস্তুতি। তবু এই গোপন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ঘটনাচক্রে দেখা পেয়েছিল অতীনের। অতীনকে তার চাই, একারণে এলা অতীনকে টেনেছিল বৈপ্লবিক সংগঠনে। পরে এলা বুঝেছিল, তার বড় ভুল হয়েছে। অতীনকে নিয়ে এলা তখন সংগঠন থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সে পথ বন্ধ। অতীন দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারণ তা সে পারে না, তার ব্যক্তিমর্যাদা তাকে বাধা দেয়। অতএব বৈপ্লবিক সংগঠন তাদের দুজনের স্বভাবের পক্ষেই প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যেই তাদের যৌবন ও প্রেমের শোচনীয় অপচয়।

ঔপন্যাসিক আসন্ন বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর কালো পটভূমিতে এই তরুণ প্রণয়িযুগলের প্রবল ভালবাসার ছবি এঁকেছেন। তারা জানে যে এ জীবন ও যৌবন তারা ভোগ করতে পারবে না, যে কোনো মুহূর্তে দলপতি ইন্দ্রনাথের হুকুম অথবা ইংরেজের গুপ্তচর তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সেই বিচ্ছেদের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এলা আর অতীন তাদের স্বল্পকালস্থায়ী প্রেমজীবনের প্রথম অধ্যায়ের কথা বারবার স্মরণ করেছে। এই পূর্ব-সুখস্মৃতি পর্যালোচনায় তারা সুখ পেয়েছে। এরই মধ্যে একটা ভাগ্যের পরিহাস রয়েছে। তরুণ প্রণয়িযুগল ভালবাসার স্বর্গখেলনা রচনা করতে পারবে না,—এই নিষ্ঠুর সত্য তাদের সংলাপে আভাসিত। তাই তাদের হাস্যের

আড়ালে ক্রন্দন প্রবাহিত। অনিবার্য বিচ্ছেদের পূর্ব-মুহূর্তে এলা চেয়েছে অতীনের বর্বর ভালবাসা। কিন্তু অতীনকে চলে যেতে হয়েছে প্রিয়তমার নগ্ন বক্ষকে উপেক্ষা করে।

এলার বর্বর ভালবাসার এই বিচ্ছেদ-শাসিত গভীর ব্যাকুলতার ছবিটি ঔপন্যাসিকের করুণ-নিপুণ লেখনী-মুখে ফুটে উঠেছে।—"অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।···আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও।···ভীরু নই আমি, জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্তু। অন্তু।"

এলার ভালোবাসায় এই তীব্র প্রকাশের পিছু পিছু এসেছে অতীনের প্রতি দলপতির অমোঘ আদেশ—এলাকে ছেড়ে চলে যাও—"দূরের থেকে হুইস্‌লের শব্দ এল।"

ভালোবাসার এই সুতীব্র প্রকাশের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-উপন্যাসের শেষ নায়িকা অমর হয়ে রইল।

চার / রবীন্দ্র-পত্র ও স্মৃতিকথা

৮

অ্যামিয়েলের জর্নাল ও ছিন্নপত্র

এক

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে জয়যাত্রার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে স্বাক্ষর কেবল সচেতন সাহিত্যকর্মে নয়, অর্ধমনস্ক বা অন্যমনস্ক সৃষ্টিতেও রয়েছে। পত্ররচনায় কবি যে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন,* তা-ই যথেষ্ট নয়, এর মধ্যে একটি অসাধারণ মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র-পত্রসাহিত্য নিতান্ত কম নয়। তার মধ্যে যথার্থ পত্র-সাহিত্যের গৌরব দাবী করতে পারে: 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'চিঠিপত্র'। 'পত্রধারা'—উপদেশাবলীর সংকলন মাত্র। আর 'য়ুরোপের চিঠি', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি,' 'পথে ও পথের প্রান্তে'—পত্রাকারে ভ্রমণ-সাহিত্য এবং চিন্তাপ্রধান রচনা-সংগ্রহ মাত্র; এগুলিতে সচেতন সজাগ দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ সৃষ্টিচেতনা, সতর্ক পোশাকিয়ানা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বর্তমান। তাই শেষোক্ত গ্রন্থনিচয় পত্রসাহিত্যের মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত।

'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'চিঠিপত্র' [নয় খণ্ড] যথার্থ পত্রসাহিত্য। খাঁটি পত্রে অন্তরঙ্গতা ও নিভৃতি, ঘরোয়া পরিবেশ ও সহজ সুর থাকা একান্তই প্রয়োজন। তা এই তিনটি সংকলনে আছে, বাকিগুলিতে নেই। আর এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ছিন্নপত্র'। 'চিঠিপত্রে' পারিবারিক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আত্মীয়বন্ধুস্বজনের মধ্যে আমরা চিনে নিতে পারি। কৌতুকে, হাস্যপরিহাসে, সাংসারিক আসক্তি ও দুর্বলতার প্রকাশে, সাহিত্য-চিন্তা ও চর্চায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে ও স্নেহের জ্যোতিতে এই সঙ্কলনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'ছিন্নপত্র' পারিবারিক হয়েও তার বাইরে চলে গেছে, ঘরোয়া হয়েও তা নির্বিশেষ, ব্যক্তিগত হয়েও তা বিশ্বগত। 'ছিন্নপত্রে' প্রবন্ধোচিত গাম্ভীর্য ও সতর্কসচেতনতা নেই—অনায়াস লঘুতা আছে, ব্যক্তিমানুষের পরিচয় আছে, পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে একটি সংযোগ ও উত্তাপের স্বাক্ষর আছে। কিন্তু এই-ই সব নয়। এ ছাড়াও কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গূঢ় সাহিত্য-জীবনের মহত্তর পরিচয় 'ছিন্নপত্রে'

বিধৃত হয়েছে; এখানেই তার গৌরব। এই পত্রগুচ্ছ গদ্যসৌন্দর্যে স্বাদ-বৈচিত্র্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয়-প্রকাশে মূল্যবান। 'ছিন্নপত্রে'র কালপরিধি দশ বৎসর বিস্তৃত—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই দশ বৎসরে তরুণ যৌবনের বাউল কবির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যফল অমরতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। এই পর্বে 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', চিত্রাঙ্গদা', 'মায়ার খেলা', 'গোড়ায় গলদ', 'রাজা ও রাণী,' 'মন্ত্রীঅভিষেক', 'গল্পগুচ্ছ,' এবং অজস্র প্রবন্ধ ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' রচিত হয়েছে। এ সময়ে কবি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

'ছিন্নপত্রে' মোট ১৫২টি পত্র আছে। তার মধ্যে প্রথম তেরটি পাঁচ বৎসরের মধ্যে রচিত, বাকিগুলি চার বৎসরে লিখিত। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা ও বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পত্রপ্রাপক। উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে 'ছিন্নপত্রে'র সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'গল্পগুচ্ছ' ও 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-চৈতালী'র বহু কবিতা-গল্পের উৎস, উপাদান ও পটভূমি 'ছিন্নপত্র'। 'ছিন্নপত্রে' সংসার-অভিজ্ঞ বিষয়ী হাস্যরসিক ঘরোয়া পরিবার-কেন্দ্রিক স্নেহাসক্ত বন্ধুবৎসল রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আছে। এহ বাহ্য। 'ছিন্নপত্রে'র এই বহিরঙ্গ বিবরণে তার মূল্য নির্ভর করে না, কবিমানসের অন্তরঙ্গ প্রকাশেই এর মূল্য।

দুই

ছিন্নপত্রের প্রধান মূল্য এইখানে যে, তা রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারে সহজে কিছু বলতে চাইতেন না, এ কথা বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিল্পসৃষ্টির রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে যে সাজঘর আছে, তার পট সরিয়ে ফেলে মূল উৎস বা উপাদানের পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথের ছিল একান্ত অনীহা। কাব্যের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়; জীবনচরিতে, বাইরের ঘটনায় কবিপরিচয়সন্ধান মূঢ়তা—এই ছিল তাঁর অভিমত। কবিজীবনের যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—তরুণ যৌবনের কবির জীবনের পঁচিশ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর্ব—সেটির কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চান নি। 'জীবনস্মৃতি' কবি রচনা করেছেন পঞ্চাশে উপনীত হয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কথা বলেই তিনি লেখনীর মুখ চেপে ধরেছেন, যৌবনের সিংহদ্বারে পাঠককে পৌছে দিয়ে সরে গেছেন। কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঠক যত বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় তাদের আপসোস। 'কড়ি ও কোমল'-এর রচয়িতা যে তরুণ যুবক কবি, তাঁর ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনের কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথ

কবুল করেন নি। বায়রন বা গোটের পত্রাবলী ও আত্মজীবনীতে যে অন্তরঙ্গ গোপন কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা কিছুই বলেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে যা অনুদ্‌ঘাটিত, তা 'ছিন্নপত্রে' উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র একটি অনন্ত-সাধারণ গুরুত্ব আছে। কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা এখানে সম্পূর্ণ-রূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে মধ্যযৌবনে উপনীত রবীন্দ্রনাথের মুখে অনেক কনফেশ্যন শোনা যায়—যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে অনেক ছাঁটকাট করেছেন।

'ছিন্নপত্রে' যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি সর্বদা সামাজিকতা রক্ষা করে চলেন নি। সভ্যতা, শিষ্টতা, সমাজ-সংস্কার, তত্ত্ব-প্রচার, ধর্ম-ব্যাখ্যান—এ সবই বাইরের, কবির আন্তরতৃপ্তি এসবের দ্বারা ঘটে না। 'হিতবাদী' ও 'সাধনার' সম্পাদকতা বা মাসের পর মাস লেখা যুগিয়ে যাওয়া—কিছুই না, ব্যর্থ পরিশ্রম, অথবা বিষয়-কর্ম—নিতান্ত অসারকর্ম। এই ধরনের চিন্তা 'ছিন্নপত্রে' মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ৮, ১৩, ১৫, ২২, ৫১, ৫২, ৬৯, ৮৪, ৮৫, ৯২, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১৩৫, ১৩৬, ১৫০-সংখ্যক পত্র তার পরিচয়স্থল।

কয়েকটি যদৃচ্ছা-উদ্ধৃত মন্তব্য এর পোষকতা করবে :

(ক) ইচ্ছা করছে, শীতটা ঘুচে গিয়ে প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়—আচকানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জালিবোটের উপর পা ছড়িয়ে দিই এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিনকতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সম্বৎসর খেপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের দুঃসাধ্য। (১৩৫-সং পত্র)

(খ) আমার দিনগুলিকে রথীর কাগজের নৌকার মতো একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি-আধটি গান তৈরি করছি এবং শরৎকালের প্রহরগুলির মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে অবনত হয়ে পড়েছে, আলোক রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্বব্যাপী স্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ শান্তি আমার ললাটের উপর চুম্বন করেছে। এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুটি চেপে ধরবেন ; তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী কোথায় থাকবেন তাঁর আর উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। প্রায় মাঝে মাঝে

মনে করি সাধনার লেখার ঝুড়ি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেব ; কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও সে আমাকে তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলবে। (১৫০-সং পত্র)।

(গ) কলকাতাটা বড় ভদ্র এবং বড় ভারী, গবর্মেণ্টের আপিসের মত। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তকৃতকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে—নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে [পতিসর] প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন - নিত্যনিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই—সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধ্যেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে—আমি মাথাটি নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি। (৯৮-সং পত্র)

এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই বন্ধন-অসহিষ্ণু প্রকৃতিপ্রেমী সামাজিকতা-বিরোধী কবিকে চিনে নিতে পারি। এই ধরনের স্বীকৃতি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল এখানে বিরল মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা আত্মসন্ধানী প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। কবির আত্ম-জিজ্ঞাসা ও নিসর্গ-জিজ্ঞাসা—'ছিন্নপত্রে'র দুটি মূল স্বর। সাহিত্যজীবনে কবি যে নোতুন জগতে প্রবেশ করেছেন, যেখানে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-'চৈতালী'-'গল্পগুচ্ছে'র নির্বিশেষ সৌন্দর্য-সন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা অপূর্ব রূপলাবণ্যে আবিষ্কারের আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ নবতর সৌন্দর্যলোক রচনা করেছে, 'ছিন্নপত্রে' তারই স্পষ্ট স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে।

কবির আত্মপরিচয় এখানে প্রকট। তিনি বলেছেন, "সাধনাই লিখি আর জমিদারি দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

(৮০-সং পত্র)

'ছিন্নপত্র' এই আত্মস্বীকৃতির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে, রবীন্দ্র-মানসের মর্মকোষের পরিচয় এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

তিন

'ছিন্নপত্রে'র শতকরা আশিটি পত্রের রচনাস্থল পদ্মাবক্ষ। কবি তখন জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে মধ্যবঙ্গের হৃদয়দেশে পদ্মা ও তার শাখানদীগুলিতে ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন। গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপ্রকৃতি থেকেই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য ও মানবিক সত্যের প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। পদ্মা, যমুনা, আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই ও ইছামতী নদীর কলধ্বনি সেদিনের গল্পে-কবিতায়-গানে শোনা যায়। পদ্মার জন্য কেবল ব্যাকুলতা নয়, তীব্র ভালবাসা ও সেই সঙ্গে আশঙ্কামিশ্রিত আকর্ষণও কবি অনুভব করেছেন। তা 'ছিন্নপত্র'পাঠে অনুভব করা যায়। আর এর মধ্যেই তিনি কাব্যজীবনের নবতর অভিজ্ঞতালোকে পদার্পণ করেছেন। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যে প্রকৃতিপ্রেম, তা বাংলা কাব্যে ও রবীন্দ্রকাব্যে অনাস্বাদিত প্রেম। এই প্রেমে বাংলা কাব্যের নবজন্ম হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' এই প্রেমের প্রাথমিক খসড়া।

নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে সেদিন সঙ্গ দিয়েছে চঞ্চলা পদ্মা—সুখদুঃখভরা গ্রামগুলি, নির্জন বালুচর, সুনীল আকাশ, রহস্যময় মধ্যাহ্ন ও মোহিনী সন্ধ্যা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যটি অনিবার্যরূপে মনে পড়ে, সেটি উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য। "আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে! পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে।" (রচনাবলী সংস্করণ, 'সোনার তরী'র ভূমিকা)।

পদ্মাপ্রকৃতিই এ সময়ে কবির নিত্যসঙ্গী, প্রেরণাদায়িনী, মানসী। সেই সঙ্গে যে-ক'টি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল, তার মধ্যে প্রধান হল 'অ্যামিয়েলের জর্নাল'। 'ছিন্নপত্রে' কবি স্বীকার করেছেন, "আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে পাল্টে দেখি, ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি, এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বইয়ে এর চেয়ে ভাল লেখা আছে এবং এই বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে। কিন্তু এই বইটি আমার মনের মত। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে; কখনও বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনও বালিশ ফেলে দিই—সেই মানসিক অবস্থায় অ্যামিয়েলের যেখানেই খুশি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।"

(১০১-সং পত্র)

অ্যামিয়েলকে কবি বলেছেন 'নির্জনের প্রিয় বন্ধু', 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, "এই গ্রন্থখানি কবির খুব ভাল লাগে, বহুবার ইহার কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।" ('রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৩০০)। জেনিভাবাসী কবি-দার্শনিক-অধ্যাপক আঁরি ফ্রেডরিক অ্যামিয়েল (১৮২১-১৮৮১) তাঁর 'জর্নাল ইন্‌টাইম্‌' গ্রন্থের দ্বারা পদ্মাবিহারী রবীন্দ্রনাথের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা আলোচনার যোগ্য। এই জর্নালের আলোকে 'ছিন্নপত্র' পাঠ করলে আমরা নোতুন করে 'ছিন্নপত্র' ও পত্ররচয়িতা—উভয়কেই চিনে নিতে পারি।

অ্যামিয়েল ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যজীবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। জেনিভার এই বিদগ্ধ অধ্যাপক সৌন্দর্য-দর্শন সম্পর্কে ভাষণমালা ও কিছু কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তা থেকে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু মঁসিঅ শেরার তাঁর ডায়েরি সম্পাদনা করে Journal Intime ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভাতে প্রকাশ করেন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৮১—এই চৌত্রিশ বৎসরের দিনলিপি থেকে নির্বাচিত সংকলন এই গ্রন্থ। সুইজারল্যাণ্ড ও জর্মানি—এই দুই দেশে রচিত দিনলিপিতে একটি বিদগ্ধ প্রকৃতিপ্রেমী সংস্কৃতিবান মনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, অনুবাদিকা মিসেস হামফ্রিওঅর্ড। দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। লোকেন্দ্রনাথ পালিত এই সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথকে দেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পর্কে উপরোক্ত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০০—এই দশ বৎসর কবি মধ্যবঙ্গে বাস করেন, তারপর পত্নীর আপত্তিতে শিলাইদহের বাস উঠিয়ে বোলপুরে চলে যান। এই পর্বে 'অ্যামিয়েলের জর্নাল' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিল। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত) 'অ্যামিয়েলের জর্নালে'র দুবার উল্লেখ আছে; নিখিলেশ বইটির ভক্ত ছিলেন।

অ্যামিয়েলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যকর্মে অনেক মিল আছে, বহুতর অমিলও আছে। উভয়েই কবি-দার্শনিক, উভয়েই অন্তর্মুখী, উভয়েই প্রকৃতিপ্রেমী। সমাজ ও দেশের আহ্বানে, রাজনীতিতে ও দর্শনালোচনায় উভয়েই সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু তার থেকে সরে গিয়ে উভয়েই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। বাল্যকালে উভয়েই নির্জনতাপ্রিয় রোমাণ্টিক কিশোর ছিলেন। যৌবনে উভয়েই বিষাদ ও বৈরাগ্য, ঔদাস্য ও রোমাণ্টিক ব্যাকুলতার কবলে পড়েছেন ও তার থেকেই তাঁদের মহৎ সাহিত্য-কর্মের জন্ম হয়েছে। উভয়েই পত্ররচনায় নিপুণ ছিলেন; ভ্রমণে ও প্রকৃতি-সঙ্গে উভয়েরই প্রবল আসক্তি ছিল। উভয়েই বারবার হতাশা ও নিষ্ফলতার দ্বারা পিষ্ট হয়েছেন এবং প্রকৃতি-সঙ্গে নবজীবন ও নবীন আশায় উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ

করেছেন। উভয়েরই কবিতা ও দিনলিপি-পত্রে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। জ্ঞানের নানাক্ষেত্রে উভয়েরই স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল।

অমিল এইখানে যে, অ্যামিয়েল ষাট বৎসরের জীবনে বিশেষ কিছুই লিখতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ আশি বৎসরের জীবনে অজস্র সহস্রবিধ রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। অ্যামিয়েল নিষ্ফলতা ও আলস্যের সহস্র সঞ্চয় নিয়ে গত হয়েছেন, সাহিত্যিক বন্ধ্যাদশায় রাহুগ্রস্ত হয়েছেন, নিঃসঙ্গ কৌমার্যের দুঃসহ ভার ও বেদনা বহন করেছেন, মঁসিঅ শেরারের কথায়—"আমরা ঠিক বুঝতে পারি না এত শক্তিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে তুচ্ছ অথবা কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব হল না কেন?" অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সংসারে ও সমাজে কর্মীরূপে দেখা দিয়েছেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহস্র কর্মের বন্ধনে ধরা দিয়েছেন, আবার এই বন্ধনকে মুহূর্তেই অস্বীকার করে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রসবী লেখনী নিরন্তর চালনা করেছেন, সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সকল দুঃখ হতাশা ও ঔদাস্যের উপরে তাঁর মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম জয়লাভ করেছে। 'অ্যামিয়েলের জর্নাল' তাঁর সাতাশ বৎসর থেকে ষাট বৎসর বয়স (মৃত্যুকাল) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত গোপন দিনলিপির নির্বাচিত সংকলন এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত; জীবদ্দশায় এগুলির প্রকাশ আমিয়েলের অভিপ্রেত ছিল না। অপরপক্ষে 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দশ বৎসরের কাল-পরিধির মধ্যে লিখিত, আত্মীয় ও বন্ধুদের উদ্দেশে প্রেরিত, সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশের প্রতি সচেতন থেকে রচিত এবং লেখকের জীবদ্দশায় লেখক-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 'জর্নাল ইন্‌টাইম'-এ একটি অনুভূতিপ্রবণ অতিসচেতন বিদগ্ধ মানসের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দর্শনজিজ্ঞাসার পরিচয়ই প্রধান; 'ছিন্নপত্রে' একটি তরুণ কবিমানসের আত্মজিজ্ঞাসা ও নিসর্গজিজ্ঞাসা রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতিপ্রেমী মনের নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা।

চার

'ছিন্নপত্রে' দেখি নির্জনসজনের নিত্যসংগমে জাত প্রকৃতিপ্রেম—তার একদিকে পদ্মা, অপরদিকে পদ্মাতীরের জনপদ; একদিকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান—'সোনার তরী' 'চিত্রা', অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা—'গল্পগুচ্ছ'। 'জর্নাল ইনটাইম'-এ একটি মহৎ প্রতিশ্রুতিসমৃদ্ধ কবিমানসের অপমৃত্যু; অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় পীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদ। এখানেই 'ছিন্নপত্র' 'অ্যামিয়েলের জর্নাল' থেকে ভিন্নতর। জর্নালে অ্যামিয়েলের খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধ অতি প্রবল, 'ছিন্নপত্রে' ধর্মবোধ কখনই প্রকট নয়।

জর্নাল পড়লে মনে হয় একজন স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমারের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি; "যে মুহূর্তে একটি বস্তু আমাকে আকর্ষণ করে, আমি সে মুহূর্তে তা থেকে সরে যাই, কেননা অপেক্ষাকৃত-ভাল দ্বিতীয়ে আমার মন ওঠে না; আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিদায়ক কিছু আমি আবিষ্কার করতে পারি না। বাস্তব আমাকে হতাশ করে, আর আদর্শকে খুঁজে পাই না।" আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধানে এই বেদনা ও বাস্তবের কঠিন আঘাতে মোহভঙ্গ প্রত্যেক মহৎ শিল্পীরই কথা। সংসার, প্রেম, বিবাহ, জীবনসঙ্গিনী—এ সবই অ্যামিয়েলকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু হায়, সে সাধ কখনও পূরণ হয় নি, তাই জর্নালে ধ্বনিত হয়েছে এই ক্রন্দন: "বাস্তব, বর্তমান, অপ্রতিকার্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত এমন কি ভীত করে তোলে। কল্পনা, বিবেকবুদ্ধি ও সূক্ষ্মবুদ্ধি আমার প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ চরিত্রবলের অভাব আছে। কেবল চিন্তাসমৃদ্ধ জীবনই আমার কাছে স্থিতিস্থাপকতা ও অসীমতায় পূর্ণ বলে মনে হয়—এর দ্বারা আমি অপ্রতিকার্য অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করি। বাস্তব জীবন আমাকে ভীত করে তোলে। অহং জীবন ও সুখকে আমি আমারই কারণে বিশ্বাস করি না। আদর্শ আমার সকল অসম্পূর্ণ অধিকারকে বিনষ্ট করে এবং আমি সকল মূল্যহীন দুঃখ ও অনুতাপকে ঘৃণা করি।" (৬ এপ্রিল, ১৮৫১ সনের দিনলিপি, জেনিভা)। এইখানেই অ্যামিয়েলের ট্রাজেডি। এই অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা, বিশ্বাসের শোচনীয় অভাব ও বাস্তবের অপূর্ণতার গভীর বেদনা অ্যামিয়েলের সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে বিনষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই তিনি সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি। 'অ্যামিয়েলের জর্নালে' খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ, মায়া, ব্রহ্ম, কর্ম, পাপ, পুণ্য সম্পর্কে গুরু আলোচনা মনের ওপর দুঃসহ ভারের মত চেপে বসে।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুঃখকর ট্রাজেডি ঘটে নি। বাস্তবের অপূর্ণতায় তিনিও বেদনা পেয়েছেন, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছেন, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যোগসাধনের ব্যর্থতায় পীড়িত হয়েছেন, কিন্তু সুগভীর মানবপ্রেম তাঁকে রক্ষা করেছে। ৮৪, ৮৮, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১৩৮-সংখ্যক পত্রে এই আশঙ্কা, ব্যর্থতা ও অশান্তির পরিচয় পাই। কিন্তু তা স্থায়ী হয়ে কবিমনে মুদ্রিত হয়ে যায় নি, তার প্রমাণ পাই ২৬, ৮৫, ১১২, ১১৬, ১২০, ১২২, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯-সংখ্যক পত্রে। শেষোক্ত পত্রগুলিতে আশ্বাস ও সান্ত্বনা পাই। অস্তিত্ব-সম্পর্কিত গুরু আলোচনা এখানে 'অ্যামিয়েলের জর্নালে'র মত সৌন্দর্য সম্ভোগের পথে বাধা উপস্থিত করে নি।

'ছিন্নপত্রে'র একদিকে হতাশা ও নিষ্ফলতার বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে, অপর দিকে সুগভীর ধরণীপ্রীতি ও মানবপ্রেম বড় হয়ে ওঠে।

কী আশ্চর্য আত্মস্বীকৃতি :

(ক) যখন মনে করি, জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী, তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে।... জীবনে একটা প্যারাডক্স প্রায়ই দেখা যায় যে, বড় দুঃখের চেয়ে ছোট দুঃখ যেন বেশী দুঃখকর। তার কারণ, বড় দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে; মনের সমস্ত দলবল, সমস্ত ধৈর্যবীর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে; তখন দুঃখের মাহাত্ম্য দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেড়ে যায়। ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে! [১০৩-সং পত্র]

(খ) আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনও অর্থই থাকে না। [১১৫-সং পত্র]

(গ) [বেদান্ত বলেন] সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে একথা স্থান দিতে পারে। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসঙ্গত আসলে তা নয়—বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক, জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম—সমস্তই ছায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে, এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি একথা কিছুতেই মনে হয় না। [১১৭ নং পত্র]

(ঘ) আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি, সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে।...আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখদুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখ-দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে।

[১২৩-সং পত্র]

(ঙ) নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে

পড়ছে—খুব বেশী দিনের কথা বলে তো মনে হচ্ছে না—অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি। কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোট, দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে।…আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুরবেলাকার মনের ভার এই একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে। [১৩৮-সং পত্র]

(চ) যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোন খুঁত থাকত না—কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন—কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেই জন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়, তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খ্রীষ্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্য দুঃখ বহন করেছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে, এই-যে আমি হয়েছি এবং আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড় তোফা হয়েছে—এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভাল। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভাল জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ স'ব—তা আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক; মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না। [৮৮-সং পত্র]

(ছ) যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে।…কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। অবসর নিয়েই বা ফল কি। কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখের পথে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে, তবে ভালই তো। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে

শোক করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোট বড় সব কাজই তাকিয়ে আছে। কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি, কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাষ করেছে, কেউ মজুরি করছে ; অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু, কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আবরু নষ্ট হতে পারছে না।—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তা হলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটে, আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজ বাঁধা, সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের বেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃশব্দে চলে যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা। [১৪৭-সং পত্র]

অ্যামিয়েল যেখানে বাস্তবের অপূর্ণতা ও দুঃখে বেদনার্ত হয়েছেন, বলেছেন, "বাস্তব, বর্তমান, অপ্রতিকার্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত এমন কি ভীত করে তোলে", সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ কঠোর পবিত্র সান্ত্বনা আমাদের আশ্বস্ত করে। 'অ্যামিয়েলের জর্নালে' এ ধরনের দিনলিপি পড়ে আমাদের মন ক্লিষ্ট হয়, 'ছিন্নপত্র' আমাদের সান্ত্বনা দেয়, সংসারের কঠিন কর্তব্যের মুখোমুখি হতে বল দান করে।

অ্যামিয়েলের জর্নাল তাঁর জীবনব্যাপী ব্যর্থতা দুর্বলতা পরাজয়ের ট্রাজিক ইতিহাস। 'ছিন্নপত্র' সেক্ষেত্রে মর্তমমতা ও জীবনপ্রীতির টেস্টামেণ্ট। অ্যামিয়েল পরিবেশের কাছে হার মেনেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার ওপর জয়লাভ করেছেন। অ্যামিয়েলের সকল ব্যর্থতা ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে যখন তিনি প্রকৃতিপ্রেমে উজ্জীবিত হয়েছেন। মধ্য য়োরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরস অ্যামিয়েল দু হাতে অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করেছেন, আর সেখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী। বোধকরি এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ অ্যামিয়েলকে তাঁর 'নিত্যসঙ্গী', 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন। উভয়েই প্রকৃতির প্রতি আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছেন এবং ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে তাকে বেঁধেছেন। প্রকৃতির মধ্যে একটি লাবণ্যময়ী দিব্যসত্তার উপস্থিতি উভয়েই অনুভব করেছেন। এখানে উভয়েই প্রকৃতির অন্তরসত্তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

সুইজারল্যাণ্ডের নীল আকাশ, আল্পস্ হিমাদ্রি এবং শান্ত 'লেক'সমূহ অ্যামিয়েলের মনোহরণ করেছে, তপ্তমধুর এপ্রিলের বাসন্তী দিনগুলি সুধায় ভরে তাঁর কাছে এসেছে, তিনি আকণ্ঠ সে সুধা পান করেছেন। কী গভীর আনন্দ সেই সব রঙিন দিনগুলি বহন করে এনেছে, তার পরিচয় জর্নালের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। জেনিভাতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিলের দিনলিপিতে অ্যামিয়েল লিখেছেন : "আমি আজ সকালে মনের

উপর আবহাওয়ার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছি। নিজেকে ইতালিয়ান বা স্পেনীয় বলে মনে হল। এই নীল স্বচ্ছ আকাশে দক্ষিণায়নের সূর্যালোকে প্রাচীরগুলি তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে বলে মনে হচ্ছে। চেস্টনাট গাছগুলি উৎসব-সাজে সেজেছে। তাদের শাখাপ্রান্তে দ্যুতিমান কুঁড়িগুলি ছোটছোট আলোকশিখার মত দীপ্তি বিকিরণ করছে, মনে হয় তারা যেন অনন্ত প্রকৃতির বসন্ত-উৎসবের উজ্জ্বল দীপাবলী। সব কিছুই কত নবীন, কত কোমল, কত করুণাময়!—ঘাসের শিশিরস্নাত সতেজভাব, আঙিনার স্বচ্ছ ছায়া, পুরনো গীর্জা-চূড়াগুলির মহান শক্তি, পথের সাদা প্রান্ত—সবই সুন্দর! নিজেকে শিশুর মত প্রাণোচ্ছল মনে হয়; আমার ধমনীতে জীবনীরস পুনঃপ্রবাহিত হয়। বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগের ক্রিয়াটি কত মধুর!"

অপরদিকে পদ্মানদী, বালুচর, ধূসর তীররেখা, সুনীল আকাশ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে তার পরিচয় 'ছিন্নপত্রে' বিকীর্ণ হয়ে আছে। আলোয় আকাশভরা বাংলার শরৎ-প্রকৃতির সকল রূপ কবি-দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র ১৪৫-সং পত্রটির সঙ্গে সদ্যোধৃত দিনলিপির সাদৃশ্য কত গভীর, তা সহজেই অনুভববেদ্য। আলো আর আকাশের উদার আমন্ত্রণে অ্যামিয়েলের মত রবীন্দ্রনাথও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সাড়া দিয়েছেন: "কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই, নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির—যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত আমার জানালা-দরজার কাছে উঁকি মারছে; আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিকে নবীন ও সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় অ্যাপোলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি! আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে—সোনার আলো মদের মত আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকির মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা; সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ওই সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।"

[সাজাদপুর, ২ জুলাই, ১৮৯৫]

জেনেভা ও সাজাদপুরে দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান, সময়ের ব্যবধানও আছে—১৮৫৫ ও ১৮৯৫, কিন্তু প্রকৃতি-সৌন্দর্য-উপভোগের অসহ্য উল্লাস একই। এই তীব্র উল্লাসে রবীন্দ্রনাথ ও অ্যামিয়েল একই সৌন্দর্যলোকের দুই দেবকুমার!

অ্যামিয়েল যেখানে বলছেন: "আবহাওয়া আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল, উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দিন পাখীর গানে মুখরিত, শর্বরী তারাশোভিত,—প্রকৃতি যেন করুণার প্রতিমা—করুণা ও দ্যুতিতে মিশে তা উজ্জ্বল হয়েছে। এই ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ দৃশ্যের ভাবনায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।" (জেনিভা, ১৭ এপ্রিল, ১৮৫৫), সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "অনেককাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভাল লাগে। বড় বড় জানালা দরজা, চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে, যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই, দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেটভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল।······এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখীদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবশুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়। কেন জানি নে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।"

[সাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪/১১৯-সং পত্র]

জেনিভার উষ্ণমধুর প্রসন্ন মধ্যাহ্ন আর পদ্মাতীরের সাজাদপুরের নির্জন সুন্দর সুদীর্ঘ অবসরস্নিগ্ধ মধ্যাহ্ন—দুজনকে একই সৌন্দর্যের জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৃহৎ আকাশের ক্ষুধা'র সঙ্গে উক্ত পত্রে অ্যামিয়েলের অনুভূতির কী আশ্চর্য মিল, "এই সুনীল (আকাশ) সাগরে পৃথিবী ভাসছে বলে আমার মনে হল। এই গভীর শান্ত আনন্দানুভূতি একটি সম্পূর্ণ মানুষকে অভিষিক্ত করে, তাকে শুদ্ধ ও মহৎ করে তোলে। আমি নিজেকে এর হাতে সঁপে দিলাম, কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতায় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।"

বাংলাদেশের শরৎ-প্রসন্ন প্রভাতের সঙ্গে সুইজারলাণ্ডের হেমন্তের হেমকান্ত নীলিম আকাশতলের প্রভাতের একটি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। ভাদ্র-আশ্বিনের সকাল পূর্ববাংলায় পদ্মাবক্ষে যে মোহ বিস্তার করে, অক্টোবরের সকাল আল্পস্-আশ্রিত সুইস 'লেক'-অঞ্চলে হয়তো সেরূপ মোহ বিস্তার করে। 'অ্যামিয়েলের জর্নালে' এরূপ একটি সকালের উল্লেখ আছে। দিনলিপির তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৮৬৪, রঙ্গভূমি—Promenade de la Treille। অ্যামিয়েল মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন—"এই প্রভাতে বাতাস এত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে ভোয়াশ নদীতে মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের প্রসন্ন উজ্জ্বল কিরণধারা শরতের সকল রঙের আগুন জ্বালিয়েছে—সেখানে স্ফটিক-হলুদ, জাফরান, সোনালি, গন্ধক-হলুদ, গিরিমাটি-হলুদ, কমলা, লাল, তামা,

সাগর-নীল, পারিজাত-নীল রঙ কুঞ্জের ঝরানো ও ঝরে-যাওয়া পাতায় পাতায় উজ্জ্বল রঙের উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে। এ অতি তৃপ্তিকর দৃশ্য। আমাদের দুই সামরিক দলের পদধ্বনি, বন্দুকের শিস, শিঙ্গাধ্বনি, ঘরবাড়ীর তীক্ষ্ণ স্পষ্টরেখাগুলি—যা এখন পর্যন্ত প্রভাতী শিশিরসিক্ত, ছায়ার স্বচ্ছ শীতলতা—সব খুঁটিনাটি দৃশ্য এই সকালে গভীর সম্পূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"

অনুরূপ মুগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় পাই 'ছিন্নপত্রে'র ৫৫-সংখ্যক পত্রে (শিলাইদহ, ৩ ভাদ্র, ১৮৯২)। এখানে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন : "এমন সুন্দর শরতের সকাল-বেলা চোখের উপর যে কী সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরানদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর, শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলেছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। · আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎ-প্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে।"

রঙের ঘোর ও নেশার রঙ, উভয়ই প্রবল। শরৎ-সুন্দরীর মোহিনী আকর্ষণে উভয়েই ধরা দিয়েছেন এবং এই উল্লাস তারই স্বীকৃতি। রহস্যময়ী চঞ্চলা পদ্মা, এবং ধ্যানগম্ভীর আল্পস্ এই দুই কবিমনকে মহত্তর সৌন্দর্যলোকের পথে আকর্ষণ করেছে। এখানেই অ্যামিয়েল এবং রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতা।

অ্যামিয়েল আগে দার্শনিক, পরে কবি। রবীন্দ্রনাথ আগে কবি, পরে দার্শনিক। অ্যামিয়েলের অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা, দর্শনচিন্তা ও আত্ম-অবিশ্বাস তাঁকে ব্যর্থতার পথে টেনে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ও সুগভীর মানবিকতা তাঁকে শুষ্ক দর্শন-চিন্তার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে মহত্তর সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। এখানেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। অ্যামিয়েল মোহিনী প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুধা-পানে উন্মত্ত হয়ে বলেছেন : "বেঁচে থাকা, অনুভব করা, প্রকাশ করার একটি প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ের অন্তস্তলকে আলোড়িত করেছে।" (৬ এপ্রিল, ১৮৬৯)। ঠিক তার পরই বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন : "দুঃখ ও অসতের সমস্যা চিরকাল জীবনের প্রধান প্রহেলিকা হয়ে আছে ও থাকবে—জীবনের অস্তিত্বের পরেই এর স্থান।" (১৪ এপ্রিল, ১৮৬৯)। রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাসঙ্কট থেকে মুক্ত ছিলেন তাঁর ধরণীপ্রীতি তথা

মানবপ্রীতির জোরে। 'ছিন্নপত্র' পড়লে মনে হয়, পদ্মা একদিকে মানবসংসার, অপরদিকে বিশ্বলোক, একদিকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা, অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা —এ দুয়ের মধ্যে যোগসাধন করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিষাদ রোমান্টিক বিষাদ, তাঁর বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির বৈরাগ্য। অস্তিত্বের চিন্তায় কোনো আত্মসঙ্কটের আবর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অ্যামিয়েলের মত নিঃশেষিত করেন নি। 'ছিন্নপত্রে' তথা 'গল্পগুচ্ছে' ধ্বনিত হয়েছে 'মানবতার করুণ গীতধ্বনি', তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল কবির বিষাদ যা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র মর্মমূলে বর্তমান—তার মূল সুগভীর প্রকৃতি-প্রীতি,'ছিন্নপত্রে'র ১৪, ১৮, ২৭, ৩৫, ৫৭, ৬৬, ১৫২-সংখ্যক পত্রগুচ্ছ তার পরিচয়স্থল। আর প্রকৃতিপ্রীতির অপরদিক সংসারপ্রীতি—সংসারবিরাগ নয়।

এই ভাবটি খুব সুন্দরভাবে কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন ১৪-সংখ্যক পত্রে: "এমন মনে করা যেতে পারে—মা-পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকরনার কাজ নিয়ে থাকে; যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতল আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে; এই জন্য আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটি অংশ আছে যেটি কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধ্যের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম।"

'ছিন্নপত্রে'র শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, কবির মনোজীবনের অভিলাষ, কাব্যসাধনা ও প্রেরণার কথা এতে প্রকাশিত হয়েছে। যে রোমান্টিক বিষাদ ও বৈরাগ্য এ-পর্বের রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল, তা যে অমূল তত্ত্ব নয়, পদ্মাবাসী কবির জীবনে তা যে বাস্তব অপেক্ষা সত্য, উদাস বিষণ্ণ অবনতমুখী সন্ধ্যার চিত্রে তার সমর্থন পাই। সন্ধ্যার ব্যাকুল হৃদ্‌স্পন্দন কবিহৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে মিলে গেছে। 'ছিন্নপত্রে' সন্ধ্যার বর্ণনা বারবারই এসেছে—সর্বত্রই এক সুর—দিগন্তের শেষ প্রান্তে 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা' —তার যাত্রাপথে কোথাও আশ্বাস নেই, অসীম কারুণ্যগভীর বিষাদে ছেয়ে আছে সে পথ। কবির স্বীকৃতি 'ছিন্নপত্রে' পাই, "আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে,

মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ! সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়।" [২৩-সং পত্র]

অবনতমুখী সন্ধ্যার বর্ণনায় কবি-লেখনী কখনও ক্লান্ত হয় নি। বোধ করি সন্ধ্যার সঙ্গে কবি এই পর্বে মনোজীবনের সাধর্ম্য অনুভব করেছিলেন, সন্ধ্যার আসনে যে বিষাদ, বৈরাগ্য ও কারুণ্য দেখেছিলেন, তা সেদিনের কাব্যসাধনায় ধরা পড়েছিল। মনোজীবনের মুক্তি কবি পেয়েছিলেন সন্ধ্যার অভিসারে, রাত্রির অভিমুখে সন্ধ্যার অভিসার তার মুক্তি ও সার্থকতার অভিসার। 'ছিন্নপত্রে'র শেষ (১৫২-সং) পত্রে এই সত্যটি অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে: "কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী —আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পিতৃগৃহ!"

এখানে যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যযাত্রার কথা বলা হয়েছে, 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় তারই কাব্যরূপ পাই। 'ছিন্নপত্র' তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষ্য এবং জীবনভাষ্য, সাধারণ পত্রসংকলন নয়, কবিমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভের চাবিকাঠি।

৯

ছিন্নপত্রাবলীর রবীন্দ্রনাথ

এক

'ছিন্নপত্র' বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই পত্রগুচ্ছ স্বাদবৈচিত্র্যে গদ্যসৌন্দর্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয়-প্রকাশে মূল্যবান।

ছিন্নপত্রের আলোচনায় লিখেছি, তার প্রধান মূল্য এইখানে যে, রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গে সহজে কিছু বলতে চাইতেন না, এ'কথা রবীন্দ্রানুরাগীর অজানা নয়; শিল্পসৃষ্টির রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে যে সাজঘর আছে, তার পট সরিয়ে ফেলে উৎস বা প্রাথমিক উপাদানের পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথের ছিল একান্ত অনীহা। কাব্যের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জীবনচরিতে, বাইরের ঘটনায় কবির পরিচয়সন্ধান মূঢ়তা;—এই ছিল তাঁর অভিমত। কবিজীবনে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—তরুণ যৌবনের পর্ব, কবি-জীবনের পঁচিশ থেকে চল্লিশ বৎসর পর্ব—সেটির কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চাননি। 'জীবনস্মৃতি' কবি রচনা করেছেন পঞ্চাশে উপনীত হয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কথা বলেই তিনি লেখনীর মুখ চেপে ধরেছেন, যৌবনের সিংহদ্বারে পাঠককে পৌঁছে দিয়ে সরে গেছেন। কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঠক যত বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় তাদের আফসোস। 'কড়ি ও কোমল'এর রচয়িতা যে তরুণ যুবক কবি, তাঁর ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবনের কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথ কবুল করেন নি। বায়রন বা গ্যোটের পত্রাবলী ও আত্মজীবনীতে যে অন্তরঙ্গ গোপন-কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার কিছুই বলেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে যা অনুদ্‌ঘাটিত, 'ছিন্নপত্রে' তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র একটি অনন্যসাধারণ গুরুত্ব আছে। কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে' এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে মধ্যযৌবনে উপনীত রবীন্দ্রনাথের মুখে অনেক কনফেশ্যন্ শোনা যায়—যা আর কোথাও শোনা যায় না। অবশ্য 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে অনেক কাটছাঁট করেছেন। আমার আক্ষেপ সেখানেই।

এতদিনে 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রকাশে সে আক্ষেপ বহুল পরিমাণে মিটেছে। 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে) 'ছিন্নপত্রাবলী' সংকলিত ও প্রকাশিত হলো। 'ছিন্নপত্রাবলী'র 'গ্রন্থপরিচয়ে' সম্পাদক বলেছেন—"১৮৮৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে যে চিঠিগুলি লেখেন তাহারই কতকগুলি (সংখ্যায় ১৪৫টি) ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে অংশতঃ সংকলিত হয়। পূর্বোক্ত আট বৎসর কয় মাসের প্রায় অধিকাংশ চিঠির সারাংশ দুটি বাঁধানো খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন; রবীন্দ্রনাথ বহু চিঠি পুরাপুরি আর বহু চিঠির বহু অংশ পুনশ্চ বর্জন করিয়া, প্রয়োজনমত ভাষা ও ভাবগত সংস্কার করিয়া, সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া কতকটা 'সাহিত্যিক' আকার দেন—ইহাই ছিন্নপত্র-সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ... ইন্দিরাদেবীর পূর্বোক্ত খাতা-দুটিতে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি চিঠি মূলতঃ যে ভাবে পাওয়া যায় বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সম্পূর্ণ সংকলন। এজন্য ইহাতে ছিন্নপত্রে-বর্জিত বহু চিঠি আছে (সংখ্যার হিসাবে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১০৭টি অতিরিক্ত চিঠি আছে) আর বহু চিঠির বহু অংশ পূর্বে যাহা বর্জিত ছিল, তাহাও সংকলন করা হইয়াছে।"

বর্তমান 'ছিন্নপত্রাবলী' সংকলনে পূর্বের ১৪৫টি পত্রের পূর্ণতর পাঠ ও নোতুন ১০৭টি পত্রের অসংক্ষেপিত পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়।

দুই

ছিন্নপত্রাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর আস্বাদ্যমানতা। বর্জিত অংশগুলির পুনর্যোজনায় উপভোগ্যতা বেড়েছে। আর নোতুন সংযোজিত পত্রগুলিতে ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে আরো অন্তরঙ্গরূপে পাই। এই পরিচয় ছিন্নপত্রে ছিল, ছিন্নপত্রাবলীতে তা আরো গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পিতা রবীন্দ্রনাথ, পরিহাসরসিক রবীন্দ্রনাথ, বন্ধন-অসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজদম্ভের প্রবল প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথকে এখানে অন্তরঙ্গরূপে পাই।

বর্জিত অংশগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত কাছের মানুষরূপে পাই যে ভেবে বিস্মিত হই কেন তিনি এ-সব অংশ বাদ দিতে গেলেন। যেমন, 'ছিন্নপত্রাবলী'র ২০৮ সংখ্যক পত্র—

পূর্বেকার অংশ: ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্তই কম বেলা নয়—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি

করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।

বর্জিত অংশ: মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে—ইচ্ছে করছে খানিকটে বরফ দিয়ে এক-গ্রাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরবৎ খাই।

এই পত্রের শেষে বর্জিত অংশ: ভালো ভ্রমণবৃত্তান্ত জিনিষটা সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় পড়বার সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কলকাতায় ও-সব বই হাতে করতে ইচ্ছে করে না—কারণ, কলকাতায় সে রকম সুন্দর অবিচ্ছিন্ন অবসর নেই। ও-সব বই আমি মফস্বলের জন্যে জমিয়ে রেখে দিই। সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যায় ঐ রকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের—এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। সত্য বলত, আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে—তা, আছে বটে।

এই পত্রের বর্জিত অংশ দুটির কোনটাই ত্যাগ করতে মন চায় না। দুটোর মধ্যে দিয়ে কবিব্যক্তিত্ব ও পরিহাসরসিক মানুষের সুন্দর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এই পরিহাসরসিক মানুষের একটি চমৎকার ছবি পাই নবসংযোজিত ২১৯ সংখ্যক পত্রে। সাহাজাদপুর থেকে লেখা ৬ জুলাই ১৮৯৫ তারিখের চিঠি। পুণ্যাহ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন—

"····· প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল—ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মেধা—সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে—সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদমুখ একথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা—এক বৎসর তোমায় দেখিনি!'···শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে-অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চুমো খেতে লাগল—কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে—বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।"

এই পত্রের অন্তর্নিহিত পরিহাসরসিকতা এবং গভীর প্রজাবাৎসল্য ও দেশহিতৈষণা—দুই-ই সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। গ্রামের চাষীদের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা, বাৎসল্যভাব ও আত্মীয়বোধ 'ছিন্নপত্রাবলী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

[দ্র. ১১৬, ২১৯ সং পত্র]

বিশুদ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদ ছিন্নপত্রাবলীর নবসংযোজিত পত্রগুচ্ছে পাই। ছিন্নপত্রে যা আভাসে ব্যক্ত, এখানে তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। ২ সংখ্যক পত্রটি এর সুন্দর উদাহরণ। কবি বলছেন,

"কোমরটা যে কেবলমাত্র কাছা এবং কোঁচা গুঁজে রাখার জায়গা তা আর কখ্খনো মনে করব না—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই কোমর আশ্রয় করে আছে। ····· প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোমরের কথা আর লিখব না। ভারী তো কোমর তার আবার কথা। একে তো aesthetic-এর সমস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাতে বহরে ক্রমিক উন্নতি লাভ করছিলেন, তার উপরে আবার থেকে থেকে তাঁর সহস্র রকম বাহানা। এই কোমরের কথা যাকে বলি সেই হাসে, কারও করুণা আকর্ষণ করে না; কোমর ভাঙা যেন হৃদয় ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাইনে কাউকে বলতে—চাইনে কারও করুণা—

আমার কোমর আমারই কোমর
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে।
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার কোমর আমারই আছে!

······কিন্তু থাক, কোমরের কথা যখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মানুষের অন্যান্য অংশ আছে, তার মন আছে, তার হৃদয় আছে, তার আত্মা আছে—কিন্তু যাই বলো, তার কোমরও আছে—এবং খুবই আছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,
তবু কোমর কেন টনটন করে রে!
চারিদিকে চলা ফেরা,
আমার কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে।"

এখানে পাঠকের স্মিত হাস্য ক্রমে উচ্চ হাস্যে এবং উচ্চ হাস্য ক্রমে অট্টহাস্যে পরিণত হয়।

এখানেই শেষ নয়; আরো আছে। যেমন নবসংযোজিত ৫ সংখ্যক পত্রে সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রদের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বিবরণী।

কবি বলেছেন, "এখানকার স্কুলের সেকেণ্ড্ মাস্টার আমার হেঁয়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার 'হেঁইলি নাট্য' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন—'পড়্যা আমরা হেস্তা কুট্‌পাট্!' পরশুদিন সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় যাওয়া গেল।"

এরপর ছাত্রদের ভাষণের আপাত গম্ভীর বিবরণ ও সভাপতিরূপে কবির ভাষণের সারাংশ। তারপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কবির বয়ানে এটি অপরূপ কৌতুকচিত্রে পরিণত হয়েছে।

"প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত। তিনি বললেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না —কবিত্বশক্তি বক্তৃতাশক্তি এবং তার উপরে সংগীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সেকেন্ড্-মাস্টার উঠে বললেন—'পণ্ডিত মহাশয় যা বললেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না, যথেষ্ট বলা হয় নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ লোক নন—স্বর্গীয় মহাত্মা (এইখেনে প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম রাষ্ট্র বললে অত্যুক্তি হয় না—তিনি এঁর পিতামহ—রাজর্ষি বললেও হয় মহর্ষি বললেও হয়। দেবেন্দ্র ঠাকুর এঁর পিতা।' তারপরে এল কবিত্বশক্তি এবং 'হেঁইলি নাট্য'। আমি শুনে অপ্রস্তুত। তারপরে বললেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কী—Example is better than precept—ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। সবাই হাততালি দিলে। তারপরে সভা ভঙ্গ হল।"

আগাগোড়া উচ্ছ্বসিত কৌতুক, আপাত গাম্ভীর্যের নির্মোকে আবৃত, প্রতি মুহূর্তেই তা ফেটে পড়তে চাইছে। মজলিশী রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে পাই।

কিন্তু কেবল কৌতুক নয়, কঠিন প্রতিজ্ঞা, রুদ্ধ রোষ ও আহত দেশাভিমানের বেদনাও ছিন্নপত্রাবলীতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিক আত্মশক্তির উপাসক রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় এখানে পাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি পত্রের সংযোজিত অংশ। কটকে এক ডিনার টেবিলে এক উৎকট ইংরেজের দম্ভ ও অপমানসূচক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে পাই। যখন এই 'পূর্ণপরিণত জন্‌বুষ' বললে যে এদেশের moral standard low, এরা জুরীপদের অযোগ্য, তখন কবির 'বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল'। এই উক্তির প্রতিক্রিয়ায় পত্রলেখকের মনের যে পরিচয় পাই, তা আজো বারবার স্মরণযোগ্য। কবি লিখছেন,

'উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা!……

আমি একসেপ্‌শন সাজতে চাইনে—যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব—সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুক্‌রোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায়—যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়—তারপরে আর আমার কিসের গৌরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে বাইরের জাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমরা কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে জীর্ণতম কুটীরের জীর্ণতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট্‌ কাপড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংশ্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতর মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি - কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মত ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসে ছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব।'

[ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ৭৯]

দেশপ্রেমের আগ্নেয় অক্ষরে লেখা এই পত্রাংশ রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন, এ'কথা ভেবে বিস্মিত হই। যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের বাণীসাধক, স্বদেশী সংগীতের রচয়িতা, আত্মশক্তি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, সেই রবীন্দ্রনাথকেই আমরা নিতান্ত ঘরোয়া জীবনের মধ্যে পাই, এ কম সুখের কথা নয়।

তিন

কিন্তু 'ছিন্নপত্রাবলী'র গৌরব সেইক্ষেত্রেই যে ক্ষেত্রে 'ছিন্নপত্রে'র গৌরব প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতিমুগ্ধ কবিমানসের পরিচয় দুই সংকলনেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র

নোতুন পত্রগুচ্ছে সে পরিচয় আরো মধুর, আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

নিঃসঙ্গ বোটবিহারী রবীন্দ্রনাথকে এইসব পত্র রচনাকালে সঙ্গ দিয়েছে চঞ্চলা সুন্দরী পদ্মা—সুখদুঃখভরা গ্রামগুলি, নির্জন বালুচর, সুনীল আকাশ, রহস্যভরা মধ্যাহ্ন ও মোহিনী সন্ধ্যা। কবিমানসের যোগ্য ধাত্রী পদ্মালালিত ভূখণ্ড আর নিঃসীম আকাশক্ষেত্র। এই পরিচয়ই কবির সত্য পরিচয়। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তা অপরূপ মাধুর্যে কোমলতায় কারুণ্যে উদ্‌ঘাটিত।

এখানে যদৃচ্ছা কয়েকটি নোতুন চিঠির উদ্ধৃতি সংকলন করা যাক:

(ক) "এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে- তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্তে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ঝাঁপ হাঁসফাঁস ধড়্‌ফড়ানি ঘড়্‌ঘড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়।"

[সাজাদপুর থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ৬৯]

(খ) "গোলাপ ফুলের বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুর্‌ভুর্ করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ।·· টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।··· শিরীষ ফুল কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিল। কালিদাসের বইয়ে শিরীষ ফুল সৌকুমার্যের তুলনাস্থল ছিল।"

[কর্মাটার থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১১২]

(গ) "স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো

কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছে না—ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্তগম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্নমূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল।"

[কলকাতা থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১৩২]

(ঘ) "আমি চিঠি পাই সন্ধ্যের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুরবেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে—এখানকার এই দুপুরবেলাকার কথা। কেননা আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমাব রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে—এ আমার প্রতিদিনের নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পাবি নে।"

[সাজাদপুর থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১৫০]

এই যথেষ্ট। প্রকৃতি প্রেমের উত্তাপে ভরা এ-ধরনের চিঠি 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ছড়িয়ে আছে। কবিত্বপ্রধান প্রকৃতিপ্রেমমুগ্ধ উদাস ব্যাকুল একটি হৃদয়ের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রগুচ্ছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা - তিন প্রহরেই পদ্মালালিত ভূখণ্ড ও মেঘশূন্য নীলাকাশ কবির দৃষ্টিতে অপরূপ সৌন্দর্যের আকর বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে শান্তি, গভীরতা ও রোমান্টিক ব্যাকুলতার রমণীয় পরিণয় সাধিত হয়েছে। সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালী ও গল্পগুচ্ছের মানসপটভূমি এই পদ্মালালিত নিসর্গ, এ'কথা মেনে আমাদের দ্বিধা হয় না।।

'ছিন্নপত্রে'র শেষ চিঠির (১৫২ সংখ্যক) আদি রূপ 'ছিন্নপত্রাবলী'র ২৪৬ সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়। কেবল প্রকৃতিপ্রেমী কবিকে পাওয়ার জন্য নয়, আল্যেথকারকেও আমরা এই অপরূপ পত্রে পাই। দুটি পত্রই মূল্যবান। মূল চিঠিতে তন্দ্রালসা সন্ধ্যার আগমনের বর্ণনার সঙ্গে প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনশীলতা ও চলমান নবীনতার ইঙ্গিতটি রয়েছে। ছিন্নপত্রের অন্তর্গত সুসংস্কৃত পত্রে সেই ইঙ্গিত-বর্ণনাটি বর্জিত হয়েছে; কিন্তু সন্ধ্যার অভিসারিকা-রূপটি ত্রুটিহীন নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। সবটা মিলিয়ে পড়লে কেবল মুগ্ধ হয়ে বলতে ইচ্ছা করে Here is God's plenty, মন স্বীকার করতে চায় রবীন্দ্রনাথ-নামক প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর অর্ধমনস্ক পত্রেও আপন বিভূতি ও মহিমাকে গোপন করতে পারেন নি।

চার

'ছিন্নপত্রাবলী'র সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে কি কবি সচেতন ছিলেন না—এই প্রশ্নের আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পত্রসাহিত্য কবি-ব্রহ্মার অর্ধমনস্ক সাহিত্যসৃষ্টি, এ-কথা মেনে নিলেও এর মূল্য কমে না। 'ছিন্নপত্রে'র সংকলনকালে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর নির্মমভাবে কলম চালিয়েছিলেন। তার ফলে যেমন অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বেশ কিছুটা ঢাকা পড়েছে, তেমনি কবিহৃদয়ের অনেক কন্‌ফেশ্যনও বাদ গেছে। সুখের বিষয় 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তা পুনঃসংযোজিত হয়েছে।

এই-সব পত্রে কবিমানসের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না—এই সত্য পত্রলেখকের অবিদিত ছিল না, তার প্রমাণস্থল 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৬০ সংখ্যক (অংশতঃ সংযোজিত) ও ২০০ সংখ্যক (নোতুন) পত্রে। পত্ররচনায় কেবল লেখকের নয়, প্রাপকেরও একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে, যেমন এই সত্য রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে এইসব চিঠির মূল্য যে কবিমানসের সত্য পরিচয় উদঘাটনে, সে-কথাও ব্যক্ত করেছেন। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে এই বক্তব্যের পোষকতা হবে।

১৬০-সংখ্যক পত্রের নবসংযোজিত অংশে ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "আমিও জানি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় হয়নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার একথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্যকথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্য-কথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।" [৭ অক্টোবর ১৮৯৪]

আর ২০০-সংখ্যক নবসংযোজিত পত্রে রবীন্দ্রনাথের গভীর আন্তরিক কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে—

> "আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস [বব], আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এইসমস্ত দিনগুলো

স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে। তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা-ভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।" [১১ মার্চ ১৮৯৫]

পত্রলেখকের সহযাত্রী হয়ে আমরা যখন ছিন্নপত্রাবলীতে সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে পদ্মালালিত নির্জন চরভূমি, স্নেহময় তন্দ্রালস জনপদ এবং নিঃসীম নীলাকাশে মানস-ভ্রমণ করি, তখন রবীন্দ্রমানসের এক নোতুন পরিচয় আমাদের বিস্মিত দৃষ্টিপথে উদ্‌ঘাটিত হয়, প্রজাবৎসল স্বাজাত্যভিমানী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পরিহাসরসিক চিন্তাশীল প্রকৃতিপ্রেমী কবি-ব্যক্তিত্ব অপরূপ মহিমায় উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

পাঁচ

ছিন্নপত্রাবলী যে রবীন্দ্রসাহিত্যসৃষ্টির ভিত্তিভূমি, এ বিষয়ে আমরা ইদানীং সচেতন। বোধ করি প্রথমে অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিকে [রচনাকাল ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ, পত্রলেখকের বয়স ২৪ থেকে ৩৪ বছর] পরবর্তীকালে পত্রলেখক কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এ প্রশ্ন আমাদের উদ্দীপ্ত করে। সাতাত্তর বছর বয়সে 'পথে ও পথের প্রান্তে'র (১৯৩৮) হ্রস্ব ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ পত্রধারা-পর্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ছিন্নপত্র-পর্যায় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"ছিন্নপত্র পর্যায়ে যে চিঠির টুক্‌রোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল ; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতুহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ যায় খুলে। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তাদের স্বাদের বদল হয়। চারিদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা

চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা যায় না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।"

ছিন্নপত্র লিখবার সময় রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনের খ্যাতি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন নি ; তাঁর তুচ্ছতম চিঠিখানি পর্যন্ত যে মুদ্রিত হবে, লোকে আগ্রহে পড়বে এমন কথা নিশ্চয় ভাবেন নি ; এই চিঠিগুলিও যে ছাপা হবে এমন নিশ্চয়তা হয়তো ছিল না : এই তিন কারণে পত্রলেখক ছিন্নপত্র-রচনাকালে সহজ হতে পেরেছিলেন। কেবল যাকে লিখছেন তার বিনোদনের জন্য প্রধানত এগুলি লিখিত হওয়ায় চিঠিগুলি সহজরসে পূর্ণ। ছিন্নপত্রের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সহজতার অন্তরালে এইসব কারণ সক্রিয় আছে বলে অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মনে করেছেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' ৩৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত আদর্শ—"ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।" এই আদর্শ কেবল ছিন্নপত্রেই লভ্য। চল্লিশ-উত্তীর্ণ জীবনে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন প্রকাশ্য দরবারে। অনধিকারীর কৌতূহলী দৃষ্টিকে এড়িয়ে কিছু লেখবার বা বলবার সত্যযুগ রবীন্দ্র-জীবন থেকে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত। গুরু, মনীষী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথ। তাই একথা স্বীকার্য, ঘরোয়া অন্তরঙ্গ পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথকে কেবল ছিন্নপত্রেই পাই। পরবর্তীকালের চিঠিপত্রে তাঁর দেখা পাই না। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে কিছুটা সহজরস আছে, কারণ পত্রপ্রাপিকা অল্পবয়সের বালিকা। বাকি সব চিঠিতে পত্রলেখকের এক চোখ পত্রপ্রাপকের দিকে, অন্য চোখ পাঠকের দিকে। কোনোটা সরব চিন্তামাত্র [পথে ও পথের প্রান্তে], কোনোটা পত্রের ছদ্মবেশে প্রবন্ধমাত্র [রাশিয়ার চিঠি]।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিকে বিষয়, বিন্যাস, মানসিকতা অনুযায়ী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অধ্যাপক বিশী শ্রেণীবিভাজনের যে সূত্রটি করেছেন ['রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র', রবীন্দ্র বিচিত্রা], তা হলো—

(ক) সেইসব চিঠিপত্র, যাতে সত্যকার পত্রসাহিত্যের রস—সহজের রস—আছে, অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশ আছে, আন্তরিক উন্মোচন আছে।

(খ) সেইসব চিঠিপত্র, যাতে কবির কলম সত্যিকার পত্রসাহিত্য রচনা করতে করতে কবি-প্রকৃতির ইঙ্গিতে পত্রসাহিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে।

(গ) সেইসব চিঠিপত্র, আদৌ যাতে যথার্থ পত্রসাহিত্যের গুণ নেই।

ছিন্নপত্রাবলী থেকে এই তিন শ্রেণীর পত্রের নমুনা উদ্ধার করা যাক। প্রথম শ্রেণীর পত্র ছিন্নপত্রে সংখ্যায় প্রচুর। যেমন,

"দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দ্বিপুদের দক্ষিণের ঘরে

একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একখানা ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়বো মনে করছি, বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন পাতা-কাটা বই।... সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যায় ঐরকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের—এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। সত্য বল্‌ত আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে বটে—তা আছে বটে।" [ছিন্নপত্রাবলী ২০৮ নং]

নির্জন উপভোগের এই অভিলাষ অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে পাঠকের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছে। স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি তাঁর অল্প বয়সের ভাইঝি ইন্দিরাকে লিখেছিলেন, লেখার সময় ভাবেন নি তা কখনো মুদ্রিত হবে। তাই তিনি এখানে সতর্ক পোষাকী নন, ঘরোরা ও অন্তরঙ্গ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠি ছিন্নপত্রে আছে শেষের দিকে। প্রথম শ্রেণীর চিঠির সহজরস শেষের দিকে কমে যাচ্ছে—চিঠির মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। প্রথম শ্রেণীর চিঠির লক্ষ্য ছিল পত্র-প্রাপিকার চিত্ত-বিনোদন, দ্বিতীয় শ্রেণীর অভীষ্ট পত্রলেখকের আত্ম-বিনোদন, বস্তুত নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ। ছিন্নপত্রে আছে কবির মনের দীর্ঘকালের ইতিহাস। তাই সহজরস যেমন আছে, তেমনি আছে গভীর রস। যেমন,

"আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে,—তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোট-খাটো সুখ-দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়—কিন্তু এই অনন্ত প্রসারিত উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতাপূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য-পূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্য-নৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়।" [ছিন্নপত্রাবলী ২৩ সং]

বিষাদ ও বৈরাগ্য, নির্বেদ ও শান্তি এই চিঠির অন্তরালে প্রবাহিত। এ পত্র শুরু করেছিলেন পদ্মালালিত আকাশ ও পৃথিবীর বর্ণনা দিয়ে। অচিরেই চিত্ররস ছেড়ে পত্রলেখক চলে যান জীবনে শান্ত বিষাদের উৎস-সন্ধানে। কবি-প্রকৃতির ইঙ্গিতে পত্রলেখক এখানে পত্রসাহিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে যান। তখন আর তাঁর মনে থাকে না কাকে লিখছেন এই চিঠি।

তৃতীয় শ্রেণীর পত্র সংখ্যায় সবচেয়ে কম। এ ধরনের পত্রের প্রাপক হয়তো একজন আছে, না থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। এখানে কোনো নির্দিষ্ট পত্রপ্রাপক পত্রের উদ্দিষ্ট নয়। এ ধরনের পত্র আসলে সৌন্দর্যপিয়াসী কবিহৃদয়ের উন্মোচন। যেমন,

"কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি-অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা-হা করছে, কোথাও দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় একপ্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন অস্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পিতৃগৃহ!" [ছিন্নপত্র ১৫২ সং/ছিন্নপত্রাবলী ২৪৬ সং]

সন্ধ্যার এই আশ্চর্য অভিসারিকা-রূপের কল্পনা ও চিত্রণের অন্তরালে যে শিল্পী-মন সক্রিয় তাকে প্রাত্যহিক পত্ররচনার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায় না।

ছয়

পাশ্চাত্ত্য লেখকদের পত্রাবলীর কথা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীর আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। কীটস্‌, বায়রন, লরেন্স, রিল্‌কে, বোদল্যার প্রমুখের পত্রগুচ্ছ লেখক-সত্তাকে যে-ভাবে উন্মোচিত করেছে, ছিন্নপত্রাবলী ঠিক সেভাবে রবীন্দ্র-সত্তাকে উন্মোচিত করে নি। বায়রন্‌-এর পত্রে পাই তাঁর অসংযত আত্মোদ্‌ঘাটনকে, বোদল্যার-এর পত্রে পাই পাপের তীব্র যন্ত্রণাকে, লরেন্স-এর পত্রে পাই তাঁর অদৃশ্য প্রাণশক্তি ও তীব্র বিষাদকে, রিল্‌কে-র পত্রে পাই বিষাদ, প্রেমের উন্মাদনা ও ব্যর্থতাকে। কীটস্‌-এর পত্রে উন্মোচিত হয়েছে জীবন-সম্ভোগের অদৃশ্য-স্পৃহা, যা রোগযন্ত্রণা বা মৃত্যু-শোকের উপর জয়ী হয়। ছিন্নপত্রাবলীতেও এই জীবন-স্পৃহা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণেই তা প্রমাণ হয়।

১ আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখদুঃখ বাসনা, এক জায়গায় কোথাও তার একটা অনন্ত অবলম্বন আছে, একটা চিরন্তন সমবেদনার আধার আছে, একথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা নিষ্ঠুর প্রহসন বলে মনে হয়।

[২৫ নভেম্বর ১৮৯৪]

২. ব্যক্তিগত শোকদুঃখ নীচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রিজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহ-পথে হু হুঃ শব্দে চলে যায়—নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে। [১৪ আগষ্ট ১৮৯৫]

৩. মৃত্যুতেই যেমন আমাদের জীবনকে একদিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর একদিকে সীমামুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুই অতি সুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্ত্বনাস্থল। [২০ জুলাই ১৮৯৫]

কীট্‌স-এর পত্রে এই বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রোগ-যন্ত্রণা বা মৃত্যু-ঘটনা কীভাবে তাঁর চিত্তকে আঘাত করে ('the death or sickness of some-one has always spoilt my hours'), সেকথা কীট্‌স যেমন লিখেছেন, তেমনি মৃত্যু-বেদনাকে সহনীয় করার কথাও লিখেছেন ('how necessary a world of pains and troubles is to school an intelligence and make it a soul') [শ্রীউজ্জ্বল মজুমদার 'রবীন্দ্র-অন্বেষা'য় ছিন্নপত্রাবলী-প্রসঙ্গে এইসব পত্রের উল্লেখ করেছেন]।

রবীন্দ্রনাথের যে গভীর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিন্নপত্রাবলীতে উদ্‌ঘাটিত, তা কবিতা ছাড়া আর কোথাও পাই না। কীটস্‌-এর মতোই রবীন্দ্রনাথ কাব্যসৃষ্টিকে শিল্পীমনের উন্নত চেতনার ফল বলে মনে করেছেন। বাস্তবের দুঃখবেদনা উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পের অলৌকিক সৌন্দর্যলোকে উত্তরণকেই রবীন্দ্রনাথ কীটস্‌-এর মতোই প্রার্থিত বলে মনে করেছেন। কীটস্‌ লিখেছিলেন,

> I obliged to smother my spirit and look like an idiot—because I feel my impulses given way to would too much amaze them—I live under an everlasting restraint—Never relieved except when I am composing.

ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ এই অনুভূতি-ই প্রকাশ করেছেন :

১. আমার আসল জীবনটি তার (কবিতার) কাছেই বন্ধক আছে। 'সাধনা'ই লিখি আর জমিদারীই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান। [ছিন্নপত্রাবলী ৯৪ সং]

২. লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নেই। আমার অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি—যখন সেটা পালন করি তখন সুখদুঃখ সমস্তই লঘু হয়ে আসে, যখন না করি তখন সুখদুঃখের দল একপাল ডালকুত্তার মতো একেবারে কণ্ঠ চেপে ধরতে আসে—মানুষের উপর এ এক বিষম জুলুম। [তদেব ২৪৮ সং]

কবি কীটসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সারাজীবনব্যাপী। ছিন্নপত্রাবলীতে তার প্রকাশ ঘটেছে—

আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। ···· আমি যত ইংরাজ কবি জানি সবচেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে। অমন মনের মতো কবি আর নেই।··· কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে।······কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তাঁর রচনায় কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটি সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্‌সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তাঁর প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কীট্‌সের জীবনচরিতটি তোকে পড়তে দেব। ওঁর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড়ো সকরুণ।

[তদেব ২৫১ সং]

কীট্‌সের পত্রাবলীর কথা বারবার মনে পড়ে ছিন্নপত্রাবলী-প্রসঙ্গে। তার আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কাব্যানুভবকে তত্ত্বের সমর্থনে ব্যবহারে বা যুক্তিজালে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে কীটসের বিমুখতা ছিল। চিঠিতে সেকথা কীট্‌স একাধিকবার বলেছেন: Axioms in philosophy are not axioms until they are proved upon our pulses. আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, We hate poetry that has a palpable design upon us.

একথাই চিত্রা কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতায় এবং ছিন্নপত্রাবলীর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সঙ্গে তত্ত্বজালমুক্ত সোজাসুজি আত্মিক যোগের কথা তিনি পত্রে লিখেছেন:

"সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা

সৌন্দর্য আর্ট প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল—এক-এক সময় এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়—মনে হয় এর বারোআনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা। সেদিনও পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল। এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুৎকারে বাতি নিবিয়ে দিলুম। নিবিয়ে দেয়া মাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। এমন অপূর্ব আশ্চর্য বোধ হল! আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল। অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমে অসীম হাসি একেবারে আড়াল করে রেখেছিল!" [তদেব ২৫০ সং]

সাত

/ ছিন্নপত্রাবলী সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালির জগতে প্রবেশক, গল্পগুচ্ছের উন্মোচক। এসবই সত্য। তার চেয়ে সত্য এখানে একজন প্রকৃতিপ্রেমী কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত। কবিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব (পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের পর্ব)-এর অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানেই আছে, আর কোথাও নেই। সর্বোপরি, আছে এক ব্যক্তি-মানুষের অন্তরঙ্গ নিবিড় পরিচয়, যা কোথাও কবি-লেখনীতে প্রকাশিত হয়নি।/ তার পরিচয়স্থল এই চিঠি :

"আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়—সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে—সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদ প্রমোদে আনন্দলাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডি আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না—আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহুদূরে। যখন আমি স্বভাবতই দূরে তখন সামাজিকতার খাতিরে

জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়োই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়; থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—কোথায় কী কাজকর্ম হচ্ছে, কী আন্দোলন চলছে, তাতে আমারও যোগ দিতে, সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে—এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।"

[বোয়ালিয়া ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪] [ছিন্নপত্রাবলী ১৫৬ সংখ্যক পত্র]

এই একটি পত্রে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত, তা সহস্র ব্যাখ্যালোচনাতে লভ্য নয়।

নির্জনতাবিলাসী মানবসঙ্গ-পরিহার-প্রয়াসী অথচ মানবসঙ্গ-ব্যাকুল কবির আন্তর-জীবনের স্বস্তি ও অস্বস্তির পরিচয় এখানে উদ্‌ঘাটিত। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-র কবিতা এবং 'বিদায় অভিশাপ' ও ছোট গল্প-রচনাকালে রচিত ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকৃতিসৌন্দর্য ও জীবনপ্রেমে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথকে বারবার আবিষ্কার করি। এ সময়ের প্রকৃতি কবির জীবনবীণায় প্রেম ও সৌন্দর্যের সুর বেঁধে দিয়েছে। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে গ্রাস করে আছে সৌন্দর্যসম্ভোগস্পৃহা। সব তুচ্ছ কথা, সব কোলাহল, সব বাগাড়ম্বর ছাপিয়ে ওঠে প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা: 'সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি সত্যি খেপিয়ে তোলে।'

রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যোন্মত্তরূপ ছিন্নপত্রাবলীতে বিধৃত।

"আমি যদি সাধুপ্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর····· সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়।—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, তার সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই-সমস্ত রঙ, আলো এবং ছায়া, আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে!···রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের

মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!…লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে!…আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাদের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এইরকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণ-খণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি সত্যি খেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।… যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তাহলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেরেছে তারা জানে—সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।" [ছিন্নপত্রাবলী ৫৫ সংখ্যক]

সৌন্দর্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে, সত্তালোপকারী অনুভূতি। লৌকিক থেকে তিনি অনায়াসে অলৌকিকে উত্তীর্ণ হয়ে যান এই সৌন্দর্যানুভূতিতে।

"সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট গোলাপ ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এইজন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দ-লহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম। তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্ত স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন

একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি—এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।"

[ছিন্নপত্রাবলী ১৯৭ নং]

কলকাতার ভিড়ে নয়, পদ্মালালিত শান্ত ভূখণ্ডে বা পদ্মাবক্ষে বোটে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্যকে স্পর্শ করেছেন। সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রামের উপরে উঠে আত্মাকে স্পর্শ করে, তা বারবার অনুভব করেছেন। সৌন্দর্যানুভূতি আসলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, তা রবীন্দ্রনাথকে মগ্ন করেছে। উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে কবি রবীন্দ্রনাথের নিত্য নবজন্ম ঘটেছে। ছিন্নপত্রাবলীতে সেই নবজন্মের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে।

১০
জীবনস্মৃতি : আলেখ্যদর্শন

'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয়মূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে নানাকারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারা'র অন্তরঙ্গ পরিচয় কবির নিকট এই প্রথম পাওয়া গেল। সেখানে কবি বলেছেন, "আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ দেখি না। সেইজন্য এ-স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।"

বাংলা সাহিত্যের তিন রত্ন—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দুজন আত্ম-জীবনী লেখেন নি, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তবে জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্ত বাদ দিয়ে 'জীবন'কেই বড়ো করে তুলে ধরেছেন। উক্ত প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে, ··তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।—··· ··
মানুষ আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাঁহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?"

এই অমূল্য আত্মবিশ্লেষণের আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্য বিচার্য।

দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'দম্ভ ও অহমিকা'র সন্ধান পেয়েছিলেন [দ্রঃ 'কাব্যের উপভোগ', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ] এবং এই অভিযোগ উপলক্ষ করে সেদিনের বাংলা সাময়িক সাহিত্যের পরিবেশ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছিল ; একটি রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয় এই ঘটনায়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে যদিও বলেছিলেন, "বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উন্টা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।" [দ্রঃ 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১৩১৪], তথাপি এই আক্রমণ ও বিরোধিতা তাঁকে বিশেষভাবে আহত করেছিল। এর পরেই 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এক বছর ধরে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে [১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত বিরোধিতার তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণে ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব নিরাসক্তভাব 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বজায় রেখেছেন এবং খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রহর অতিক্রম করে যে-মুহূর্তে বাহিরবিশ্ব ও পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছেন, সে-মুহূর্তে কলমের মুখ চেপে ধরেছেন। যখন পাঠকের কৌতূহল চরমে উপনীত হয়েছে, যখন জীবনে 'ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ' হয়ে এসেছে, যখন শিল্পীজীবনের খাসমহলের দরজায় পাঠকের চোখ পড়েছে, তখনি রবীন্দ্রনাথ কলম ছেড়ে দিয়েছেন। এই আফ্‌সোস জীবনস্মৃতির প্রতি পাঠকের। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে একটি উদাস ব্যাকুল অন্তর্মুখী প্রকৃতি-মুগ্ধ কবিত্বমুখ্য মনের পরিচয় পাই। কবি তাঁর রঙমহালের দরজা বাঙালি পাঠকের সামনে খুলে দিলেন না। তথাপি যা পেয়েছি, তাতেই পাঠকমন বলে ওঠে, এ-পাওয়া পরম-প্রাপ্তি।

কবির জীবনচরিত কি সংসারের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রখ্যাতকীর্তি পুরুষদের জীবন-চরিত থেকে ভিন্নতর হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনচরিত মহাপুরুষের এবং কাব্য মহাকবির। · কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই ; তাহার জীবন কাব্য নহে। যাঁহারা কর্মবীর, তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।··· কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্র পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশী

করিয়া দেখা যায়। টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে।··আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি।·· টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে—বাস্তবজীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্যে তাহা সত্য করা যাইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে কবির জীবনচরিত তাই অন্য অর্থে প্রতিভাত। কাব্যগত জীবনচরিত—যা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ['বঙ্গভাষার লেখক'-এ প্রথম প্রকাশিত]—হয়েছে, তা-ই সত্য, আর সব মিথ্যা। কাব্যই কবির সত্য জীবনচরিত তথা আত্মচরিত।

আর 'জীবনস্মৃতি'? কবির মুখেই শোনা যাক্‌ঃ

"কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটি মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে চাহিয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

"এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্ণে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখনই তাহাতে মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।"

[সূচনা, জীবনস্মৃতি]

সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে জন্মদিনের প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ আপন পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"
[আত্মপরিচয়, চতুর্থ প্রবন্ধ]

আত্মকথা বলতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'র উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কবি বলেছেন, "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটি সত্য নহে।" [আত্মপরিচয়, প্রথম প্রবন্ধ]

কাব্যকথা ও জীবনকথা—দুইকে রবীন্দ্রনাথ একসূত্রে গেঁথেছেন। জীবনস্মৃতি কবির জীবনের বৃত্তান্ত নয়, ইতিহাস নয়, চিত্রশালা। জীবনস্মৃতির আগাগোড়া একটি স্মিত হাসি ও পরিহাসের সুর অনুস্যূত হয়ে আছে। রঙের পর রঙে জীবনপটে কত ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বছরের জীবন থেকে নানা ছবি নির্বাচন করে দেখিয়েছেন। কোনোটা সুখের, কোনোটা দুঃখের, কোনোটা বিষাদের—সবটা মিলিয়ে আনন্দের মেলা। এক প্রকৃতিপ্রেমী কবির বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের আনন্দগুঞ্জরণে জীবনস্মৃতি মুখরিত হয়ে আছে।

দুই

উত্তররামচরিত নাটকের বিখ্যাত আলেখ্যদর্শন অংশের কথা এখানে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও তা মনে করেছেন। ফেলে-আসা জীবনের প্রতি মমতা কিছু-না-কিছু থাকেই, অহং-এর দাবী অস্বীকার করা যায় না, তথাপি এ ছাড়াই ছবির নিজস্ব একটা মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় সেই মূল্য অর্পণ করে সূচনায় বলেছেন, "নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী।"

জীবনস্মৃতির আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হলে বিচিত্র অনুভূতিতে পাঠকমন অভিষিক্ত হয়। সব ছবি একপ্রকার নয়। কোনোটার রঙ উজ্জ্বল, কোনোটার রঙ জ্বলে গেছে, কোনোটা ধূলিধূসরিত, কোনোটা বা বিবর্ণ। ছবিগুলোর ফ্রেম একপ্রকারের নয়। কোনোটা হাসির, কোনোটা কান্নার, কোনোটা বা হাসি-কান্নার আলোছায়ার ফ্রেমে

বাঁধানো। সমস্তটা মিলিয়ে এক অখণ্ড ছবি। অতি শৈশব থেকে চল্লিশ বছরের যৌবনকাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এই ছবির মিছিল চলেছে।

এবার আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথমেই যে ছবিটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল অন্দরমহলের ঘাটবাঁধানো পুকুর, তার পূব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড এক চীনা বট, দক্ষিণে নারিকেলশ্রেণী। এই ফ্রেমে ছবিটি বাঁধা পড়েছে। চিত্রকর নিজেই বলেছেন,

> "গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত।···· কেহ-বা ব্যস্ত,······কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই। ··এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলি সারা বেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।" [ঘর ও বাহির]

একই ম্যুরালে ছবির পর ছবি আসছে, তাতে আলো ও রঙ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রভাত থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ছবির গতি।

পরের ছবিটাও মধ্যাহ্নের। মধ্যাহ্নের সঙ্গী বালকের চোখে সেদিন এই ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল:

> "দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগানপ্রান্তের নারিকেলশ্রেণী, তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত সিঙ্গির বাগান পল্লীর একটা পুকুর এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত। তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত।··· মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।" [ঘর ও বাহির

একটি পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নের ছবি, প্রতিটি খুঁটিনাটি এতে উপস্থিত। এরপরই একটি সন্ধ্যাচিত্র পাই। অতি অল্প আয়োজনে ছবিটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

"সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে [ঈশ্বর ভৃত্য] রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত।······ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম।" [ভৃত্যরাজকতন্ত্র]

অতিক্রান্ত বাল্যের এই সান্ধ্যসভা অঙ্কনগুণে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

এর পরের ছবিটি বর্ষার। বর্ষাচিত্র জীবনস্মৃতিতে তথা রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার এসেছে। শৈশবের মেঘদূত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' তার কথা সূচনায় পাই। পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে ঠাকুর-পরিবারের এক অংশ কিছুদিনের জন্য ছিলেন, বাহিরের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। এই পরিচয়ের আনন্দ ছবিতে অনুস্যুত হয়ে আছে। ছবিটি আশ্চর্য-সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ:

"প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার ভাঁটার আসাযাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণ-শোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায়।" [বাহিরে যাত্রা]

জীবনস্মৃতির উল্লেখযোগ্য ছবির মিছিল এবার সুরু হলো। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বালকের মনে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করছে, তার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে পাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথ উত্তরভারত ভ্রমণে গেছিলেন। কোথায় কলকাতা, কোথায় গঙ্গা, আবার কোথায় দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়!

ডালহৌসিতে নবব্রতস্তের সমারোহ পেরিয়ে বক্রোটায় উপনীত রবীন্দ্রনাথ নির্জন দুপুরে পাহাড়ের তলদেশে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করে বেড়াতেন। এই ভ্রমণের একটি বিরল অভিজ্ঞতাচিত্র:

"বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের

শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।" [হিমালয়যাত্রা]

আমাদের মনশ্চক্ষে এই ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিমালয়ের উদার পরিবেশ. উদারতর নির্মল আকাশ, ঘনশীতল বনস্পতি-তলের ছায়া থেকে এবার আমরা কলকাতায় ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শৈশবের ছবি এঁকেছেন। এই ছবিও ছায়া-আলোকের সমাবেশে অঙ্কিত। কতো আন্তরিক ব্যাকুলতা এই ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর কৈফিয়ৎ দিয়েই তিনি ছবি এঁকেছেন :

"বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি; খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেই বারান্দা পার হইয়া গোটা চারপাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার, সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ীর দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে—এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তারপরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শংকরী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত, সে-কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত; দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকার রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্‌ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম; তারপর অর্ধরাত্রে কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতিবৃদ্ধ স্বরূপসর্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।" [প্রত্যাবর্তন]

ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে, পঞ্চাশ বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে যিনি পদার্পণ করেছেন, সংসারে কত অভিজ্ঞতার নদী পেরিয়ে চলেছেন, তিনি সেই অতিক্রান্ত

বাল্যের এই ছবিটিকে এত সত্য জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন কী করে! এই ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, খুঁটিনাটি সবই ঠিক ঠিক জায়গায় আছে; আলো-ছায়ার অতি নিপুণ ব্যবহার হয়েছে; লণ্ঠনের আলো ও জ্যোৎস্নার আলোয় কোথাও ছায়া, কোথাও বা অন্ধকার, আবার কোথাও ম্লান আলো। সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ ছবি।

তিন

এরপর পুনরায় পট পরিবর্তন হয়েছে। আমেদাবাদ ও বোম্বাই, তারপর বিলাতে —ব্রাইটন, লণ্ডন, ডেভনশায়ার। আমেদাবাদে সবরমতী নদীতীরে শাহিবাগে জজসাহেবের আবাসস্থল বাদশাহী আমলের প্রাসাদ পরবর্তীকালে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বোম্বাই বা বিলাতের প্রকৃতিদৃশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পায় নি, জীবনস্মৃতিতেও কোনো ভালো ছবি নেই। বরং দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ থেকে ফিরে আসার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসস্থল চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির ও সুন্দরী গঙ্গার ছবিটি উজ্জ্বল রঙে অঙ্কিত হয়েছে।

এই বাগানবাড়ি ও গঙ্গার ছবিটি পরিপূর্ণ আনন্দের ছবি। বর্ণভাণ্ড নিঃশেষ করে রবীন্দ্রনাথ এই ছবিতে রঙের 'পর রঙ চড়িয়েছেন। বর্ণনার বাহক যে গদ্যভাষা তাতেই এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে :

> "আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানটার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।" [গঙ্গাতীর]

এই স্বীকৃতি কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যকীর্তি বোঝবার পক্ষে খুবই সহায়ক। সহস্র ব্যাখ্যায় যা না হয়, এই আনন্দময় স্বীকৃতিতে তা হয়েছে। আমরা এক মুহূর্তেই প্রকৃতিপ্রেমী কবিস্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারি, রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম উৎসটি চিনে নিতে পারি।

*

কবির চোখে এই বর্ণসমৃদ্ধ উজ্জ্বল করুণ ছবিটি দেখি :

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ামযন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম, পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরেব বনবেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকঝিক্ করিতেছে।" [তদেব]

এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। গঙ্গা-তীরের এই পালা সন্ধ্যাসংগীতেব পালা, রবীন্দ্রকাব্য তখন স্বকীয়তা লাভের পথে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যাসংগীতের 'গান আরম্ভ'-এ গঙ্গাতীরের আকাশের ছবি পাই।

ঠিক এর পরেই প্রভাতসংগীতেব পালা। সেখানেও উদ্বোধনের লগ্নটি সন্ধ্যার—জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদে দিবাবসানের ম্লানিমার উপবে সূর্যাস্তেব আভা মিশে আসন্ন সন্ধ্যা মনোহর হয়ে উঠেছিল, পরিচিত জগতও মনোহব হয়ে উঠেছিল। তারপর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে এক প্রভাতে সূর্যোদয়ের লগ্নে কবিচিত্তে নবপ্রেরণার জাগরণ।

[দ্রঃ 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়]

চার

জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় প্রবেশ করলে একটা সত্য অনুভব করা যায় যে, পর্বত (কি ডালহৌসি, কি দার্জিলিং) বা সমুদ্র (কি ডেভনশায়ার, কি পুরী) রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশী অভিভূত করে নি, রবীন্দ্রকাব্যে এরা খুব বেশি ঠাঁই পায় নি। বিপরীতক্রমে, নদী (সাবরমতী, গঙ্গা, পদ্মা, কালানদী), সমতলভূমি (গাজিপুর, বোলপুর, পদ্মাচর) এবং সুনীল আকাশ কবিকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে গভীর রেখাপাত করেছে। সেইসঙ্গে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা কবিকে আকর্ষণ করেছে। ঋতুচক্রের

মধ্যে বর্ষাঋতু সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত। জীবনস্মৃতিতেও তাই—বর্ষাবর্ণনায় স্মৃতিবিহারী কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

জীবনস্মৃতিতে এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ছবিটি হলো কর্ণাটক ভূমির শৈলবেষ্টিত নিভৃত কারোয়ার বন্দরের ছবি। এই ছবিটিতে ছায়ান্ধকারেব নিপুণ বর্ণনা পাই, মনে হয় একজন সুদক্ষ ল্যাণ্ডস্কেপ-চিত্রী ছবি এঁকেছেন :

"প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য ; সেই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোট নৌকায় করিয়া আমরা কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজীর একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন, পাহাড এবং এই নির্জন সংকীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকেব জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল।...ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। .....

সমুদ্রের মোহনার কাছে আসিয়া পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতাব মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীববে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল।" [কারোয়ার]

সমস্ত ছবিটা অখণ্ড স্বপ্নেব মতো, লঘু তুলির স্পর্শে লঘুতব বর্ণপ্রলেপে এই স্তব্ধ শর্বরী আশ্চর্য ভাষারূপ লাভ করেছে।

এবার আমরা জীবনস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়েছি। আলেখ্যদর্শনের সূচনায় বর্ষা ঋতু, সমাপ্তিতেও তা-ই। বাল্যের দিনগুলিতে বর্ষার আধিপত্য। প্রথম যৌবনে শরতের রাজত্ব ('কড়ি ও কোমল'), তারপরই পুনর্বার বর্ষার প্রতাপ ('মানসী')। শ্রাবণের গভীর রাত্রির অবিশ্রান্ত ধারাপতনধ্বনি আর আশ্বিনের সোনা-গলানো রৌদ্রে স্নাত প্রভাতে যোগিয়া সুরের গুন্‌গুনানি : এই দুয়ে মিলে এক অখণ্ড জীবনসংগীত। সে সংগীতের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ।

বাল্যকালের বর্ষা ও প্রথম যৌবনের শরতের নিবিড়তা ও চাঞ্চল্য, গভীরতা ও জীবনান্দোলন, ব্যাকুলতা ও প্রফুল্লতা—সবটা মিলিয়ে এক জীবনসুরের প্রবর্তনা। এই সুরেই রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা হয়েছে। জীবনস্মৃতি সেই সুরের ধারক। তাই রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে এর মূল্য এত অধিক।

স্মৃতির ঘরে সন্ধান নিতে গিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচিত্ররাজি দেখে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়েছিলেন, ছবি দেখার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। জীবনের অর্ধপথ অতিক্রম করে এসে ছবি দেখার অবসর কবি পেয়েছিলেন। জীবনস্মৃতি সেই ক্ষণিক অবসরে আলেখ্যদর্শনের ফল। এই স্মৃতিচিত্রগুলি সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্য-রসোপভোগের পথে কবি পাঠককে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছেন। জীবনস্মৃতির এই চিত্রশালায় বাঙালি পাঠক মুগ্ধ নয়নে আলেখ্যদর্শন করে ধন্য হয়েছে।

১১

পঞ্চভূত ঃ রবীন্দ্র-দর্পণে সেকাল

এক

রবীন্দ্র-জীবনে ও -সাহিত্যে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, এই পাঁচটি বৎসর খুবই ফলপ্রসূ। এই সময় নগরবাসী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রাম-বাংলার অন্তরঙ্গ পরিচয় সাধিত হয়। সত্যকারের দেশ—বাংলা ও ভারতবর্ষ বলতে কাকে বুঝায়, তা ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি-তদারকি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন। পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গে কর্মোপলক্ষে ঘুরে বেড়াবার সময় চিনেছেন আপন দেশকে। আবার কলরবমুখরিত সভ্যতাগর্বী কলকাতা থেকে দূরে এসে যেমন নাগরিক জীবনের অসারতাকে জেনেছেন, তেমনি নিজের মুখোমুখি বসার সুযোগ পেয়েছেন। এই পর্বে রচিত হয়েছে সোনার তরী-চিত্রা চৈতালি, বিদায়-অভিশাপ, গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের গল্প। এই পর্বেই লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব-উন্মোচক পত্রগুচ্ছ, যা ছিন্নপত্রাবলী নামে ইদানীং পরিচিত। এই পর্বেই রচিত হয়েছে 'পঞ্চভূত'-এর প্রবন্ধগুলি, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৪)।

এ সময়ে মধ্যবঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক সঙ্গী ছিলেন নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় (তাঁকেই উৎসর্গ করেছেন পঞ্চভূত) এবং প্রিয়বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত (এসময়ে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চারিটি পত্র 'আলোচনা', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের প্রাণ', 'মানবপ্রকাশ' সংকলিত হয়েছে 'সাহিত্য' গ্রন্থে)। লোকেন্দ্রনাথ তখন রাজসাহীতে জেলাশাসক। কতোদিন তার বাংলো-বাড়িতে বসে দুই বন্ধু সাহিত্যালোচনা করেছেন। পঞ্চভূত গ্রন্থে জগদিন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু (শিলাইদহে কবির সাময়িক অতিথি) প্রমুখের ছায়া পড়েছে।

আমাদের কাল থেকে পঞ্চভূতের রচনাকাল আশি বছর পূর্ববর্তী। সেদিনকার দুনিয়া সম্পর্কে এক মননশীল পুরুষের নানা চিন্তার বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি পঞ্চভূত। রবীন্দ্রনাথ, জগদিন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ প্রমুখ মননশীল কৌতূহলী তরুণের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা চিন্তাভাবনা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছায়া পড়েছে 'পঞ্চভূত'-এর দর্পণে।

পঞ্চভূতের মানসিক পটভূমিরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরের য়ুরোপ, ভারতীয় জীবনে তার প্রবল প্রভাব ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া বিবেচ্য। কতো বিচিত্র বিষয়ের

আলোচনা হয়েছে পঞ্চভূতের আসরে। মানবজীবনে সংগীত ও সাহিত্য ('গদ্য ও পদ্য'), সমাজে ও সাহিত্যে নরনারীর আপেক্ষিক গুরুত্ব ('নরনারী', 'অখণ্ডতা'), মানবজীবনে কাব্যের আবেদন ('কাব্যের তাৎপর্য'), সুখদুঃখের মাত্রা ('কৌতুক হাস্য', 'কৌতুক-হাস্যের মাত্রা'), ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে সম্পর্ক ও সংঘর্ষ ('মন', 'পল্লিগ্রামে', 'ভদ্রতার আদর্শ, 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল', 'পরিচয়', 'মনুষ্য'), মৃত্যু ও মানবজীবন ('অপূর্ব রামায়ণ'), সৌন্দর্য-চিন্তা ('সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ', 'প্রাঞ্জলতা') শিক্ষিত মননশীল বঙ্গীয় পুরুষ ও ললনার মনকে কীভাবে আলোড়িত করে, তারই কৌতূহলোদ্দীপক বিচারণ ও বিশ্লেষণ পাই পঞ্চভূত গ্রন্থে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষিত বাঙালিজীবনে ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি আদব-কায়দার প্রভাব, পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনার প্রভাব, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-চিন্তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে। ডারুইন, গ্যারিবলডি, সেক্সপীয়র, ওআল্টার স্কট, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আলোচিত, পদ্মাতীরবর্তী গ্রামের সরল অন্তঃপ্রকৃতিবিশিষ্ট চাষীও তেমনি আলোচিত।

দুই

পঞ্চভূত গ্রন্থের পরিকল্পনা-বৈশিষ্ট্য আশি বছর পরেও তারিফ করার মতো। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অনাখ্যান গদ্যসাহিত্যে পঞ্চভূতের জুড়ি নেই, বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজো তার স্থান বিশিষ্ট। সন্দেহ নেই, এক অতিপরিশীলিত মননসমৃদ্ধ বিদগ্ধ মনের পরিচায়ক এই গ্রন্থ। আমাদের এই দুনিয়া গঠিত যে পাঁচটি উপাদানে, লেখক তাদেরকে পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রতি বিষয়ের আলোচনা পঞ্চজনের চরিত্রানুযায়ী তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আছে ষষ্ঠ চরিত্র ভূতনাথ যিনি আলোচনার রাশ টেনে ধরেছেন। লেখক নিপুণতার সঙ্গে ক্ষিতি, সমীর (বায়ু), ব্যোম – তিনটি পুরুষ-চরিত্র এবং স্রোতস্বিনী (অপ্) ও দীপ্তি (তেজ) —দুটি নারীচরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের আছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। তাদের তর্কপদ্ধতি, কথাবলার ভঙ্গি, মুদ্রাদোষ পাঠকের কাছে এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সংলাপ থেকে তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। প্রত্যেকের আছে সূক্ষ্ম ও স্থায়ী ভাব ও রুচি-বৈশিষ্ট্য। ক্ষিতি রক্ষণশীলতার অটল মূর্তি, নব নব মতবাদের একান্ত বিরোধী। ক্ষিতির বিপরীত চরিত্র ব্যোম—বাইরে অদ্ভুত বেশভূষায় সজ্জিত, অন্তরে নানা বাষ্পীয় কল্পনায় ও সূক্ষ্ম মনন-মৌলিকতার বায়ুবেগে সদা আন্দোলিত। তাকে নিয়ে বাকিরা ঠাট্টা করে, কিন্তু তা সে গায়ে মাখে না। সমীর এ দুজন পুরুষের তুলনায় হীনপ্রভ, তথাপি মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম বিচার ও মননের পরিচয় দিতে পারে।

তর্কসভার স্বনিযুক্ত সভাপতি ভূতনাথবাবু গম্ভীর চরিত্রের মানুষ, গ্রন্থের প্রবক্তা, আলোচনার বৃত্তান্ত-লেখক। কিছুটা আত্মগর্বী, তাঁর ধারণা তাঁর মতো পক্ষপাতহীন লোক কোথাও পাওয়া যাবে না। সব মতবাদের সমন্বয়ে একটা সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার অধিকার ও সামর্থ্য তাঁর আছে বলে ভূতনাথবাবু মনে করেন। পুরুষ-চরিত্রের তুলনায় স্ত্রী-চরিত্র দুটি উজ্জ্বল—স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পেয়েছেন। নারীসুলভ সলজ্জ শ্রী, আত্মপ্রচারে বিমুখতা ও ব্রীড়া, মতপ্রকাশে কুণ্ঠা স্রোতস্বিনীকে দিয়েছে এক বিরল মাধুর্য। লেখকের সহানুভূতি সবচেয়ে বেশি এঁর প্রতি, তা তিনি গোপন করেন নি। আর দীপ্তি প্রখর মননশীল, সতেজ মানস ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়ী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, মতপ্রকাশে কুণ্ঠাহীনা। পঞ্চভূত সভার পাঁচজন আর ভূতনাথবাবু—এই ছ'জন সদস্য লেখক-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভাব-রূপ। প্রাবন্ধিক নিবন্ধ 'পরিচয়' থেকে এঁদের ব্যক্তি-পরিচয়মূলক বিবরণ পাই। ক্ষিতি গুরুভার, স্রোতস্বিনী কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গিতে বারবার বলেন 'না না না', দীপ্তি নিষ্কাশিত অসিলতার মতো ঝিক্‌মিক্ করে ওঠেন, সমীর হেসে উড়িয়ে দেন সব আপত্তি আর লাঠিধারী ব্যোম কখনো চক্ষু মুদে গুড়গুড়ি টানেন ও আপন মত ব্যক্ত করেন, কখনো-বা বিশাল দুটি চোখ মেলে তাকান। স্বীকার্য, চরিত্রগুলি পরস্পর থেকে পৃথক হয়েও নিগূঢ়ভাবে সমধর্মী—লেখক-সত্তারই নানা প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, পঞ্চভূতের সভা যৌথ কথোপকথন সভা, পঞ্চভূতের ডায়েরি যৌথ ডায়েরি। এ গ্রন্থের বিন্যাসরীতি সমস্ত রচনাটিকে এমন একটি গঠন-পরিপাট্য, নাটকীয় গতিবেগ ও উত্তেজনামণ্ডিত করেছে যা বিরলদর্শন।

ছয়জনের বক্তব্য উপস্থাপনার বিশিষ্টতায়, আচরণে ও ভাবে-ভঙ্গিতে, উত্তেজনায় আঘাত-প্রতিঘাতে মৃদু গতিবেগ সঞ্চারে সমস্ত আলোচনাটি নাটকীয় উপাদানে ভরে উঠেছে, এবং দ্রুত এক নাটকীয় মুহূর্তের দিকে ছুটে চলেছে। লেখক সেই মুহূর্তটিকে এনেছেন দ্রুত-সাধিত উপসংহারে, ফুটিয়ে তুলেছেন একটি নাটকীয় রস, রূপায়িত করেছেন জীবন-প্রতিভাস।

পঞ্চভূত কী জাতীয় রচনা? বলতে হয়, ডায়েরি, কৌতুকনাট্য ও মননধর্মী প্রবন্ধের মিশ্রণে এক নোতুন গদ্যরচনা, যা স্বাদু ও উপভোগ্য।

পঞ্চভূতের ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য কী? লেখকের কথায়, জগদ্ধিতায় লোকহিতায় তা রচিত নয়। জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়োবার ভরসা নেই, এ কেবল বালির ঘর বাঁধা মাত্র। এই খেলাটা উপলক্ষ করে জ্ঞানসমুদ্রের খানিকটা নির্মল হাওয়া খাওয়াই উদ্দেশ্য। তাতে রত্ন সংগৃহীত হয় না, স্বাস্থ্য সঞ্চয় হতে পারে।

ভূতনাথবাবু সে-কথা স্পষ্ট করে বলেছেন—

"আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচভূতে মিলিয়া এ পর্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ, তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্তসঞ্চালন হইয়াছে এবং সেজন্য আনন্দ ও আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ; এখানে সত্যের শস্য-লাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে।" [কৌতুকহাস্যের মাত্রা]

ভূতনাথবাবুর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি পঞ্চভূতের সভা একটি কথোপকথন সভা। এ সভার প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। তাই প্রত্যেক কথার সব অংশকে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখা হয় না। তা করতে গেলে আটকা পড়ে যাবার বিপদ থাকে। বিচিত্র বিষয়-জমির উপর দ্রুতবেগে মানসিক কাদায় পায়চারি করাই পঞ্চভূতের বাসনা।

ডায়েরির মধ্যে যে-মানুষটাকে পাওয়া যায়, সে কতদূর সত্য? 'মনুষ্য' প্রবন্ধে স্রোতস্বিনী অনুযোগ করেছে তার মুখে কল্পিত কথা আরোপিত হয়েছে। অনুযোগের উত্তরে ভূতনাথবাবু জানিয়েছেন—কথাকে ব্যক্তিসত্তার আলোয় অনুরঞ্জিত না করলে তার মধ্যে বক্তার মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হতে পারে না। যে মানুষ চোখের সামনে আছে, সে তো প্রত্যক্ষ। যে মানুষ আছে ডায়েরির পাতায় সে অপ্রত্যক্ষ। এই অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে হয়। তাই অনেক উপায় অবলম্বন ও অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়। "আমি তোমাকে বেশী বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে। আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি। তোমার লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতের কেবলমাত্র সার-সংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে।" ডায়েরির তথ্যনিষ্ঠা, অতিরঞ্জন ও তথ্যনির্বাচন যে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের কল্পনা-নিগূঢ়তায় রূপান্তরিত হতে পারে, এই শিল্পসত্য এখানে স্বীকৃত।

তিন

পঞ্চভূত গ্রন্থের ষোলটি নিবন্ধকে আমরা বিষয়ানুযায়ী সাতটি ভাগে ভাগ করেছি। এই বিভাজনকে অনুসরণ করে সেকালের—উনবিংশ শতকের শেষ প্রহরের—জগৎ ও

জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিক পাদচারণার বিচিত্র বিবরণ সংগ্রহ করতে পারা যায়। পুনরায় স্মর্তব্য, পঞ্চভূত-এর পাত্রপাত্রীর উদ্দেশ্য সত্যসন্ধান নয়, ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে মনোলোকে গতিবেগ-সঞ্চার। এ গ্রন্থের মূল্য সত্যপ্রতিষ্ঠায় নয়; পরন্তু যে-কোনো একটি বিষয়ের নানাদিক থেকে পর্যবেক্ষণের মানস মুক্তিতে [দ্রষ্টব্য : 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা']।

এই মানস-পর্যবেক্ষণের পটভূমি সেকালের জগৎ ও জীবন। এর অব্যবহিত দৃশ্যপট মধ্যবঙ্গের পদ্মালালিত ভূখণ্ড, যেখানে গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি-তদারকিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এখানে ভুললে চলবে না, তাঁর আসল পেশা জমিদারি নয়, আসমানদারি। /

পঞ্চভূতের আলোচনা-আসরের অব্যবহিত দৃশ্যপট স্থানিক রঙে রঞ্জিত। যেমন,

১ বর্ষার নদী ছাপিয়া খেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোঠাবাড়ি এবং দুই-চারিটি টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটির, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধানো অশথ গাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে। [সৌন্দর্যের সম্বন্ধ]

২ আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিসের থানা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি নাই। রেলোয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে। যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, কোনো একটা প্রস্তরকঠিন পাকা বড়ো রাস্তার দ্বারা তাহার সহিত এই লোকালয়গুলির যোগস্থাপন হয় নাই। কেবল একটি ছোটো নদী আছে। যেন সে কেবল এই কয়খানি গ্রামেরই ঘরের ছেলেমেয়েদের নদী।......এখন ভাদ্র-মাসে চতুর্দিক জলমগ্ন—কেবল ধান্যক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্পই জাগিয়া আছে। বহু দূরে দূরে এক-একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চভূমিতে দ্বীপের মতো দেখা যাইতেছে।

[পল্লিগ্রামে]

৩. এই যে মধ্যাহ্নকালের নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি, টিক্‌টিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্ করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্‌মিচ্ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে, নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূর

তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়াদেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে—এই তো বেশ আছি। [মন]

৪. শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর-রস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপসা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। [কৌতুকহাস্য]

নীল আকাশ, প্রসন্ন রৌদ্রালোক ও বর্ষা শরৎ শীতের সুখদ পরিবেশে রচিত হয়েছে পঞ্চভূত।

চার

পঞ্চভূত গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সমূহের বৈচিত্র্য ও বিস্তার অর্ধমনস্ক পাঠকেরও চোখে পড়ে। ছ'জনে মিলে যে-কোনো একটি বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে ওঠেন। প্রারম্ভিক নিবন্ধের পরেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগীত ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ('গদ্য ও পদ্য')।

পঞ্চভূতসভার সভাপতি ভূতনাথবাবুর ভাবুকতার এক আকস্মিক উচ্ছ্বাসে ক্ষিতি হেসে উঠেছে। ক্ষিতির ঠাট্টা ও প্রতিবাদের খোঁচায় ভূতনাথের উচ্ছ্বাসের বেলুন চুপসে গেছে। পদ্যের মাধ্যমে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, তা থেকেই গদ্য ও পদ্যের তুলনামূলক বিচারের কথা উঠেছে। গদ্য ও পদ্যে বিচ্ছেদ কতোটা, পদ্য গদ্য অপেক্ষা কতোটা কৃত্রিম, পদ্য ও গদ্যের নিজস্ব ভূমিকা কোথায়—এ নিয়ে পঞ্চজন ও ভূতনাথবাবুর মধ্যে তর্ক জমে উঠেছে।

তর্কের মূল কথাটি উত্থাপন করেছেন ক্ষিতি—ভাবপ্রকাশের জন্য পদ্যের কোনো আবশ্যক আছে কিনা। ক্ষিতির আসল আপত্তি পদ্যের বিরুদ্ধে নয়, কাব্যোচ্ছ্বাসময় গদ্যের বিরুদ্ধে। অপরপক্ষে তত্ত্বপ্রিয় "ব্যোমের আপত্তি গদ্যের অদ্বৈতবাদের স্থলে গদ্য-পদ্যের দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় এবং পদ্যের কৃত্রিম অলংকরণরীতির প্রভাবে ভাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিলোপে ও লোকচিত্তে ছন্দোপ্রীতির প্রতি বদ্ধমূল সংস্কারে।"

[শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, ১২শ অধ্যায়]

তর্কসভায় তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ব্যোমের কাব্যালঙ্কারের বিরুদ্ধে আনীত কৃত্রিমতার অভিযোগে। পাঁচজনে পাঁচরকম মত দিয়েছেন। দীপ্তি কাব্যছন্দকে প্রাকৃতিক নির্বাচনে উদ্ভূত ও সমস্ত সভ্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত সৌন্দর্যবোধের উন্মেষরূপে সমর্থন জানিয়েছে। সমীর জানিয়েছে, কৃত্রিমতাই মানুষের প্রধান গৌরব; প্রকৃতির

স্বতঃস্ফূর্ত লাবণ্য অপেক্ষা অনুশীলিত প্রসাধনকলাই শ্রেষ্ঠ তা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। স্রোতস্বিনী মানবমনে সুকুমার ভাবসঞ্চার ও সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি উন্মেষের অন্তরালে যে শিল্প-কৌশল সক্রিয়, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দার্শনিক ব্যোম এই সুযোগে তত্ত্ব প্রচার করেছে যে, সমগ্র বিশ্বসংসার কৃত্রিম মায়া-রচনা। ক্ষিতি মহা বিরক্ত হয়ে জানিয়েছে, ছন্দঃপ্রিয়তা আসলে মানুষের অপরিণত শৈশবের অর্থহীন ছড়াপ্রিয়তার সমপর্যায়ী; আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চায়, ভাব চায়; আমাদের অপরিণত বালক-অংশ ধ্বনি চায়, ছন্দ চায়।

এই তর্কের ধূলিজাল পেরিয়ে সভাপতি ভূতনাথবাবু ছন্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আকাশবিহারী। তাঁর মতে, মানুষের অন্তর-উত্থিত প্রতিটি ভাবতরঙ্গ প্রকৃতি রাজ্যের অন্যান্য কম্পমান তরঙ্গের সঙ্গে মিলন-প্রয়াসী; সে-কারণে সঙ্গীতের প্রভাব মানুষের ভাবোদ্দীপনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী; সাহিত্য যেহেতু অর্থের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু মননাপেক্ষী; তাই তার প্রভাব গৌণ। সাহিত্যে অর্থ যখন সঙ্গীতের কম্পনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা মানবহৃদয়ের ভাবতরঙ্গ জাগিয়ে তোলে। এই বিশ্বপ্রবাহিত ধ্বনিতরঙ্গ ছন্দের আসল প্রেরণা।

ভূতনাথের এই ব্যাখ্যা—সৌন্দর্য-উদ্বোধনের অপরিহার্য উপায়রূপে বিশ্বসঙ্গীতের অনুরণনের উচ্চতম কলাসম্মত প্রয়োগ—তর্কসভার সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। যদিও স্রোতস্বিনী এই উচ্চমার্গের ব্যাখ্যার পরিশেষরূপে নাট্যকলার সংশ্লেষমূলক আবেদন-শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে আলোচনাকে ভূমিস্পর্শ করিয়েছে তথাপি ভূতনাথের এই আলোচনা ডায়েরির আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় নি।

'গদ্য ও পদ্য' নিবন্ধে ডায়েরির চরিত্র শেষ পর্যন্ত রক্ষিত না হওয়ার কারণ তা একেবারে প্রথম দিকের রচনা। এর পর আলোচনা-আসরের ঘরোয়া পরিবেশ রচনা ও রক্ষায় লেখক অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'গদ্য ও পদ্য' ছিল নিঃসঙ্গ নিবন্ধ। এমন নিঃসঙ্গ নিবন্ধ আরো দুটি আছে—'অপূর্ব রামায়ণ' (মৃত্যু ও মানবজীবন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা) এবং 'কাব্যের তাৎপর্য' (কাব্যের আবেদনের প্রকৃতি বিচার)। বাকি সব নিবন্ধ এসেছে দল বেঁধে। তাদের সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাকি নিঃসঙ্গ নিবন্ধ দুটির আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

'কাব্যের তাৎপর্য' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কৌশলে তাঁর নিজের কাব্যরচনা 'কচ ও দেবযানী'র সমালোচনা করিয়েছেন তাঁরই সত্তার অংশ পঞ্চভূত-সদস্যদের দিয়ে। তর্কসভার পরিবেশটি এখনো পুরোপুরি বজায় আছে। পাঁচমিশেলী বিতর্ক, বহুব্যাপ্ত কূট তর্ক, দ্রুত উক্তি-প্রত্যুক্তি-বিনিময়, ঘরোয়া পরিবেশ, খোলাখুলি মন্তব্য, পারস্পরিক আক্রমণ—সব মিলিয়ে জমাটি পরিবেশ।

তর্কটা উঠেছে দীপ্তির ভূতনাথবাবুর লেখা 'কচ-দেবযানী সংবাদ'এর তাৎপর্য-হীনতার প্রকাশ্য ঘোষণায়। ক্ষিতি জানিয়েছেন কবিতাটি পড়েন নি। তখন দার্শনিক ব্যোম কবিতাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে, দেহ দেবযানী ও আত্মা কচ; দেহ-আত্মার আদি প্রেম স্থূল জড়বাদের উপর আনন্দের প্রথম বিজয়-ঘোষণা। এই বিজয় ঘটে কীভাবে? দেহবীণায় ধ্বনিত মধুর সঙ্গীত আত্মাকে মুগ্ধ করে; তখন দেহের রহস্য জানার জন্য আত্মা নানা উপচারে দেহের অর্ঘ্য রচনা করে। দেহও শতপাকে আত্মাকে জড়িয়ে ধরে। অবশেষে একদিন এই অসম প্রণয়লীলার অবসানে দেহের সমস্ত মধুর অনুযোগ উপেক্ষা করে আত্মা ফিরে যায় আপন নিঃসঙ্গ স্বর্গলোকে।

ব্যোমের এই দার্শনিক ব্যাখ্যাকে ক্ষিতি খারিজ করে দিয়েছেন। সমীর এই মতবাদকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে এর যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উত্তরে ব্যোম বলেছেন, প্রতি দার্শনিক মতবাদের সারবত্তা নির্ভরশীল তার জীবনানুকূল্যের উপরে।

ক্ষিতি তা মানতে চাননি। তাঁর মতে, কচ ও দেবযানীর ক্ষণিক মিলন আসলে অভিব্যক্তিবাদের রূপক। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের কাব্যরূপ এই কবিতা। "সঞ্জীবনা বিদ্যা এক প্রাণিবংশকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলিত হইতে হইতে উহাকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংসকবলিত হইতে দিয়া আর একটি উচ্চতর জীবন-শাখায় সংলগ্ন হয় এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমিক ত্যাগ ও আশ্রয়-পরম্পরার মধ্য দিয়া চরম পরিণতিতে পৌছায়।" [তদেব]

কাঠকে পুড়িয়ে অগ্নির বিদায়গ্রহণ, গুটি কেটে ফেলে দিয়ে প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিদীর্ণ করে ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরের উদ্‌গম: এইসব ঘটনা পুঞ্জীভূত করে দীপ্তি ক্ষিতির মতের অসারতা দেখালেন। অপরপক্ষে ব্যোম ভালবাসা ও ভালবাসার বন্ধনছেদনকে মানুষের দুই পায়ের গতিছন্দের মাধ্যমে অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করে ঐ নীতির সার্বভৌমতা প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। সমীর এসব বাদ দিয়ে বিদায়-অভিশাপের তাৎপর্য বুঝাতে নোতুন রূপকের আশ্রয় নিলেন। কচের প্রতি দেবযানীর অভিশাপ: কচ বিদ্যা অপরকে শিখাতে পারবে, নিজে প্রয়োগ করতে পারবে না,—এর তাৎপর্য, নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে যে বিদ্যা আয়ত্ত হয় সেই নির্লিপ্ততার পরিবেশে তার সার্থক প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এসব কূটতর্কের শেষে স্রোতস্বিনী মত দিলেন যে, "কাব্যের যথার্থ আবেদন মনীষী-পাঠকের আরোপিত তত্ত্বনির্ভর নয়, সর্বজনসাধারণ হৃদয়াবেগের রমণীয় অনুভবে।" [তদেব]। সুতরাং কচ-দেবযানীর কাব্যসৌন্দর্য ওই সার্বজনীন ভাবমাধুর্যের বিকিরণ-প্রসূত।

সভাপতি ভূতনাথবাবু স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করে আলোচনার উপসংহার টেনে বলেছেন, "কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভ-ফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে।" রুচিবৈচিত্র্য ও সঙ্গতি-সুষমা অনুযায়ী সকল প্রকার তত্ত্বব্যাখ্যাই গ্রহণের পক্ষে কোনো বাধা নেই। উদার সমন্বয়ধর্মী মনোভাব কাব্যচর্চার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল, ভূতনাথবাবুর (তথা লেখকের) এই সিদ্ধান্তে আলোচনার সমাপ্তি।

'অপূর্ব রামায়ণ' নিবন্ধে অব্যবহিত উপলক্ষ ভূতনাথবাবুর বাড়িতে শুভকার্যে মূলতান বারোয়াঁ রাগিনীতে নহবত বাজনা। ব্যোম, সমীব ক্ষিতি তা শুনতে শুনতে মৃত্যু ও মানবজীবনের সম্পর্ক পুনর্বিচার করেছে। ব্যোমের মতে, ভারতীয় সঙ্গীত-রাগিনীর মর্মবাণী যেন একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের সুরময় প্রকাশ। এতে মৃত্যুর অসহনীয় গুরুভার যেন আশ্চর্য কুহকবলে লঘু ও রমণীয় হয়ে উঠেছে। তত্ত্ববাদী ব্যোম এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে বলেছেন, "জগৎ রচনাকাব্যে মৃত্যুই একমাত্র স্থায়ী রস। মৃত্যুই জীবনের ভয়াবহ অবিচলত্বের মধ্যে গতিচ্ছন্দ সঞ্চার করিয়া একটি জীবনাশ্রয়ী অসীমের ভূমিকা রচনা করিয়াছে।"

সমীর, ব্যোমের এই বক্তব্যে বাধা না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য যোগ করেছেন। মৃত্যু না থাকলে জীবনের মর্যাদা থাকত না। ক্ষিতি তখন বলেছেন—মৃত্যুহীন অমরজীবনের অনন্ত অবসরে কর্মবিরতির কোনো প্রেরণা থাকত না, এবং তা-ই মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা ভীতিদায়ক ও বিরক্তিকর হয়ে উঠত।

মৃত্যুর দার্শনিক মননে আবিষ্ট ব্যোম বন্ধুদের কথায় কর্ণপাত না করেই বলেছেন, আমাদের সমস্ত প্রিয়তম আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা-কামনার শেষ আশ্রয় মৃত্যুর কল্পতরুতলে।

সমীর একটি মৌলিক চিন্তা উপস্থিত করেছেন; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গীতের একটি নব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। সঙ্গীতের সকরুণ মূর্ছনা শুধু যে মৃত্যুশোককে লঘু ও সান্ত্বনা-মধুর করছে তা নয়, জীবনের অনধিগত ও মৃত্যুর পরপারে নির্বাসিত প্রিয় বস্তুগুলিকে আবার ফিরিয়ে এনে ইহলোকে প্রতিষ্ঠা করছে।

তখন নহবতে সন্ধ্যালগ্নে পূরবী বাজছিল। ক্ষিতি রামায়ণের নোতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনায় ছেদ টেনেছেন। "রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা নির্বাসন বৈরাগ্যধর্মের ষড়যন্ত্র—অনিত্যসংসর্গদুষ্ট প্রেমের মৃত্যু-তমসাতীরে প্রেরণ। কিন্তু লবকুশের দ্বারা হৃদয়দ্রবকারী

সীতামাহাত্ম্যগান কাব্যমধুরতার মাধ্যমে ইহজীবনে প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বৈরাগ্য ও কাব্যের প্রেম লইয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংগ্রাম এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান।" [তদেব]

পাঁচ

সমাজ, সাহিত্য ও সৌন্দর্য-প্রসঙ্গে পঞ্চভূত-এর অন্যান্য নিবন্ধগুলি জোট বেঁধে এসেছে। চারটি জোটে বিভক্ত নিবন্ধগুলিকে জোট ধরে বিচার করা যায়।

সমাজে ও সাহিত্যে নরনারীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে দুটি মনোজ্ঞ আলোচনা পাই : 'নবনারী', 'অখণ্ডতা'।

প্রথম নিবন্ধের সূচনার আকস্মিকতা ও প্রস্তাবের নূতনত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা সাহিত্যে পুরুষের সঙ্গে তুলনায় নারীব প্রাধান্য কেন, এই প্রশ্নে তর্কের সূচনা। প্রশ্নের উত্থাপক সমীর। উত্তরদাতা ক্ষিতি। ক্ষিতির উত্তরের প্রতিবাদ করেছেন দীপ্তি। আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ব্যোম, স্রোতস্বিনী ও ভূতনাথবাবু।

তর্কসভার উপযোগী পরিবেশে নিষ্পন্ন এই বিতর্ক কেবল তাপ ও ধূম্র সৃষ্টি করেনি, আলোও ছড়িয়েছে। আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের নানা অন্ধকার অঞ্চল আলোকিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রাধান্যের কারণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ক্ষিতি বলেছেন, মানস-প্রধান উপন্যাসে নারীর প্রাধান্য, আব কার্যপ্রধান উপন্যাসে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা। কেননা কর্মে পুরুষ ও হৃদয়ানুভূতিতে নারী প্রকৃতিসুলভ গুণেই অগ্রবর্তী।

দীপ্তি ও সমীর এই সাধারণীকরণকে অযথার্থ প্রতিপাদন করেছেন। কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখীর কাছে নগেন্দ্র ম্লান, রোহিণী ও ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, কপালকুণ্ডলার পাশে নবকুমার নিষ্প্রভ। সমীরেব এই উদাহরণমালা ও ক্ষিতির বক্তব্যের বিরুদ্ধে দীপ্তি দেখিয়েছেন, বিমলা, শান্তি, প্রফুল্ল কার্যপ্রধান উপন্যাসেও শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে। আর সমীর বলেছেন, মনুষ্যচরিত্র শতরঞ্চ-ফলকের মতো নির্জীব ও সরল নয়, তা জটিল ও সচল। ওথেলো মানসপ্রধান নাটকের চরিত্র হয়েও প্রাধান্য পেয়েছে। অতএব ক্ষিতির বক্তব্য খারিজ। এভাবেই জমে উঠেছে তর্ক।

দার্শনিক ব্যোম দুটি চমকপ্রদ উক্তি করেছেন। এক : পুরুষ জন্ম-উদাসীন, দার্শনিক, নিঃসঙ্গচিন্তানিমগ্ন। নারীই প্রকৃতপক্ষে কর্মনিয়ন্ত্রী। দুই : নারীর অন্তঃপুর-নিবদ্ধ কর্মসীমা তার বহু যুগের কার্যাবশেষের গণ্ডী-রচিত। তার প্রাণশিখাকে

যদি অভ্যাসের অবরোধমুক্ত করা যায় তবে তার স্বাভাবিক একনিষ্ঠ কর্মপ্রতিভা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

সভাপতি ভূতনাথবাবু নারীস্তুতি করে আলোচনার মোড় ঘুরিয়েছেন—বাঙালি রমণী বাঙালি পুরুষ অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, কেননা রমণীর যে নির্দিষ্ট কার্য সমাজের মনোরঞ্জন, তা প্রশংসা করে তাকে খোস মেজাজে রাখলেই সুসম্পন্ন হতে পারে। ক্ষিতি এ কথার প্রতিবাদে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, রমণীর সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্রে আশু ফলপ্রাপ্তি-ই প্রার্থনীয়, কেননা জীবনের সঙ্গে কারবারে নগদ বিদায় তার যোগ্য প্রাপ্য।

"স্রোতস্বিনী এই রূঢ় ভাষণের চমৎকার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি মহৎ ও বৃহতের একার্থবাচকতা অস্বীকার করে স্ত্রীলোকের প্রতিদিনকার ছোট্টখাট সংসারকার্যে যে গৃহলক্ষ্মীর উন্নততম আদর্শ রক্ষা করা যায় তাহা কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, অথচ সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"সভাপতি আবার কবিত্বমণ্ডিত উপমাসাহায্যে তাঁহার পূর্বোল্লিখিত স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতাব কথার পুনবাবৃত্তি করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে সমীর এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া কলঙ্কিত পুরুষের নির্লজ্জ নারীপূজাগ্রহণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও দীপ্তিও তাহারই সুরে সুর মিলাইয়াছেন। স্রোতস্বিনী কিন্তু নারীসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত ব্যাপারটির অশোভনতা উপলব্ধি করিয়া স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কটি পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন।" [তদেব]

আমাদের অজানা নেই, লেখকেব পক্ষপাতিত্ব স্রোতস্বিনীর প্রতি। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রেই স্রোতস্বিনীর বক্তব্য সমতাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাই— "তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপসের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কী। তা ছাড়া, আমাদের তো সকল গুণ নাই—হৃদয়-মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।"

এই সমতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের পরেও সভাপতি ভূতনাথবাবু বঙ্গদেশে পুরুষের অকর্মণ্যতা ও বৃহৎ কর্তব্যক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত ক্ষুদ্রতার সঙ্গে নারীর প্রেমবিকশিত, কর্তব্যে স্থির, সহজসুষমামণ্ডিত জীবনের তুলনা করে নারী-মহিমাকে কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্তভাবে রঙ চড়িয়ে উপস্থিত করেছেন। সভাপতি পক্ষপাতহীন দায়িত্ব পালন করেন নি। সে দায়িত্ব পালন করেছেন ক্ষিতি। অপ্রমত্ত বাস্তববুদ্ধির অধিকারী ক্ষিতি আলোচনার রাশ টেনে নরনারীর আপেক্ষিক গুরুত্বের যথার্থ মানদণ্ড তুলে ধরেছেন। "পুরুষের বৃহৎ ও জটিল কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত দুরূহ ও প্রমাদকীর্ণ। পক্ষান্তরে

নারীর সঙ্কীর্ণ কর্মপরিধিতে কৃতিত্ব অনায়াসলভ্য ও অশিক্ষিত পটুত্বের দ্বারা অধিগম্য। পুরুষের ত্যাগ প্রকৃতির বিরুদ্ধে; নারীর ত্যাগ নিজ হৃদয়ধর্মের অনুসরণে। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের অতিস্তুতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তবে তাহা তাহার আত্মজ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। নারীকে সর্বত্র আদর্শ গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রচার করা তাহার বাস্তব ভূমিকার অস্বীকৃতি মাত্র।" [তদেব]

মনের স্বরূপ নির্ণয় উপলক্ষে নরনারীর তুলনা দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়েছে 'অখণ্ডতা' নিবন্ধে। প্রকৃতির স্তব থেকে এসেছে নারীর স্তব; মানুষের জীবনে পদে পদে মনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; সেই সূত্রে এসেছে নারীর জীবনে মনের প্রভাবের কথা। নারী, প্রকৃতির মতো, মনের দ্বিধা-সংশয় থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। তার মধ্যে যুক্তিতর্কাতীত এক সহজ সংস্কার ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল। সেইজন্য তার আচরণে বৈপরীত্যের চরম সীমা দেখা যায়। নারীর মধ্যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সচেতন ক্রিয়াশীল বৃত্তির আপেক্ষিক অভাব। এদের স্থান পূরণ করে প্রতিভার সমধর্মী, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্য-বিধায়ক, একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য-গঠনশক্তি।

সমীরের এই পঠিত বক্তব্য মেনে নিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করেছে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী, কারণ এর মধ্যে নারীর অপকর্ষের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত আছে। তারা দুজনে নম্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। মেয়েদের আত্মা নেই, মন বুদ্ধির আপেক্ষিক অভাব আছে,—এসব কথা মেনে নেওয়া কঠিন। সমীরকে থামানো আরো কঠিন, তিনি তাঁর বক্তব্য বিশদ করবার জন্য আরো কিছু পড়তে থাকেন। তা পূর্ব বক্তব্যের বিস্তার। সমীর যখন পড়েন যে, পুরুষ পরিবর্তনস্রোতে অস্থির, নারী যুগযুগান্তরের প্রথানুসরণে অনায়াস-সুন্দরী ও সম্পূর্ণ বৃত্তের ন্যায় সুষমাময়ী; এক সহজ আকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে সে নিজের চারিদিকে একটি সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত ঐক্য রচনা করছে, তখন ব্যোম হঠাৎ তর্কমধ্যে প্রবেশ করেছেন, তার দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

'তুমি যাকে ঐক্য বলিতেছ, আমি তাহাকে আত্মা বলি'—ব্যোম একথা বলে বোঝাতে থাকেন, তা-ই মন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রীশক্তি। সংসারের শ্রী রচনায় রমণীর এই যে নিগূঢ়, অভ্রান্ত আত্মিক শক্তি, তা সৃষ্টিজগতে কাব্যপ্রতিভা ও অধ্যাত্মজগতে যোগসাধনার সঙ্গে তুলনীয়। নারীর অশিক্ষিত-পটুত্বের পিছনে ক্রিয়াশীল এক রহস্যময় অতীন্দ্রিয় শক্তি। 'প্রকৃতির যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব।' এখানেই সমীরের মুখ বন্ধ ও আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে।

ছয়

ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে সম্পর্ক ও সংঘর্ষ পাঞ্চভৌতিক সভায় বহুব্যাপ্ত বিস্তারিত আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। অন্তত ছয়টি নিবন্ধ এই সূত্রে আবদ্ধ—'মন', 'পল্লিগ্রামে', 'ভদ্রতার আদর্শ', 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল', 'পরিচয়', 'মনুষ্য'।

গ্রন্থের প্রারম্ভিক নিবন্ধ 'পরিচয়'-এ মানবজীবনে আবশ্যক ও অনাবশ্যকের আপেক্ষিক স্থান-নির্ণয়ে সদস্যদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাঁদেব মতামতও ভিন্ন। ক্ষিতির মতে অনাবশ্যকের সম্পূর্ণ বর্জন ও আবশ্যকের বোঝা বাড়ানো-ই অগ্রগতির অপরিহার্য লক্ষণ। অপরদিকে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী অনাবশ্যকের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা আছে। সংসাবজীবনে নারীর কর্তব্যের সুষ্ঠু পালন ও তাব সুখশান্তিবিধানের জন্য সুকুমার গুণের যথাযথ অনুশীলনে দীপ্তি বিশ্বাসী। নিজ কমনীয় বৃত্তি স্ফুরণের জন্য ও আত্মতৃপ্তির সূক্ষ্মতব প্রেরণায় অনাবশ্যক ও অতিরিক্তের চর্চায় স্রোতস্বিনীর আস্থা। সমীর ও ব্যোম ক্ষিতির অভিমতকে খারিজ কবে দিযেছেন। লোক-ব্যবহারকে রমণীয় করবার জন্য, মানুষে মানুষে সম্বন্ধকে মধুব করবার জন্য জীবনে অলংকরণের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলে সমীর বিশ্বাস করেন। ব্যোম ক্ষিতির সম্পূর্ণ বিপরীত-পন্থী। ব্যোমের মতে আবশ্যকের—জৈব প্রয়োজনের সম্পূর্ণ বর্জন ও জীবনে অনাবশ্যকের আমন্ত্রণ জানানোই মানবজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অবিমিশ্র বস্তুবাদের সমর্থক ক্ষিতি আর ভাবলোকবিহারী ব্যোম। মাঝে আছে বাকি তিনজন। প্রত্যেকের চিন্তাতেই আছে নিজস্বতার ছাপ। সভাপতি ভূতনাথবাবু একটা সমন্বয়সাধনের প্রয়াস কবেছেন বটে, কিন্তু তা সফল হয় নি। না হোক। আমবা জানি, এই গ্রন্থের বিভিন্ন বিতর্কের লক্ষ্য সত্যপ্রতিষ্ঠা নয়। একটা বিষয়ের নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণের মানসমুক্তিতে এর সার্থকতা। তা এখানে লভ্য। মানবজীবনে বস্তু-প্রয়োজন ও জৈব-তাগিদের উপরে যে অতিরিক্তের সঞ্চয়, সেখানেই জীবনের মুক্তি : একথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন; এখানে কিন্তু পক্ষাবলম্বন করেন নি।

'মনুষ্য' নিবন্ধে কথার পৃষ্ঠে কথা এসেছে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেছে তর্ক। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে নি, আলোচনা বারবার বাঁক ফিরে চলে গেছে অন্য পথে। ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়েরিতে স্রোতস্বিনীর মুখে যে-সব কথা দিয়েছেন, স্রোতস্বিনী তার বাগভঙ্গির সম্বন্ধে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েছেন। লেখক তার উত্তরে জানিয়েছেন, ফলপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে কথাগুলির উপর কিছুটা

প্রসাধন করতে হয় ব্যক্তিত্বের বিকল্প হিসেবে। ব্যক্তিরহস্যের সবটুকু প্রকাশ করতে কে পারে? এ' কথা নিয়ে ক্ষিতি ও ভূতনাথে তর্ক বেধে গেছে। তর্কে যোগ দিয়ে সমীর আলোচনাকে অন্য পথে নিয়ে গেছে। ডায়েরিতে যে-সব ভাল ভাল উক্তি সন্নিবিষ্ট সেগুলি যেন ব্যক্তিসত্তানিঃসম্পর্ক অবয়বহীন তত্ত্বকথার স্বাদহীন সারাংশ। সমীর তা চান না। আপন ভুলভ্রান্তি, পরিবর্তনশীল মতবাদ ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েই বেঁচে থাকতে চান। এতক্ষণে তর্কে যোগ দিয়েছেন ব্যোম। তাঁর মতে, তর্কের শেষ পরিণতি চূড়ান্ত মীমাংসায়। অপরদিকে মানুষের পরিচয় গতিশীলতায, নবনব পবিবর্তনে ও নবনব রূপায়ণে। তাই তর্কেব সমাপ্তিব সঙ্গে মানুষের পবিণতিকে একসূত্রে গাঁথা ভুল। এ কথা থেকেই তর্ক চলে যায় অন্য পথে। মানুষেব কথাব মধ্যে চাই গতিব উদ্যত ভঙ্গি। তাই মানব-বচিত সাহিত্যে বক্তব্য-বিষয় অপেক্ষা বলার ভঙ্গিটি অধিকতব গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে এসে আলোচনা বাঁক নিয়েছে। বিষয় বড়, না, বলাব ভঙ্গি বড—এ নিয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছে সকলে। ব্যোমের মতে, বিষযটা দেহ, ভঙ্গি হ'ল নব নব রূপে প্রকাশমান জীবন। দীপ্তি একথাকে বিস্তার কবে বলেছেন, ভঙ্গি যেন একটি দর্পণ যাতে প্রতিবিম্বিত হয় মন ও চবিত্রের বিশেষ আকৃতি, তা-ই হল স্টাইল। এবং অনেক লেখকেরই নিজস্ব স্টাইল নেই, কাবণ তারা স্বয়ংপ্রভ হীরে নয়, মাটিব ঢেলা। দীপ্তিব এ'কথা নির্বিবাদে মেনে না নিয়ে সমীর বলেছেন, সব মানুষেরই নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্য আছে, তা আবিষ্কাবেব অপেক্ষা বাখে।

এ'কথায় ভূতনাথ স্বীকার কবলেন তাঁর এক বিদেশী ঠিকা মুহুরি ছিল—যার অস্তিত্বও তিনি অবগত ছিলেন না। যে-রাতে ওলাওঠায় আক্রান্ত সেই বিদেশি মুহুরি 'পিসিমা' 'পিসিমা' করে কাতর আর্তনাদ করছিল তখন তার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিল। স্রোতস্বিনী জানালেন, তাঁদেব হিন্দুস্থানি বেহাবা নিহরকে আগে ভাল কবে নজর করেন নি, এখন সদ্যস্ত্রীবিয়োগকাতর দুটি শিশুসন্তান নিয়ে বিব্রত নিহরকে দেখে তাঁর মনে হয় সে শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়া। ভূতনাথবাবু বিদেশি ঠিকা মুহুরিকে ও স্রোতস্বিনী নিহর বেহাবাকে— ভালোবাসায় দীপ্যমান দুটি মানুষকে—আবিষ্কাব করেছেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেছে প্রেমালোকে দীপ্যমান মানুষকে। অবজ্ঞাত একজনের ব্যথা যখন আব সকলের ব্যথা হয়ে ওঠে, তখন অবজ্ঞাত হয়ে ওঠে আমাদেরই একজন। 'অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে এবং ভালোবাসার যোগ্য'—স্রোতস্বিনীর এই সিদ্ধান্তে ক্ষিতি ও সমীর সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, একালের সাহিত্যসূর্য পর্বতচূড়া ছেড়ে সমতলের গরীব কুটিরেও আলো ফেলে তাদের প্রকাশ করে তুলেছে।

ব্যক্তিমানুষের প্রতি পাঞ্চভৌতিক সভার এই আগ্রহ ও কৌতূহল 'মন' নিবন্ধেও সঞ্চারিত। এখানে তর্কসভার পরিবেশ নেই, চিন্তার সাধর্ম্য আছে। পরিচারক নারায়ণ সিংকে দেখে লেখকের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছে, তা এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত, উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্তপল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো নারায়ণ সিংকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে, এইরূপ মানুষ বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। মন নামক পদার্থ মানুষের অন্তর্জগতে যে জটিল বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারই সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির প্রশান্ত মনোহীন, সহজ প্রেরণাজাত আত্মবিকাশের পার্থক্য লেখক দেখিয়েছেন। নারায়ণ সিং-এর জীবনে মনের অত্যাচার নেই, কারণ অনতিসভ্য নারায়ণ সিং-এর মনটি তাহার শরীরের মাপে তার আবশ্যকের গায়ে ঠিক ঠিক ফিট করে লেগে গেছে। সভ্যজগতে মনের উৎপাত কতটা, তা লেখক এখানে দেখিয়েছেন। গাছের যদি মন থাকত, বসন্তবায়ু যদি উদ্দেশ্যচালিত হ'ত, তাহলে প্রকৃতিরাজ্যের সহজ সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর উপর চিন্তাজালের জীর্ণ বলিরেখা কুঞ্চন বিস্তার করত। মনের অতিপ্রসার মানুষের সামঞ্জস্যকে নষ্ট করেছে, মনের রাক্ষুসী ক্ষুধা মিটাতে গিয়ে মানুষের প্রবৃত্তিগুলি বিকৃত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

'পল্লিগ্রামে' নিবন্ধটি 'মন' নিবন্ধের ঢঙে ও একই সুরে রচিত। তৈলচিক্কণ সুপুষ্ট উদ্বেগমুক্ত নারায়ণ সিং-এর সঙ্গে লেখকের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত সভ্যসমাজ থেকে দূরবর্তী এক শান্ত নিভৃত পল্লিগ্রামের সরল মূঢ় চাষীদের একটা মিল আছে বলে উপলব্ধি করেছেন। "এই মূঢ় চাষাদের সুষমাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি সৌন্দর্য অনুভব করি যাহা রমণীর সৌন্দর্যের মতো।" এ সৌন্দর্য কিসের? লেখক-মনে তার একটা উত্তর উদয় হয়েছে। স্থির সংস্কারের প্রশান্ত প্রভাব বহিঃপ্রকৃতি থেকে গ্রামবাসী মানুষের জীবনযাত্রায় কেমনভাবে সংক্রামিত হয় তা লেখক দেখিয়েছেন। "পল্লীবাসীর প্রকৃতির মধ্যে একটি স্থায়ী ভাবের জীবনব্যাপী রোমন্থন তার মুখে একটি স্থির লাবণ্যে প্রকাশিত হয়। তাদের মুখে অন্তঃপ্রকৃতির বৎসলতা চিরমুদ্রাঙ্কিত। পাশ্চাত্ত্য দেশের নবীন সভ্যতায় না আছে একনিষ্ঠ প্রশান্ত ভাবগভীরতা, না আছে নব-অঙ্কুরিত আশার অম্লান উজ্জ্বলতা। উহার বলিষ্ঠ অশ্রান্ত আত্মপ্রসারণের মধ্যে আছে বহু আশাভঙ্গের জ্বালাময় স্মৃতি, বহু জরাজীর্ণ অভিজ্ঞতার ক্লান্ত ছাপ।····· গ্রাম্য সরলতা ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জটিলতা—কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ নয়। এই দুয়ের সমন্বয়েই ভবিষ্যৎ মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা।" [তদেব]

'ভদ্রতার আদর্শ' ও 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' নিবন্ধদুটিতে লেখক পাঞ্চভৌতিক সভার পরিবেশে ফিরে এসেছেন। আবার পঞ্চসদস্য ও সভাপতির মধ্যে তর্কবিতর্ক সংঘটিত হয়েছে। আবার সেই উত্তেজনা, সেই বাদপ্রতিবাদমুখর পরিবেশ।

'ভদ্রতার আদর্শ' নিবন্ধের পরিবেশ লঘু। পোশাক-পরিচ্ছদের সুরুচি সম্বন্ধে লঘু সরস আলোচনা। উপলক্ষ, ব্যোমের পোশাক। 'অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে-সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধ' পরিহিত ব্যোমকে নিয়ে সবাইর হাসাহাসি। সকলেই বেশভূষায় ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন মানেন, বাঙালি সমাজের আদব-কায়দাহীন শিথিলতা ও বেশবাসের রুচিহীন কুশ্রীতাকে বর্বরতার লক্ষণ বলে নিন্দা করেছেন। আশিবছর পূর্বের এই নিবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা আজো বজায় আছে। বাঙালি সমাজের বেশভূষা কেন শিথিল, শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া—এ নিয়ে সমীরের আক্ষেপের অংশীদার বাকি সদস্যরা। এমনকি ব্যোমও সমর্থন করেছেন। পোশাক সম্পর্কে বাঙালির কেন এই শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা? এর উত্তরে বলা হয়, আমাদের আধ্যাত্মিক প্রবণতা ও অর্থকৃচ্ছ্রতা। সদস্যরা এই কৈফিয়ৎ অসত্য বলে খারিজ করে দিয়েছেন। সদস্যরা মনে করেন (এবং তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও মত), সাধারণ বাঙালির তৈলনিষিক্ত, মেদবহুল, মলিন, অপ্রচুর বস্ত্রে আবৃত শরীর কোনো অধ্যাত্ম-সাধনার উচ্চভাবাবিষ্টতার পরিচায়ক নয়। বাঙালি বিলাসপ্রিয় ধনীর মধ্যেও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণ দারিদ্র্য নয়, আলস্য, মানসিক জাড্য। ব্যোম এ'কথাটাকে প্রসারিত করে বলেছেন, আমরা বৈরাগ্যবিলাসী—গেরুয়ার আড়ালে আলস্য ও মানস শৈথিল্যকেই প্রশ্রয় দিই। এখানে আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি দিক লেখকের তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' নিবন্ধের বিষয়—সমাজজীবনে নিয়মের রাজত্বে বাসকারী মানুষের অনিয়মের প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ; আর নিয়মের জাল ছিন্ন করার তাগিদেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের প্রথম উন্মেষ। এই বক্তব্যের উদ্‌গাতা ব্যোম; তাকে সমর্থন করেছেন ক্ষিতি, সমীর, ভূতনাথবাবু। মানুষ বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে কেন? নিয়মের অমোঘ আকর্ষণ অতিক্রম করে খেয়াল-খুশীর রাজ্যে পৌঁছানো যায় কিনা তা পরীক্ষা করতেই মানুষ বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিরহস্যভেদ-অভিযানে মানুষ যত দূরেই যাক না কেন, নিয়মের অমোঘতা সর্বত্রই তার অনুগামী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে এই নিবন্ধের বক্তব্যের মিল আছে, পার্থক্য আছে উপস্থাপন-রীতিতে। এ আলোচনায় কোনো মত-বিরোধিতা নেই, আছে ঐক্যমত্য। নিয়মের এই অমোঘতা ও সর্বব্যাপিত্বে কিন্তু মানুষের কোনো আনন্দ নেই, নিয়মের ব্যতিক্রমেই সে আনন্দ পায়। সমীর দেখিয়েছেন, তাই আমরা পরশপাথর ও আলাদীনের প্রদীপের গল্পে আনন্দ পাই। নিয়মের বারবার প্রতিপাদনে আমাদের আগ্রহ নেই, ব্যতিক্রমে আছে, তাই নিয়মকেও আমরা ব্যতিক্রম বলে দেখতে পাই, সে কারণে বিচক্ষণ ডাক্তারের শাস্ত্রসঙ্গত চিকিৎসায় দলে দলে রোগী নিরাময় হলে

আমরা বলি ডাক্তারের 'হাতযশ' আছে। অভিজ্ঞতার আঘাতে আমরা নিয়মকে মানি, কিন্তু তা দায়ে পড়ে। অনিয়মের প্রতিই আমাদের যত আকর্ষণ।

সাত

সুখ ও দুঃখের মাত্রা নিয়ে পঞ্চভূত-সভায় গভীর উপভোগ্য আলোচনা পাই দুটি নিবন্ধে—'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'। সদস্যদের তর্কবিতর্কে আঘাতে-প্রত্যাঘাতে মানস পদচারণার স্বচ্ছন্দ পরিচয় এখানে আছে, সেই সঙ্গে পাই মৌলিক সরসতা। আশি বছর পূর্বেকার রচনা ভাববিন্যাসগুণে আজো আকর্ষণীয়।

নিবন্ধদুটি পরস্পর-যুক্ত। 'কৌতুকহাস্য' নিবন্ধে বলা হয়েছে নিয়মভঙ্গজনিত চেতনা-পীড়নে কৌতুকের জন্ম ; পীড়নের মাত্রা ছাড়ালে কৌতুক দুঃখে পরিণত হয়। কৌতুকের স্বরূপ এখানে গভীরভাবে আলোচিত নয়। তার বহির্লক্ষণ ও উৎপাদনের মধ্যে সুখ-দুঃখের মাত্রা নিয়েই তর্ক হয়েছে। 'কৌতুকহাস্যেব মাত্রা' নিবন্ধের আলোচনা তুলনায় গভীর। অসঙ্গতি কৌতুকের মর্মগত সত্য : একথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নিয়মভঙ্গ মাত্রই কৌতুকের উদ্রেক করতে পারে না, তা এখানে ব্যাখ্যাত। যে অসঙ্গতি মানুষের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে জড়িত তা যদি আকস্মিক ও বিশেষ দুঃখকর না হয়, তবেই তা কৌতুকের উৎস হতে পারে। এই দুই নিবন্ধে আলোচনা খুব একটা গভীর নয়, তবে উপভোগ্য।

'কৌতুকহাস্য' নিবন্ধের অব্যবহিত উপলক্ষ দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অকারণ হাসি। ব্যোমের মতে, পুরুষেরা কারণে হাসে, কিন্তু মেয়েরা হাসে অকারণে। সমীরের জিজ্ঞাসা, দুঃখে কাঁদি সুখে হাসি, এর কারণ বুঝি, কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন। তখন ক্ষিতি আলোচনায় যোগ দিয়েছে। তিন বন্ধুতে মিলে এর উত্তর খুঁজছে। সুখ-প্রকাশের জন্য স্মিতহাস্য আর কৌতুক প্রকাশের জন্য উচ্চহাস্য। আমোদ ও কৌতুকের মধ্যে অপ্রত্যাশিতের আঘাতজনিত ঈষৎ পীড়া ও তজ্জনিত দুঃখ বর্তমান। "সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রমে আমাদের চেতনা অভ্যস্ত জড়তা হইতে উদ্দীপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ সুখদুঃখমিশ্র অনুভূতির কারণ হয়। পীড়নের পরিমাণ মাত্রা ছাড়াইলে কৌতুক দুঃখে পরিণত হয়। চেতনার পীড়ন ও উত্তেজনার জন্য কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্যের বিস্ফোরণে।" [তদেব] ক্ষিতি এতে পূরা সায় দিতে পারেন নি। "স্মিতহাস্যও কৌতুকের লক্ষণ। চিত্তের অসঙ্গতিবোধজাত অনতিপ্রবল উত্তেজনা কৌতুকের ফল না হইয়া উহার কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে।" সভাপতির মতে —"অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের কারণ", "ট্রাজেডির মর্মন্তুদ বেদনাও ব্যক্তিগত দুঃখের

সহিত অসংযোগের জন্য একপ্রকার নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ উৎপাদন করে। দুঃখানুভবে আন্দোলন প্রবলতর হয় বলিয়া ও কৌতুক চিত্তের অতর্কিতে আসে বলিয়া ইহার অল্প দুঃখ একপ্রকার সুখকর অনুভূতির উদ্রেক করে।" [তদেব]

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নিবন্ধেও আলোচনা সুখদুঃখের তারতম্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার প্রমাণ আচরণের অসঙ্গতির মধ্যে নিষ্ঠুরতার স্বীকৃতিতে। এখানে আলোচনা শ্রীমতী দীপ্তির প্রতিবেদনে বিধৃত।

দীপ্তি-প্রেরিত প্রতিবেদনের সার কথা এই—"নিয়মভঙ্গমাত্রই কৌতুকের উদ্রেক করিতে পারে না, বিশেষতঃ জড়জগৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যতিক্রম কৌতুকরসাবহ নয়। যে অসঙ্গতি মানুষের ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত তাহা যদি আকস্মিক ও বিশেষ দুঃখকর না হয়, তবেই তাহা কৌতুকের উৎস হইতে পারে।" আচরণের অসঙ্গতির মধ্যে আছে নিষ্ঠুরতা।

এই বক্তব্যের সমালোচনাচ্ছলে যোগ করা যায়—"এই নিষ্ঠুরতা কৌতুকের অঙ্গীভূত উপাদান নয়, ইহার একটা অনভিপ্রেত উপজাত ফলমাত্র। নিষ্ঠুরতার প্রতি সচেতন হইলে কৌতুকরস জমিবে না। কমেডির অসঙ্গতি প্রকৃত অসঙ্গতিপদবাচ্য ; ট্রাজেডির মধ্যে যদি অসঙ্গতিও থাকে, তবে ইহা ক্ষুদ্র নিয়মভঙ্গের উদাহরণ নহে, বিশ্ববিধানের বা মানবের গভীর প্রত্যাশা ও অনুভূতির ভয়াবহ বিপর্যয়। মাতালের অস্থির পদক্ষেপ কৌতুকের সঞ্চার করে, কিন্তু সর্বধ্বংসী ভূমিকম্পে যাহার গতি বিপর্যস্ত সে ভয় ও বিস্ময়ের পাত্র। বিস্ময় যখন হাস্যে ও যখন অশ্রুজলে পরিণত হয় তখন এই পরিণতি কেবল অসঙ্গতির তার চড়ানোর জন্য নয়। অন্ততঃ অসঙ্গতির যে মাত্রাধিক্যে ট্রাজেডির রস উদ্ভূত হয় তাহা উহার একটি নবজন্মগত রূপান্তর। উহার প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্য এত বেশী যে উহার নূতন নামকরণ করিতে হইবে। কমেডির অসঙ্গতির প্রকৃত গোত্রান্তর ট্রাজেডিতে নয়, স্নিগ্ধ করুণ হিউমর-এর সূক্ষ্ম হাস্যরসে।" [তদেব]

স্বীকার্য, কৌতুকেব স্বরূপ আবিষ্কার প্রয়াসে পঞ্চভূতের সদস্যরা মায় সভাপতি পর্যন্ত একই বক্তব্যের পাকে পাকে ঘুরপাক খেয়েছেন। এক্ষেত্রে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরি-ধৃত মন্তব্যের যৌক্তিকতা অবশ্যস্বীকার্য।

আট

পঞ্চভূত গ্রন্থের অবশিষ্ট নিবন্ধ তিনটির বিষয়—সৌন্দর্য-চিন্তা। 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' ও 'প্রাঞ্জলতা' নিবন্ধে পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্যরা সৌন্দর্য সম্পর্কে তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই আলোচনায় গভীর ও মৌলিক বক্তব্যের

সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্য-ভাবনাকে—সোনার তরী-চিত্রা-সাহিত্য-ছিন্নপত্রাবলীতে ব্যাখ্যাত বক্তব্যকে—সমকালে আরো একবার পঞ্চভূত সভায় ঝালিয়ে নিয়েছেন। পাঁচজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত করেছেন ক্ষিতি। ব্যোম ও সভাপতি দার্শনিকতার উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করে সৌন্দর্যের নবসংজ্ঞা দিতে প্রয়াস করেছেন।

পুণ্যাহ অর্থে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ-দিন। প্রজারা যার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা নিয়ে কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সামনে এনে উপস্থিত করবে। সে টাকা সেদিন গণনা করবার নিয়ম নেই। এই উপলক্ষে সানাই বাজনা।

এর থেকেই 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নিবন্ধের আলোচনার সূত্রপাত। সানাইয়ের বাজনা মনুষ্যস্বভাবের প্রয়োজনকে সৌন্দর্যের আবরণে সাজানোর প্রবণতাকে ঘিরে আলোচনার সূত্রপাত করল। খাজনা দেবার বাধ্যতামূলক কর্তব্যকে উৎসবের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপহার রূপে দেখালে, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধকে প্রীতির সম্পর্করূপে উপস্থাপিত করলে, মানবপ্রকৃতির মর্যাদা বাড়ে। ভূতনাথবাবু এ'কথাই বলতে চেয়েছেন। উৎসবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'মানুষ প্রতিদিন যেভাবে কাজ করে এক-একদিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, একদিন খরচ করে। সেইদিন শুভদিন, আনন্দের দিন। সেই দিনই উৎসব। ক্ষিতি এই প্রয়োজনের শুকনো কঙ্কালকে ফুল দিয়ে ঢাকার কৌশলের পক্ষপাতী নন। সমীর আর ভূতনাথ কিন্তু তা চান। ব্যবহারজীর্ণ সংসারের ইতরতাকে তার আদিম যৌবনশ্রীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আকৃতিকে, হাটের কেনাবেচাকে উৎসবের আদর্শসুষমায় গোপন করবার প্রয়াসকে মানুষের স্বাভাবিক ঔদার্যের প্রমাণরূপে তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্রোতস্বিনীও এই মতে সায় দিয়েছেন।

ব্যোম একটা নোতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'আত্মার সৃজন চেষ্টা', 'আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা', 'সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু', 'এই সেতুনির্মাণ কার্য এখনো চলিতেছে': এইসব কথার দ্বারা ব্যোম জড়প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা-সাধন প্রক্রিয়াকে তাত্ত্বিক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানব-আত্মা জড়ের সঙ্গে অন্য জড়ের ও অন্য মানুষের নব নব আত্মীয়তাসম্পর্ক উদ্ভাবন করে পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য প্রেম ও আনন্দের রাজ্যে পরিণত করেছে বলে তাঁর ধারণা। মানুষের সঙ্গে অসহায় পশু গোরুর স্নেহসম্পর্ক (স্রোতস্বিনীর উদাহরণ), নদীর সঙ্গে মানুষের স্নেহসম্পর্ক (সমীরের উদাহরণ) এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। সমীর জানিয়েছেন—বাঙালির সামাজিক শিষ্টাচারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কোনো শব্দ না থাকার কারণ অকৃতজ্ঞতা নয়, সকলের সঙ্গে ব্যাপক আত্মীয়চেতনার পরোক্ষ ফলমাত্র।

ভূতনাথ তা সমর্থন করে আমরা যে ঋণমুক্তির জন্য ব্যস্ত নই তা বলেছেন। ব্যোম দেবতা সম্বন্ধেও আমাদের স্নেহের জোর আর আশাভঙ্গের অভিমানকে সমর্থন করেছেন এবং এক্ষেত্রে য়োরোপীয় জাতি থেকে আমাদের পৃথক করেছে, তা বলেছেন। ক্ষিতি কটাক্ষ করেছেন আমাদের য়োরোপীয়দের প্রতি অকৃতজ্ঞতায়। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও প্রকৃতিপ্রেমের মূল য়োরোপীয় সাহিত্য, ইংরেজি কাব্য।

সভাপতি ভূতনাথবাবু আলোচনার সমাপ্তি ঘটাতে গিয়ে ক্ষিতির এই মত স্বীকার করে নিয়েও একটি মৌলিক কথা বলেছেন। "ভারতীয় সাহিত্যে মানব ও প্রকৃতির সম্পর্ক অনেকটা মাতা-পুত্র বা ভাই-ভগ্নীর মতো একটা সহজ রক্তসম্বন্ধ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কিন্তু ইহার মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের অনুরূপ কিছুটা নিগূঢ়তা, একটা গোপন-রহস্যভেদের ব্যাকুলতা, অনুসন্ধানের উৎকণ্ঠা ও আবেগের অবস্থাভেদে তারতম্য ও একটা অস্থির চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মধ্যে যাহা ঐক্য, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তাহা বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনাকৃতি। আমরা নদী, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতিকে প্রাণময় ও আত্মীয়তার নৈকট্যে একান্ত আপনার করিয়া দেখি, কিন্তু, ইহাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি। তাই গঙ্গা আমাদের নিকট কেবল ইহকালের আরাম ও পরকালের কল্যাণদাত্রী। তাহার একটি বিশিষ্ট মূর্তি কল্পনা করিয়া আমরা তাহার নিকট কেবল ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করি। কিন্তু তাহার সৌন্দর্যসত্তা আমাদের নিকট কোন আধ্যাত্মিক ভাবাবেদন জাগায় না।"

[তদেব]

পঞ্চভূত-সভার সভাপতি তাই গঙ্গার প্রাচ্য আদর্শ পরিহার করে তার পাশ্চাত্ত্য-ভাবানুপ্রাণিত অধ্যাত্ম-স্বরূপটিই উদ্বোধন করেছেন। গঙ্গাকে পুণ্যদায়িনী, পতিতপাবনী মনে না করে স্মৃতির আনন্দসঞ্চয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেই আহ্বান জানিয়েছেন। গঙ্গার বিচিত্র স্মৃতি, নানা ফুলে গাঁথা একটি মালার মতো, তিনি জীবনযাত্রার অবসানে চিরসুন্দরের পদে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করার বাসনা প্রকাশ করে বিতর্কের উপসংহার করেছেন।

'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নিবন্ধটি (ভাদ্র ১৩০০/১৮৯৩) দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এক, এখানে ব্যোমের মুখে শুনি সৌন্দর্যের একটি নোতুন সংজ্ঞা—'আমার সঙ্গে জড়ের মাঝখানকার সেতু'। দুই. ভূতনাথের মুখে শুনি, গঙ্গার পুণ্যদায়িনী রূপের নয়, সৌন্দর্যসত্তার বন্দনা। পারলৌকিক মঙ্গলকামনা নয়, সৌন্দর্যসত্তার আধ্যাত্মিক ভাবাবেদনকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা ভারতীয় ভক্তিচেতনার উপর জয়লাভ করেছে।

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' হিন্দুদের সৌন্দর্যবোধের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী ও

গভীরস্তরসঞ্চারী আলোচনা। বস্তুত পূর্ব নিবন্ধে ব্যোম ও ভূতনাথের মুখে আর এই নিবন্ধে সমীর ও ক্ষিতির মুখে লেখক সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে কৌতুকহাস্য-প্রসঙ্গে, কিন্তু বিষয় হ'ল আমাদের সৌন্দর্যচেতনায় প্রেম ও ভক্তির প্রভাব।

হিন্দুজাতির উদ্ভট মূর্তিকল্পনা ও রূপবর্ণনার জন্য উপমা-নির্বাচন স্বভাবতঃই কৌতুক-রস-উদ্রেকের উপযোগী ; কিন্তু জাতির অমূর্ত ভাবনিষ্ঠার জন্য তা কৌতুকরসের পরিবর্তে সৌন্দর্যসৃষ্টির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সমীর এই বক্তব্য পেশ করে তার উদাহরণ দিয়েছেন। গজেন্দ্রগামিনী, গৃধিণীর মতো কান-বিশিষ্টা, হাতির শুঁড়ের মতো হাত পা-বিশিষ্টা, সুমেরু ও মেদিনীর মতো উচ্চবর্তুল-অঙ্গসম্পন্না সুন্দরী আমাদের কাব্যে বহুকাল যাবৎ রূপের পরাকাষ্ঠারূপে কীর্তিত হয়ে আসছে। এর কারণ এই, ভারতীয় হিন্দুরা গুণকে বস্তু থেকে পৃথক করে দেখতে অভ্যস্ত। তাই এইসব হাস্যকর ও অসঙ্গত উপমা ভারতীয় সাহিত্যে রূপমোহ ঘনীভূত করবার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সমীরের এই বক্তব্যে ব্যোম ও ক্ষিতি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রেম ও ভক্তির মোহ আমাদেরকে বস্তুজগতের অসৌন্দর্য বা অস্বাভাবিকতার প্রতি কিরূপ অন্ধ করে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সমীর কৃষ্ণের নীলবর্ণের মূর্তির উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের এই মানস-প্রবণতা উচ্চ কলাবিদ্যার অনুকূল নয়, এ কথা স্বীকার করেও ব্যোম এর বাস্তব-নিরপেক্ষতার জন্য সুকুমার ভাব-উদ্দীপনের বিশেষ সহায়করূপে অনুমোদন জানিয়েছেন। আমাদের সমাজে ভক্তিযোগ্য পাত্রের অভাব থাকলেও ভক্তি-অনুশীলনে কোনো ব্যাঘাত হয় না। তাই মিথ্যা মোকদ্দমার প্রধান মিথ্যাসাক্ষী হলেও গুরুঠাকুর সম্পর্কে আমাদের ভক্তি টলে না, একথা ক্ষিতি জানিয়েছেন। আসল কথা, "সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে।······আমরা সৌন্দর্য-রসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু সেজন্য অতি যত্ন-সহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না— যেমন-তেমন একটা-কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি। ·····আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না।" ক্ষিতির এটাই মূল বক্তব্য।

সৌন্দর্য ও ভক্তির আদর্শ সম্পর্কে ভারতীয়দের কোনো অসন্তোষ নেই বলেই আমরা অপাত্রে ভক্তি আরোপ করি, যেমন-তেমন একটা-কিছুকে সুন্দর বলে মেনে নিই। ক্ষিতির এই মৌলিক বক্তব্য নিবন্ধের মূল বিষয়। সৌন্দর্য সম্পর্কে অসন্তোষ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্য-ভাবনার মূলে ক্রিয়াশীল, এই ইঙ্গিত এ আলোচনায় প্রচ্ছন্নভাবে

ক্রিয়াশীল। নিবন্ধ-শেষে ক্ষিতির মুখে এই সন্তোষের বিরুদ্ধে যে-প্রতিবাদ ধ্বনিত, তা আধুনিককালের লেখকেরও প্রতিবাদ—'সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই—এরূপ পরমসন্তোষের অবস্থাতে আমি সুবিধা মনে করি না।'

'প্রাঞ্জলতা' নিবন্ধের সূত্রপাত হয়েছে স্রোতস্বিনীর একটি মন্তব্যে। কোনো একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির কবিতা তাঁর ভালো লাগে না—এখানে একটি জটিল সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত। দীপ্তি স্রোতস্বিনীর আপত্তিকে উস্‌কে দিয়েছেন। দীপ্তির মতে, ভালো কবিতার আকর্ষণ অগ্নির দাহিকা শক্তির মতো স্বয়ংক্রিয়, স্বনির্ভর, সমালোচনা-সাহায্য-নিরপেক্ষ।

দুই রমণীর বক্তব্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পঞ্চভূতের পুরুষ-সদস্যরা, যোগ দিয়েছেন সভাপতি। ক্ষিতির মতে, কবির মন সাধারণের অনুভবশক্তি ছাড়িয়ে এত বেশি অগ্রসর হয় যে সমালোচনার ঘোড়ার ডাক বসানো ছাড়া এই ব্যবধান ঘুচানো যায় না। ব্যোম সমর্থন করে বলেছেন, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের জ্ঞান, দর্শনের বোধ ও সাহিত্যের আনন্দ-উপলব্ধি সবই স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। সমীর এ কথার সমর্থনে জানিয়েছেন, এ'যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ; সর্বসাধারণের যুগ অপসৃত, বিশেষজ্ঞ ছাড়া অপরে কলাবিদ্যার রসগ্রহণে অক্ষম। ক্ষিতি এক-পা এগিয়ে বলেছেন, মানুষের সর্ববিষয়ে অগ্রগতির ইতিহাসে সরল ও দুরূহের একটা স্ববিরোধময় সামঞ্জস্য-প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আধুনিককালে সারল্যের উপভোগ বলে কিছু নেই, এখন সবই জটিল। তিন বন্ধুর এই আক্রমণে স্রোতস্বিনী হঠে না গিয়ে বলেছেন, আলোচ্য কবি দুরূহ নন, তাঁকে না বোঝার দোষ পাঠকের নয়, যুগধর্মের অনিবার্য প্রভাবও নয়, অতএব কবি-ই দোষী। ব্যোম তর্কে নোতুন মাত্রা যোগ করেছেন—সরলও সহজ নয়। প্রাঞ্জলতার রসগ্রহণই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কৃষ্ণনগরের পুতুলের সারল্য শিশুসুলভ, অতিপ্রকট, কিন্তু তা বলে সহজ নয়। গ্রীক প্রস্তরমূর্তির অলংকারহীন প্রাঞ্জলতাই প্রধান গুণ। ব্যোমের এ যুক্তিতে দীপ্তির সায় নেই।

দীপ্তি যে তর্কময়ী, তার প্রমাণ এখানে পাই। তিনি উল্টে বলেছেন, ভাল জিনিসের অতিপ্রশংসায় কোনো কৃতিত্ব নেই, বোধশক্তির কোনো পরিচয় তাতে নেই। আর যাকে সরলতা বলা হয়, তা আসলে অনেক সময় বর্বরতা; মার্জিত রূপের অভাব বহুক্ষেত্রে ভাবরিক্ততার দ্যোতক।

দীপ্তির বক্তব্যে আপত্তি করেছেন সমীর। তাঁর মতে, সংযম সাহিত্যে ও সমাজ-জীবনে সু-রুচির পোষক। সংযম ভদ্রতার একটা প্রধান লক্ষণ। আতিশয্য-ই বর্বরতা।

আলোচনার উপসংহারে সভাপতি ভূতনাথবাবু প্রাঞ্জলতার সমর্থন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে অতিরঞ্জনপ্রিয়তাকে তিনি বাঙালির মানসপ্রবণতার লক্ষণরূপে নির্দেশ করলেন। চীৎকার করে, ভঙ্গিমা করে, আড়ম্বর করে বলতে আমরা ভালবাসি—কি সাহিত্যে, কি সংবাদপত্রে। বর্বরতা সরলতা নয়। আড়ম্বর চীৎকার আসলে বর্বরতা। আসলে বাঙালির মধ্যে একটা আদিম বর্বরতা আছে। ভদ্রসাহিত্যে ম্যানার আছে, ম্যানারিজম্ নেই। ভালো সাহিত্যে আছে পরিমিত সুষমা, পরিপূর্ণতা, ভাব শ্রী, গূঢ় প্রভাব; থাকে না ভঙ্গিমা, ম্যানারিজম্, আড়ম্বর। পরিপূর্ণতা-ই প্রাঞ্জলতা। সাহিত্যে তা-ই অন্বিষ্ট।

দীপ্তি আর স্রোতস্বিনী তর্কে হেরেছে, কিন্তু হার স্বীকার করে নি।

এভাবেই পঞ্চভূত-সভার পঞ্চসদস্য ও সভাপতি ভূতনাথবাবু গত শতকের শেষ দশকের দুনিয়ার সব বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আপন আপন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য সত্যান্বেষণ নয়, মানসিক পাদচারণা। সে কাজে তাঁরা সাফল্যলাভ করেছেন, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই।

১২

কালান্তর : রবীন্দ্র-দর্পণে সমকাল

এক

গত শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বছর ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন এবং বৃটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের সার্বিক নব-জাগরণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই নব-জাগরণে তাঁরও একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৬১) তখন দেশপ্রেমের কথা এদেশে উচ্চারিত হয় নি। তাঁর বাল্য ও কৈশোরে হিন্দুমেলা ও কংগ্রেস ও যৌবনে স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী মেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞা, সাধনা ও কর্মযোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ-সবের মধ্যেও তাঁর নিশ্চিত ভূমিকা ছিল। সত্তর-উপান্তে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করেছেন,

> "যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।' [আত্মপরিচয়, ৫]

জীবনকে প্রবলরূপে গ্রহণ করার সদা-ঔৎসুক্য ও আগ্রহ এই ঘোষণায় স্পষ্ট উচ্চারিত। জীর্ণ ও পুরাতনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য ছিল না। তাঁর আনুগত্য নবীন তারুণ্যের প্রতি। এ-কথাই একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

> "তুমি জান আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীতকালে আড়ষ্টভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে, একথা আমি মানি নে।" [কন্‌গ্রেস, কালান্তর]

প্রথম উক্তি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, দ্বিতীয় উক্তি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে—অর্থাৎ জীবনের শেষ দশ বছরের পর্বে রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ পুরাতনকে বর্জন করতে ও নবীন তরুণকে অভ্যর্থনা করতে উৎসুক ছিলেন। এ থেকে অনুধাবন করা যায় প্রবীণ মনীষীর মন কতটা সজাগ ও আধুনিক ছিল।

'কালান্তর' গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ বৈশাখ, ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের এই সজাগ আধুনিক সমকালসচেতন মনের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে বেঁচেছিলেন,

সে-কারণেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা সমাজচিন্তা সমকালচিন্তা অচল অনড় নয়। এবিষয়ে তিনি নিজেই আমাদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন,

> 'যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত ·…রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার কবতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে তাকে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।"

['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

'কালান্তর' গ্রন্থ-ধৃত বিষয় ও অভিমতসমূহ বিচারের সময় এই বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপট ও কালের ভূমিকা অবশ্যস্মর্তব্য। তৎসাময়িক অভিমতকে সামগ্রিক জীবনের পটে ফেলে দেখা চাই। অন্যথায় তার স্বরূপ জানা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের সমকাল বলতে আমরা কোন কালকে বুঝাব ? ১৮৬০ থেকে ১৯৪০ : এর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট বার বার বদলেছে। যেহেতু কোনো কালই স্বয়ম্ভূ নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ঐতিহ্যবাহী ও অতীতের সঙ্গে যুক্ত, সেহেতু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ বা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রেক্ষাপট পূর্ববর্তী এক শতাব্দী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের যোগ্য প্রেক্ষাপট পূর্ববতী (অষ্টাদশ) শতাব্দীর পৃথিবীব্যাপী ক্রান্তিকারী ঘটনাস্রোত। 'আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি' : রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণায় আধুনিক কালের ও মনের চাঞ্চল্য, ঔৎসুক্য, প্রসারমান দিগন্ত, ভাবদ্বন্দ্বের তরঙ্গবিক্ষোভ—সব কিছুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই আধুনিক কাল ও নবীন যৌবনের রঙ্গভূমি নব্য য়োরোপ—অষ্টাদশ শতাব্দীর য়োরোপ—শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)-পরবর্তী য়োরোপ—বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে বলীয়ান য়োরোপ। নব্য য়োরোপের চিহ্নপ্রতীকরূপে ইংরেজ এসে প্রাচীন নিদ্রিত ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙালো অষ্টাদশ শতাব্দে, এই সুপ্রাচীন দেশে আধুনিক কাল আবির্ভূত হল।

'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে ভারতবর্ষে আধুনিক কালের সূচনা ও প্রকৃতি নির্দেশ ও বিশ্লেষণ করেছেন।

"বর্তমান যুগে, অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারো শো খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হটতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্টো দিকে, তার কোনো আশংকা ও লক্ষণ কোথাও ছিল'না।"

য়োরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজি সাহিত্য সেদিন আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিল।

"যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে, জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা, আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য; তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে।"

[কালান্তর, শ্রাবণ ১৩৪০]

আধুনিক কালের স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ এখানে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 'A man is a man for a' that' : কবিবাক্যে মানুষের প্রবল আত্মবিশ্বাস ঘোষিত। জন্ম নয়, ভাগ্যের আনুকূল্য নয়, দৈবের কৃপা নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের দয়া নয়, আপনার জোরেই মানুষ তার আপন ক্ষেত্রেই স্বরাট্। প্রবল আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানের গৌরববোধ, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভের সুতীব্র অভিলাষ ও স্পর্ধা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা, ব্যক্তিত্বের সম্মান, যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা: এই সবকিছু নিয়েই আধুনিক কাল। তারই সূচনা হয়েছিল ইংরেজ শাসন-মারফত য়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার নিপুণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। সেই সঙ্গে মোহ-ভঙ্গের ইতিহাসও বিশ্লেষণ করেছেন, দেখিয়েছেন কীভাবে য়োরোপ তার হিংস্র নখদন্ত নিয়ে শোষকরূপে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এশিয়ায়, আফ্রিকায়।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইংরেজ সম্পর্কে ভারতবাসীর মোহভঙ্গের

সূত্রপাত। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দ্বিতীয়ার্ধে অবিশ্বাস ও ঘৃণা-মিশ্রিত ভালোবাসায় পরিণত হল। এই আপাতবিরোধী ভাবদ্বন্দ্বের জটিল আবর্ত রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যের যুগলক্ষণ। এই শ্রদ্ধা ও বিরাগ-মিশ্রিত মনোভাবের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—।

> "আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।"

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতীয় মানসের স্বতোবিরোধিতার এই নিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসদৃষ্টির পরিচায়ক।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ, বেলজীয় প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কীভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের উপর বর্বর অত্যাচার করেছে, ইতিহাসদৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছেন।

> "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য।...মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটি পর্দা তুলে দিলে।...এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বেকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে নি। ......একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল; আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই।...... যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারদিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছাব আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে?" [কালান্তর, শ্রাবণ ১৩৪০]

> "ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি।...এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।...জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের

অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।”

[অন্তিম ভাষণ ‘সভ্যতার সংকট’, ১ বৈশাখ ১৩৪৮]।

ইংরেজের প্রতি গত শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতীয়ের শ্রদ্ধা ও বিরূপতা, আস্থা ও ঘৃণার দ্বৈত রূপের ছবিটি যেমন নিপুণভাবে অংকন করেছেন তেমনি নিপুণভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন প্রাক্-বিশ্বসমর ও প্রথম বিশ্বসমরোত্তর যুগের য়ুরোপীয় রাজনৈতিক চারিত্র্য। কালান্তর গ্রন্থের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

দুই

কালান্তর গ্রন্থে রবীন্দ্র-দর্পণে সমকালের যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

প্রতিবিম্বের প্রথম রূপ, ইংরেজের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা, এবং ধীরে ধীরে মোহভঙ্গ। এই রূপটি আমরা সদ্য লক্ষ্য করেছি।

প্রতিবিম্বের দ্বিতীয় রূপ, আমাদের স্বরাজ সাধনার ত্রুটি-বিচ্যুতি।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তামূলক রচনা ধীরভাবে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, তাঁর কাছে ‘স্বরাজ’ বিশিষ্ট অর্থে প্রতিভাত হয়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগ করাটাই তাঁর কাছে দেশপ্রেমের চরম প্রকাশ বলে কখনো মনে হয় নি এবং সমকালের রাজনৈতিক হাওয়ার বিরুদ্ধেই তিনি সে-কথা নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।—

“যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলিনি; একে অধিকার দিতে পারিনি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই ’পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এসব কথা শোনবার যোগ্য নয় ·…আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করিনি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে,

যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।"

['রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত', কালান্তর]

আমাদের আত্মপ্রতারণার নিভুল বিশ্লেষণ এখানে পাই। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে উপরিধৃত মন্তব্য বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। গত শতকের শেষে নরমপন্থীদের [কংগ্রেসের মডারেট দল] ভিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, 'তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্নমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গর্ব করতেম।' [তদেব]

স্বরাজের স্বরূপ কী—এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে বলেছেন,—

"দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। ··স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো-আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই [অন্ধ] দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছু দিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়। স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।······সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।" ['স্বরাজ গঠন', কালান্তর]

রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন অসহযোগ আন্দোলনের পালে কেবল হাওয়া নয়, কয়েকটি ছিদ্রও দেখা দিয়েছিল। তবু সেদিন সে কথা সাহস করে বলবার মতো লোকের অভাব ছিল।

বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও চরকা প্রচলন, সম্মোহন মন্ত্র ও গুরু-ভজনা স্বরাজ লাভের পথ নয়ঃ নির্ভীকভাবে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আসল কথা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর আপত্তি। অসহযোগ আন্দোলন মূলতঃ নেতিবাচক আন্দোলন বলে রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করেন নি। ইংরাজদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার সার্থকতায় তিনি সন্দিহান ছিলেন।

আর স্বরাজলাভের জন্য যুক্তির নির্বাসন, দেশের চিত্তশক্তির সাময়িক অবরোধ, গুরুপদে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ, গুরুবাক্য ওরফে দৈববাণীতে বিশ্বাস স্থাপনের তীব্র নিন্দা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। স্বরাজসাধনায় মহাত্মাজীর দান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তার প্রমাণ এই উক্তি—

"মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন,) সেখানে সকলেই তাঁর কাছে হার মানি।…কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গডতে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেডানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদেব পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।" ['সত্যের আহ্বান', কালান্তর]

বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে মহাত্মাজীর এই দান সকৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের স্বীকার করা উচিত। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' এবং শ্রীসুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে স্বাধীনতাসংগ্রামে গান্ধীজির দান শিল্পস্বীকৃতি পেয়েছে।
(কিন্তু ~~এর পরই~~ আবার রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—'কিন্তু, সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা'হলে ফল হল কী ?'

সত্যসন্ধানে অবিচল রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের সঙ্গে লিখতে হয়েছে,

"মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' ? এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক ?" [তদেব]

প্রশ্নের ভঙ্গিতেই পরিস্ফুট, চরকা কাটার আহ্বানকে রবীন্দ্রনাথ নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক বলে মনে করেন নি। তাই খুব স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন,

'দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায় ? যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না।) মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি, তা হলে আমাদের দেশে যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম ও প্রবলতম হয়ে উঠবে।' [তদেব]

রবীন্দ্রনাথের এই আশংকা স্বাধীন ভারতবর্ষে নিত্যই যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। দৈববাণীর বিরুদ্ধে, অন্ধ মন্ত্রানুগত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত ঘোষণা :

> "বাহ্যফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু, যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধ বাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই হতে পারে না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।" [তদেব]

রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে (কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। এই কথার প্রয়োজন আজো আমাদের দেশে ফুরোয় নি।

তিন

'কালান্তরে' রবীন্দ্র-দর্পণে সমকালের প্রতিবিম্বের তৃতীয় রূপ, আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ।

ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষে সমাজকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে মুখ্য করা হয়েছে বলেই ভারতের দুর্দশা। এই দুর্দশার নিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন। বস্তুত এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের চেহারাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর কথায়,

> "এই তো গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করার সমস্যা। ...... আমাদের আর একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।"

['সমস্যা', কালান্তর]

আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি কীভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করেছে তা রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ

করেছেন। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার গোঁজামিল দেবার যে চেষ্টা হয়েছে—অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ সমর্থন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার লজ্জাকর হীনতা—সে-সবের মধ্যে যে ফাঁকি রয়েছে, তা 'কালান্তর' গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন, "আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না" [তদেব]। "ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা" ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা তিনি দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পথ কোথায়? লড়াই কার সঙ্গে?—এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে।" [তদেব]। এই ভূত আমাদের জীবনে এনেছে ভেদ ও পরবশতা, এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের আয়ুধ হোক শুভবুদ্ধি, যা অনৈক্য, অশিক্ষা, নীচতা ও লোভের শত্রু।

চিত্তশক্তির দৈন্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে দেশে ছড়িয়ে দিলেই দেশের মুক্তি—তাঁর এই পন্থা রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রজীবনে যখনি দেউলেচিন্তার প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, তখনি তার বিরুদ্ধে সবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, নির্ভয়ে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এটাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।) তাঁর কথায়,

> "আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয়কর্তব্য বলে মনে করি নে।"

['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

(আসল কথা, স্বরাজের প্রধান শর্ত, আত্মশক্তির উদ্বোধন। 'স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তারপরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।' [তদেব]

দেশের চিত্তশক্তির দৈন্যের তীব্র নিন্দা করে নির্ভয়ে রবীন্দ্রনাথ এই তীব্র ভর্ৎসনা-বাক্য উচ্চারণ করেছেন,

> "আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—

এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ায় অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্য আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।" [তদেব]

ভারতের স্বাধীনতার দাবি রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে, হিজলী বন্দীশিবিরে রাজবন্দী হত্যার বিরুদ্ধে, মিস র‍্যাথবোনের বিরুদ্ধে খোলা চিঠির জবাবে রবীন্দ্র-কণ্ঠ বারবার গর্জন করে উঠেছিল।

স্বাধীনতার আহ্বান যখন রবীন্দ্র-কণ্ঠে শুনি তখন সমস্ত মন জেগে ওঠে। স্পষ্টভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই, এ কাজের কথা নয়। যে দিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বালাই চাই।"

['কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', কালান্তর]

আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আমাদের চাই—এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বারবার সবল কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। 'নিভৃতে সাহিত্যে রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে' বেরিয়ে এসেছিলেন এই দাবি জানাতে। 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে'—এ কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ['সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ, ১ বৈশাখ ১৩৪৮]

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও কৈশোর ও যৌবন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু খানিকদূর এগিয়েই তিনি সরে যান,—এ ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। এই মতবিরোধের পরিচয় পাই 'সত্যের আহ্বান' (১৯২১), 'সমস্যা' (১৯২৩), 'সমাধান' (১৯২৩), 'চরকা' (১৯২৫) ও 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৯২৯)—কালান্তর-ভুক্ত প্রবন্ধ-নিচয়ে ও 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬)।

নিখিলেশের উক্তি রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি :

"আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হচ্ছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কুমতলব আছে

বলেই বাইরে আমি এমন ভালো মানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি। কেননা, (আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই দেখে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না—চীৎকার করে মা বলে', দেবী বলে', মন্ত্র পড়ে' যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়—তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।) সত্যেরও উপর কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি।"

(আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে নিখিলেশের এই বিশ্লেষণ কালান্তর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার সারাৎসার।) মহাত্মাজির চরকা ও অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগই উত্থাপন করেছেন :

("সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ……তার জন্তে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।) সে কি এই চরকা চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এত কাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে আকৃষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে' একমাত্র করে' চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে'? স্বরাজসাধন-যাত্রার এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে' মানুষকে কি অপমান করা হয় না?"

['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

(১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের উক্তি ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই প্রবন্ধে রাষ্ট্রনীতিবিদ্ রবীন্দ্রনাথের উক্তি একই চিন্তা-প্রসূত। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজির নেতৃত্বের উপর অন্ধ বিশ্বাস না রেখে নোতুন নেতৃত্ব চেয়েছেন। সে নেতৃত্ব কে দেবে?

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদ্যোপান্ত ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন তিনটি প্রবন্ধে—'কংগ্রেস', 'দেশনায়ক' ও 'মহাজাতিসদন'। এই তিনটি একই বছরে (১৯৩৯) লেখা। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় ভারতের রাজনীতিতে ও কংগ্রেসের ইতিহাসে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি নির্বাক দর্শক ছিলেন না। সেই মুহূর্তে নির্ভয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (দেউলে গান্ধী-নেতৃত্বের অবসান ও সুভাষ-নেতৃত্বের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন।)

এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন,

১. 'বর্তমান কংগ্রেস যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢনির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে, তাও সত্য হতেই পাবে না। কোনো দিনই তা না হোক এই আকাঙ্ক্ষা করি।'

['কন্‌গ্রেস' ২০।৫।১৯৩৯]

২. 'এ কথা জানি, যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজিই তারই প্রমাণ। তবু, তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোন কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তা হলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সেজন্য হয়তো অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে।' [তদেব]

৩. 'আজ আমি জানি, বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। ····· তার (বাংলার) অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।' [তদেব]

৪. 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি····· বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।'

['দেশনায়ক']

৫. 'বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়তপরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের দিকে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতিসদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি।' [মহাজাতিসদন]

পরবর্তীকালের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করেছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্লেষণ অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চার

'কালান্তরে' রবীন্দ্র-দর্পণে সমকালের প্রতিবিম্বের চতুর্থ রূপ, আন্তর্জাতিকতার উৎকর্ষ ও জাতীয়তাবাদের অপকর্ষ-প্রতিপাদন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও অনুদারতা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দেশপ্রেম ওরফে আত্মগর্বী জাতীয়তাবোধের উপরে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছেন আন্তর্জাতীয়তাবাদকে। বলেছেন,

"বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারী হয়ে উঠেছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যে দিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনের ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকাযুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।" ['চরকা', কালান্তর']

স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ একথাই লিখেছেন তাঁর Nationalism ভাষণমালায়—

> India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them a country is greater than ideals of humanity.

রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। (জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লেখেন (১৯৩৮)—জাতীয়তার চেয়ে অনেক বড়ো মানবতা ('humanity is greater than nationality')।) মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ এর জন্য দেশে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদেশে রাষ্ট্রপতি উইলসনের বিরোধিতা করেছেন। জাপানে, জার্মানিতে, মার্কিন দেশে এজন্য তিনি যে বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন, তাতে দমিত হন নি। এই অভিমত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করবে,—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই অভিযোগে তিনি কর্ণপাত করেন নি। মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিকূল পরিবেশে সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। 'সত্যের আহ্বান' (১৯২১) ও 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে এই বক্তব্য বিশ্লেষিত ও প্রতিষ্ঠিত।

১. 'ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তীকাল অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কি রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল, তখন এই কথাটা আর লুকানো রইল না। হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোন জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের

সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্য যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎ-জোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের সাধনা।'

['সত্যের আহ্বান']

২. 'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজদের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে।...দৃষ্টান্তস্থলে এনড্রুসের নাম করতে পারি; তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।' ['সভ্যতার সংকট']*

এইসব উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের উপরে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে স্থান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ কালান্তরের কবি; সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কবি নন; উদার বিশ্ব-বোধের কবি।

---

* রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীনবন্ধু এনড্রুজের চিন্তার মিল ছিল অনেক ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি 'বিদেশী' বস্ত্র পোড়ানোর ব্যাপারে গান্ধীজির মতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। দীনবন্ধুর অভিমত এখানে স্মরণযোগ্য: 'There is a subtle appeal to racial feeling in that word 'foregin'. We seem to be losing sight of the great outside world to which we belong and concentrating on India and this must, I fear, lead back to the old, bad, selfish nationalism.' —Charles Freer Andrews.

১৩

মানুষের ধর্ম: রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণ

এক

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ভবন 'আম্রপালি'তে।

"[কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ই অগস্ট তারিখে তাঁর সম্বর্ধনা হয়েছে। কবির আর্থিক অবস্থা অস্বস্তিজনক। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ তাঁকে নিতে হয়; 'কমলা বক্তৃতা' দেবারও আহ্বান পেলেন।"

"১৯৩৩ সাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ অধ্যাপনার—যদিও সত্যকার ক্লাস তাঁকে নিতে হয় নি। কমলা বক্তৃতাগুলি দিলেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল—'মানুষের ধর্ম'। দুই বৎসর পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ডে যে বক্তৃতা দেন এগুলি তারই বাংলা রূপান্তর, বাঙালি সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করে বলা—যথাসাধ্য সহজ করার চেষ্টা করেছেন।" [শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনকথা', ১৩৬৫, পৃ ২১৫-২১৮]

এই প্রসঙ্গে আরো দুটি তথ্য অবশ্যস্মর্তব্য। পঞ্চমবার পশ্চিম গোলার্ধে ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এই পর্যায়ে তিনি ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, সোভিয়েত দেশ, মার্কিন দেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। কবির সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জন্ম-উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে নিবেদিত হয় 'দ্য গোলডেন বুক অভ্‌ টেগোর' (ডিসেম্বর, ১৯৩১)। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে কবি যান পারস্য ভ্রমণে, ফিরে আসেন জুনে। এই সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য রচনা—নবীন (গীতিনাট্য, ১৯৩১), রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণকথা, ১৯৩১), বনবাণী (কবিতা ও গান, ১৯৩১), শাপমোচন (কথিকা ও গান, ১৯৩১), পরিশেষ (কবিতা, ১৯৩২), কালের যাত্রা (নাট্যসংলাপ, ১৯৩২), পুনশ্চ (গদ্যকাব্য, ১৯৩২), গান্ধি প্রসঙ্গে রচিত একটি ইংরেজি ও তিনটি বাংলা ভাষণের সংকলন (১৯৩২), দুই বোন (উপন্যাস, ১৯৩৩), চণ্ডালিকা (নাটিকা, ১৯৩৩), তাসের দেশ (নাটিকা, ১৯৩৩), বাঁশরী (নাটক, ১৯৩৩), ভারতপথিক রামমোহন রায় (প্রবন্ধ, ১৯৩৩)। বনবাণী, দুই বোন ও বাঁশরী ছাড়া বাকি সব রচনাই 'মানুষের ধর্ম' আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। এই তিন বৎসরের (১৯৩১-৩৩) সকল রচনায়

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবোধ সংহতরূপ লাভ করেছে। তাই 'মানুষের ধর্ম' রচনার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশ এবং মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধের প্রতিষ্ঠা বিশেষ লক্ষণীয়। অকসফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট-বক্তৃতা 'রিলিজন্ অভ্ ম্যান'-এর সঙ্গে 'মানুষের ধর্ম'-এর আলোচনায় সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না, বাংলাদেশের নবজাগরণের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবোধের বিকাশের স্তরগুলি অনুসরণ করে সামগ্রিক উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে ঐক্যের উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। তাঁরাই মহাপুরুষ যাঁরা অনৈক্য ও বিভেদ, সংকীর্ণতা ও জড়তা থেকে আমাদের মুক্তি দেন। বুদ্ধদেব থেকে রামমোহন পর্যন্ত মহামানবের ধারা পর্যালোচনা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "বুদ্ধদেব জাতি বর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি।"

['ভারতপথিক রামমোহন']

এই মৈত্রীসাধনায় যে-সব মহাপুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁরা মুক্তিদাতা। চৈতন্যদেব, কবীর, দাদূ, নানক, তুকারাম প্রমুখ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্তদের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার আলোচনা করেছেন, কবিতায় তাঁদের সাধনাকে এনেছেন, বলেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের মনের মুক্তিদাতা।

শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানবাত্মাকে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে জ্ঞানে ও ভক্তিতে পেয়েছিলেন ('ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৯০১), তার বত্রিশ বৎসর পরে, পঞ্চমবার য়োরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের পরে পুনশ্চ-পত্রপুট-রিলিজন অভ্ ম্যান-মানুষের ধর্ম-এর পর্বে সর্বজনীন মানবকে লাভ করেছেন মনন ও বুদ্ধির মাধ্যমে।

য়োরোপ থেকে মানবমুক্তিবাণী ও বিশ্বমৈত্রীমন্ত্র উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালি গ্রহণ করেছিল। সেদিনের বাংলাদেশ মধ্যযুগকে অতিক্রম করে দ্রুত পদবিক্ষেপে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এই যুগান্তরের আবর্তে। রামমোহনের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা এই মুক্তিসাধনার ইতিহাসে অবশ্যস্মর্তব্য। নোতুন মূল্যবোধকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা ও পুরনো মূল্যবোধের বিসর্জনে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সাধনাকে সংহত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ বাঙালি চিন্তানায়ক য়োরোপের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র—সকলেই নবীন পশ্চিম জগতের সঙ্গে শ্রান্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের মিলনসাধনে আগ্রহী হয়েছিলেন। সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসংস্কারে, রাজনৈতিক চেতনায় যতই

বাঙালি সমাজ অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিমের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সংযোগ-সম্পর্ককে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে না রেখে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করলেন আর বললেন,

"তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি, য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে।" ['কালান্তর', ১৯৩৭]

ভারতবর্ষের উপর পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের শুভঙ্কর প্রভাবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্ব-মানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।......পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস।.......এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।..চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করাব অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।"

['বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ', ডিসেম্বর ১৯৩৫, সাহিত্যের পথে]

বর্তমান যুগের বেগবান বন্ধনহীন চিত্তের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এই দৃঢ়তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় একদিনে আসে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মবোধ ও বিশ্ববোধকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই পেয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' রচনায় যে উদার মানবধর্মের

উপলব্ধি, তা রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করতে হয়েছিল। এই সত্য আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না।

বিংশ শতাব্দীর স্থচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মকে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল,

"আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমবা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিবকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার কবিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদেব জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ কবিলে আমাদের পবিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কাবণ মানবসমাজেব উত্তরোত্তব বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানা মাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মেব প্রীতির নিশ্চয়ভাবে অনুভব করতে পাবা আমাদের অনুভূতিব চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তিব স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদেব কর্মপরতার পরম সাফল্য।"

['ধর্মপ্রচার', ফাল্গুন ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ধর্ম, ১৯০৩]

ব্রহ্ম জননীর মতো আমাদেরকে ধারণ করে আছেন,—শতাব্দী-স্থচনায় রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে আশ্রয় করেছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে জীবনে পেতে চেয়েছিলেন। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা [সতেরো খণ্ড, ১৯০৯-১৯১৬] তার পরিচয়স্থল। সেদিন উপনিষদ ছিল ববীন্দ্রনাথের পরম আশ্রয়। "উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল স্থন্দর ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।" [শান্তিনিকেতন ১ ; 'প্রার্থনা', পৃ. ৪০]। সেদিন উপনিষদের

আনন্দরূপের মাঝেই কবি মুক্তির সন্ধান করেছেন। রূপের অন্তরালে যে আনন্দ, তাই মুক্তি। এই চিন্তাটি ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> "প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাব আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে, এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সেই সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায়, তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়েছিল।" [শান্তিনিকেতন ১, পৃ. ৩৮৭]

সেদিন ঔপনিষদিক ব্রহ্মের সাধনা তাঁর কাছে আনন্দের, প্রেমের, অরূপের, অসীমের সাধনা।

শতাব্দী-সূচনাতে প্রাচীন ভারত রবীন্দ্রনাথকে মোহমুগ্ধ করেছিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যে (১৯০১) তিনি প্রার্থনা করেছিলেন,

দাও আমাদের অভয়-মন্ত্র অশোক-মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত-মন্ত্র দাও সে জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যু-তরণ শংকা-হরণ দাও সে জীবন নব।

তখন তিনি মনে করেছিলেন, চিরপুরাতন ভারতবর্ষের উপাসনায় আমাদের মুক্তি। তাই 'স্বদেশ' গ্রন্থে (১৯০৮) লিখেছিলেন, "অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব।" ['নববর্ষ', ১৩০৯]

অথচ পরবর্তী তিন দশকে তাঁর জীবনবোধ এতো গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেল যে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জীবনসাধনা তথা ধর্মসাধনার অন্যতর উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে,—এই সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছলেন জীবনের শেষ দশকে। 'মানুষের ধর্ম' এ সময়েই রচিত।

দুই

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যেদিন স্থাপনা করেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল ছাত্রদের প্রাচীন ভারতবর্ষের আশ্রমের ধাঁচে জীবনযাত্রায় ও শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমিকেরা নিযুক্ত হবে, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিলাষ। পরবর্তী কয়েক বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মন কোন্ পথে চালিত হয়েছিল, তা জানা যায় 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা' (১৯০৯-১৯১৬) পাঠে। তপোবনের আদর্শচিত্র বাস্তবের নয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তার স্থিতি। কিন্তু ১৯০১ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ : এই বিশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের এই সব ধারণায় গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের স্থানে স্থাপিত হল বিশ্বভারতী (১৯২০)—তা বাঙালির নয়, হিন্দুর নয়, তপোবনকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতের নয়, তা বিশ্বের, আধুনিক কালের। বিশ্বভারতীতে বিশ্ব এসে নীড় বাঁধলো ('যত্র বিশ্ব ভবত্যেকং নীড়ং')—রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধে গুরুতর পরিবর্তন ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বার য়োরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। প্রথম (১৮৭৮-৮০) ও দ্বিতীয় বার (১৮৯০) য়োরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ ও তিরিশ বৎসরের যুবক। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (১ম খণ্ড ১৮৯১, ২য় খণ্ড ১৮৯৩) এই দুই ভ্রমণের ফসল। দ্বিতীয়বার য়োরোপ ভ্রমণের পরই রবীন্দ্র-প্রতিভা স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হল, 'মানসী'-র কবি ও গল্পগুচ্ছের লেখককে আমরা পেলাম। তারপরেই 'সাধনা' পত্রিকায় কবি গদ্য-পদ্যের জুড়িগাড়ি হাঁকাতে শুরু করলেন, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় রবীন্দ্র-প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার য়োরোপ ভ্রমণে (ও এই প্রথম মার্কিন দেশ ভ্রমণে) গেলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, ফিরলেন ১৯১৩-র অক্টোবরে। এই যাত্রায় জাহাজে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা করেন, পশ্চিমের মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হন, নোতুন পৃথিবী আমেরিকার সঙ্গে পরিচয় সাধিত হয়। ফিরে আসার পরই সংবাদ এলো (১৫ নভেম্বর, ১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি কাব্য 'সং-অফারিংস্'-এর জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে য়োরোপ-আমেরিকা থেকে লিখিত পত্রাবলী তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অনেক পরে 'পথের সঞ্চয়' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৩৯)। ফিরে আসার পরই রবীন্দ্র-সাহিত্যে পালা বদল হয়,—বলাকা, ঘরেবাইরে, চতুরঙ্গ, ফাল্গুনী, গল্পসপ্তক প্রকাশিত হয় (১৯১৬)।

নানাকারণে 'পথের সঞ্চয়' পত্রাবলী মূল্যবান। এই তৃতীয়বার পশ্চিমজগৎ ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্র মানস-দিগন্তরেখা বিস্তৃত হল, অনেক পুরনো মূল্যবোধ ও ধারণা বর্জিত হল, নোতুন মূল্যবোধ দেখা দিল। 'য়ুরোপের অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি' এই যাত্রায় কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'স্বদেশ' প্রবন্ধগ্রন্থে চল্লিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ য়োরোপকে জড়বাদী বলেছিলেন, আজ বাহান্ন বৎসর বয়সে য়োরোপের আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন তার যৌবনচাঞ্চল্যে, আত্মত্যাগেচ্ছায়, জীবনের প্রাচুর্যে ও বিপদ বরণের আগ্রহে। য়োরোপের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে বিরুদ্ধপক্ষের উদ্দেশ্যে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন,—

> "আত্মত্যাগের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই? এটা কি ধর্মবলেরই একটি লক্ষণ নহে? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে? আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না?" ['যাত্রার পূর্বপত্র', আষাঢ় ১৩১৯, পথের সঞ্চয়]

য়োরোপীয়দের জীবনচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব।……যে-শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—দুর্লভের রুদ্ধদ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে। এই-যে উদ্যত শক্তি, যাহার একদিকে ক্রীড়া ও অন্যদিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর।" ['খেলা ও কাজ', তদেব]

বিশ্বমানবতাবোধের পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই পর্বেই। ব্রহ্মোপলব্ধি বা কল্পনাসর্বস্বতায় নয়, নিতান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলনের আবশ্যকতা তিনি এই সময়েই উপলব্ধি করেছেন। কেমব্রিজের অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্‌সন ও অধ্যাপক রাসেল, চিন্তানায়ক এইচ জি. ওয়েলস ও রেভারেণ্ড এন্‌ড্রুস, সঙ্গীতবিদ্ ডাক্তার ইয়র্কট্টার ও চিত্রবিদ্ রোদেনস্টাইন, কবি ইয়েটস্ ও দার্শনিক অয়কেন্-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তিনি এই উপলব্ধিতে উপনীত হন। কেমব্রিজের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানে নিশীথে অধ্যাপক ডিকিনসন ও রাসেলের

সাহচর্যে ও আলাপে মানবতার বিচিত্র ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করে লিখেছিলেন,

"মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানাপথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠে কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।"

['ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ', তদেব]

রবীন্দ্রনাথ য়োরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। বস্তুতঃ এ তাঁর কেবল ঘরে ফেরা নয়, মানুষের দিকে ফেরা। এখানেই 'মানুষের ধর্ম'-এর যথার্থ সূচনা। রবীন্দ্রনাথ এখন থেকে অধিকতর বাস্তব-সচেতন হলেন, আধুনিক যুগের মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যে রূপ দিলেন, জীবনকে আরো গভীরভাবে গ্রহণ করলেন, জীবনের রুক্ষ কঠোর দৈন্যপীড়িত ছবির সম্মুখীন হলেন; সর্বকালীন মানবের সন্ধানে বার হলেন, বিশ্বমানবতাবোধের পথে যাত্রা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আবার বিদেশে যান ১৯২৪-২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এবারে গন্তব্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু। কিন্তু পেরু পৌছতেই পারলেন না, শরীর বিগড়ে যাওয়ায় আর্জেন্টিনার বুয়োনোস এইরেস্ নগরের নিকটবর্তী সান্ ইসিদ্রোতে কয়েকমাস অসুস্থ শরীরে কাটান। যাওয়ার পথে ফ্রান্স ও ফেরার পথে ইতালি ছুঁয়ে কবি ফিরে আসেন। কবির এই খণ্ডিত দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণের ফলে বাংলাভাষা পেল দু'খানি বই, 'যাত্রী' ও 'পূরবী', আর কবি পেলেন এক বান্ধবী শ্রীমতী বিজয়া ওরফে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। সান্ ইসিদ্রোতে এঁরই বাগানবাড়িতে কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাবলয় বিস্তীর্ণ হল এই ভ্রমণের ফলে।

রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার য়োরোপ ভ্রমণে গেলেন ১৯২৬-এর জুনে। ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাবিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ঘুরে কাইরো হয়ে সাতমাস পরে দেশে ফেরেন (ডিসেম্বর, ১৯২৬)। এই ভ্রমণকালে লিখিত পত্রধারা 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

মালয় ও পূর্বদ্বীপাবলীতে ভ্রমণ (১৯২৭) ও কানাডা ও জাপান ভ্রমণ (১৯২৯)—এ দুয়ের আগে পরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'শেষের কবিতা', 'মহুয়া', 'কণিকা', 'তপতী' আর আঁকেন ছবির পর ছবি।

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম ও শেষবার য়োরোপ ভ্রমণে যান ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে ও য়োরোপে তাঁর ছবির প্রদর্শনী করতে। পারীতে বার্লিনে ছবির প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হয়। অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেন, তা 'রিলিজন অভ্ ম্যান' নামে মুদ্রিত হয়। জার্মেনি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড হয়ে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সোবিয়েত দেশ ভ্রমণে—অনেকদিনের সংকল্প কাজে পরিণত হল। সেখান থেকে ফিরে বার্লিন হয়ে উত্তর আমেরিকায় মার্কিন দেশে চললেন। সেখান থেকে ফিরে লণ্ডন হয়ে সোজা দেশে ফিরলেন। এই সফরের ফল 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'রিলিজন অভ্ ম্যান'। দেশে ফিরেই লিখলেন 'মানুষের ধর্ম' ও 'পুনশ্চ'।

লক্ষণীয়, প্রতিবারের বিদেশ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে নোতুন প্রেরণা। তাঁর অভিজ্ঞতার বলয় ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে, অনেক আঁধার অপসৃত হয়েছে, পশ্চিমী জগতের জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে।

বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ ১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত এইসব গ্রন্থ—পূরবী, রক্তকরবী, লেখন, যাত্রী, পথে ও পথের প্রান্তে, রাশিয়ার চিঠি, কালের যাত্রা, পুনশ্চ, মানুষের ধর্ম, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, রিলিজন অভ্ ম্যান, গান্ধী-প্রসঙ্গে লিখিত একটি ইংরেজি ও তিনটি বাংলা ভাষণ (মহাত্মাজি অ্যাণ্ড দ্য ডিপ্রেসড্ হিউম্যানিটি), ভারত-পথিক রামমোহন রায়। এবং পরবর্তী রচনা—পত্রপুট, শ্যামলী, সাহিত্যের পথে, কালান্তর।

তিন

জাগরণ ও আত্মোপলব্ধির অর্থ যদি এই হয় যে, ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ থেকে সত্তর—জীবনের এই তিরিশ বৎসর কেবলই ভেঙেছেন, নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্মসমাজ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা—সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁচেছে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি। 'মানুষের ধর্ম' এই সত্যোপলব্ধির পরিচয়স্থল। শেষদিকে গল্প-উপন্যাস-

কবিতা ও ছবিতে রবীন্দ্রনাথ যেরকম দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে মননপন্থী ও অমূর্তবাদী হয়ে উঠেছিলেন, সমাজচিন্তা তথা মানবচিন্তার ক্ষেত্রে সেরকম অগ্রসর হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নবজাগরণের ফলে বাঙালি বিশ্বপথে আত্মসন্ধানে বেরিয়েছিল। সে-সন্ধান সার্থকতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথে। তিনি বাঙালিকে বিশ্বপথিক-ধর্মে তথা মানবধর্মে পূর্ণদীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সকল লেখায় রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম পূর্ণতা পেয়েছে।

তৃতীয়বার য়োরোপ ভ্রমণকালে লিখিত পত্রাবলী 'পথের সঞ্চয়'। 'বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণ' রক্ষার জন্যই কবি বারবার পৃথিবী পরিভ্রমণে বার হন, একথাটি 'যাত্রার পূর্ব-পত্রে' বলেছেন। য়োরোপ-যাত্রাকে তিনি বলেছেন তীর্থযাত্রা, সত্যের সন্ধানে যাত্রা।

"পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।···

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?······ ···

একথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।·············

য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না; অনেকে বলিয়া থাকেন ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না?

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে তাহার একটা আত্মা, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।

য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।" ['যাত্রার পূর্বপত্র', আষাঢ় ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পথের সঞ্চয়]

য়ুরোপের আত্মত্যাগের সংকল্প ও প্রবৃত্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ধর্মবল ও আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য করেছেন, আমাদের সমাজজীবনে তার শোচনীয় অনুপস্থিতি দেখে দুঃখ পেয়েছেন। আত্মত্যাগের ব্যাকুলতা ও সংকল্প আমাদের দেশে কম, স্বার্থপরতা ও আচারগত সংকীর্ণতা বড় বেশি,—এটি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হয়েছেন। তাই বলে কি আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতা নেই?

"এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ডপদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।" [তদেব]

রবীন্দ্রনাথের বারবার ভ্রমণের তাৎপর্যটি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতবাসীর য়োরোপযাত্রা তীর্থযাত্রা বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম ও শেষবার য়োরোপ ভ্রমণের পরে লিখিত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তাঁর বিশ্ববোধ ও মানবমৈত্রী পূর্ণতা লাভ করেছে কেন, তা এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা।

তার সূচনা তৃতীয়বার য়োরোপভ্রমণে। তার স্পষ্ট ইঙ্গিত 'পথের সঞ্চয়ে'—'যাত্রার পূর্বপত্রে' সেকথা রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি বলেছেন।

"আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহেই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। ...

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আন্তররূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।" [তদেব]

য়ুরোপের এই ধর্মবল প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মত্যাগের সংকল্পে ও প্রবৃত্তিতে, দুর্জয়কে জয়ের নেশায়, দুঃখ ও বিপদবরণের সাহসিকতায়, জ্ঞানের অন্বেষণে, দুর্গতি মোচনের সাধনায়, ব্যক্তির মুক্তিতে—একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি লক্ষ্য করি 'মানুষের ধর্মে'—সেখানে বিচিত্রের বন্দনা, সর্বজনীন সর্বকালীন মানবের বন্দনা। 'পুনশ্চ' কাব্যে তারই জয়গান শুনি—'জয় হোক মানুষের'। শিশুতীর্থ কবিতায় এই সত্যোপলব্ধি কাব্যরূপ পেয়েছে।

> "তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপ যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি।···যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলে-কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই য়ুরোপও বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না।·· সত্যের দায়িত্বকে বীরের ন্যায় সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং বুদ্ধি হৃদয় ও কর্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাধারা ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপ যাত্রা কখনোই নিষ্ফল হইতে পারে না। অবশ্য, যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।" ['যাত্রার পূর্বপত্র', পথের সঞ্চয়]

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের যথার্থ ভূমিকা।

চার

অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট-বক্তৃতায় ('রিলিজন অভ্‌ ম্যান') মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত ও বাংলার বাউলদের মানবসাধনা তথা আত্মান্বেষণ-কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্বকে আপন জীবনের প্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'সুপ্রীম্ পার্সন' বা মহামানবকে তিনি মানব-সংসারেই পেতে চেয়েছিলেন। যুক্তি ও বিজ্ঞানসত্যের আলোকে তিনি বিশুদ্ধ রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'মানুষের

ধর্ম' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা-বক্তৃতা) ও 'পুনশ্চ' কাব্যে এই বক্তব্যেরই প্রতিষ্ঠা, রজ্জব, কবীর, দাদূ, রামানন্দ, নাভা, রবিদাস, নানক ও বাংলার বাউলদের জীবনসাধনাকে তিনি 'পুনশ্চে' কাব্যরূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে অন্ত্যজদের মধ্যে মানব-ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও অন্ধতাকে, সমালোচনা করেছেন সংকীর্ণতা ও আচারানুগত্যকে। 'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটিকায় শূদ্রদের কবি যে সম্মান দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি মানবদেবতাকে শূদ্রের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হার মানার পর শূদ্র হাত লাগাতেই রথ চলতে লাগল। এই সংকেত-কাহিনীতে মানবধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। আর 'মানবপুত্র' ও 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটিতে বৃহৎ মানব-মহিমাকে কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে।

মানবসত্যের সঙ্গে সংসারের সত্যের বিরোধ বাধে, এই বিরোধে মানবসত্যের পক্ষাবলম্বন যে করে, তারই জীবন সার্থক, একথা 'মানুষের ধর্মে' রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথায়—

"রজ্জব বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো চ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রুঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তা'ই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে ; রজ্জব বলেছেন, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব্ বুঝেছেন, একথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে—মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরি দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরি সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।"

সর্বজনীন মানবতাবোধের পরমতীর্থে উপনীত হওয়াই আজকের মানুষের সাধনা : রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের এ-ই পরম সত্যোপলব্ধি। এই সত্যকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম' ভাষণমালার ভূমিকায়—

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার

আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনবীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্ম-প্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।" [১৮ মাঘ, ১৩৩৯]

এই সর্বকালীন মানবকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মগ্রন্থে বা আচারানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেন নি, অন্ত্যজ মানুষের হৃদয়েব অমেয় ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবমহিমার বন্দনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, মানবাত্মার সর্বশেষ মন্ত্রটিও উচ্চারণ করেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হ'ল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে
আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষ
আর মনের মানুষ আমার অন্তরতম আনন্দে। [পত্রপুট]

'মানুষের ধর্ম' তিনটি ভাষণের সংকলন। এই ভাষণমালার প্রধান গুণ, চিন্তার মুক্তি—তার স্বচ্ছতা, নিরাবিলতা, প্রাখর্য। বেদ উপনিষদ থেকে প্রাপ্ত সত্যকে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের মর্মসত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। মানুষের জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই অন্বেষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তরে প্রত্যাবর্তনকে পরমাপ্রাপ্তি বলে উপলব্ধি করেছেন :

"আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যতকিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায়

দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেন পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেন—

তোরই ভিতর অতল সায়র।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে: আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।"

[মানুষের ধর্ম]

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম জীবনবিচ্ছিন্ন সত্য নয়, কাব্যবিচ্ছিন্ন উপলব্ধি নয়। তিনি যে বিশ্বদেবতাকে জেনেছেন, তার কথা 'মানবসত্য' ('মানুষের ধর্ম'এ সংযোজন) রচনায় বলেছেন:

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসান, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই 'মনের মানুষ', 'পরম মানব'; 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব', 'সুপ্রীম পার্সন', 'সর্বমানুষের জীবনদেবতা'—এঁকে তিনি কোথায় পেয়েছেন? অমানবে? অতিমানবে? জীবনবর্জিত সংসারবর্জিত ক্ষেত্রে?

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'মানবসত্য' রচনার উনশেষ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই বলেছেন :

"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্যকিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই মানবপ্রীতি তাঁর জীবনের শেষ উপলব্ধি। এই মানবানুগত উপলব্ধির পটভূমে 'মানুষের ধর্ম' ভাষণমালা বিচার্য। আধুনিক পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার শেষ পর্বে মানুষকে অস্বীকার করেন নি, মানুষকেই জীবনের সকল সাধনার লক্ষ্যস্থল বলে স্বীকার করেছেন। এখানেই আধুনিক কাল ও বিশ্বমানবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

১৪

রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্প

এক

যে মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত তা কবিত্বশক্তি। এই শক্তি তাঁকে কখনোই ত্যাগ করে নি, তার ফলে তাঁর সকল রচনায় কবিত্বের দীপ্তি ও যৌবন অনিবার্যরূপে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে কবিত্বের পটভূমিতেই দেখতে হয়। ছন্দ তাঁর মজ্জাগত, স্টাইল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, রম্যতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মুকুরে আধুনিক বাঙালির মনের ছায়া পড়েছে। গদ্যে তিনি ছন্দস্পন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্র-গদ্যের মধ্যে যে প্রবহমানতা বর্তমান, তাতে দ্রুতি ও বৈচিত্র্য, গাম্ভীর্য ও তরলতা, সরলতা ও ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে, তার উৎস রবীন্দ্রনাথের কবিমন। পদ্যছন্দকে তিনি গদ্যে চালিয়ে দেন নি, গদ্যের প্রাণস্পন্দনকেই তিনি দ্যুতি ও ঐশ্বর্যদান করেছেন। তাই গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী—এ দুজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত নন। তিনি বাংলা গদ্যের অশেষ বৈচিত্র্য ও রহস্যের স্রষ্টা। বোধ করি এই অর্থেই শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য 'মহাকবির গদ্য, সুতরাং কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।' অর্থাৎ মহাকবির প্রতিভার স্পর্শে গদ্যশিল্পের একটি অভিনব রূপ প্রকাশিত হয়েছে, পদ্যের অমিল কাটা-কাটা অনিয়মিত শব্দপরম্পরা গদ্যরূপে এখানে উপস্থিত হয় নি। সে-কারণে 'বিশ্বপরিচয়', 'বাংলাভাষা পরিচয়', 'লিপিকা', 'ছন্দ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'সে', 'তিন সঙ্গী', 'যাত্রী' এবং নানাবিধ সমাজ-শিক্ষা সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি বিষয়ক গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের বিচিত্র বিভূতির পরিচয় দিয়েছেন। গদ্যের ছন্দস্পন্দনকে নানারূপে পরীক্ষা ও ধ্বনিমাধুর্যকে নানারূপে উদ্ভাবন করেছিলেন প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ—'লিপিকা'য় তার সূচনা, 'তিন সঙ্গী'তে পরিণতি। সমস্তটা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য—তা তীব্র, গভীর, কোমল, কঠিন, চতুর, সরল, সর্বোপরি বিচিত্র বৈভবে সমৃদ্ধ।

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন, কিন্তু গদ্যরাজ্যে তা ঘটেনি। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকেরা জানেন কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' একজন লুব্ধ পাঠক ছিলেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধ এ দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে বঙ্কিমের উপন্যাস ও প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রভাব যেমন প্রকট তেমনই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) ও 'আলোচনা' (১৮৮৫)—কিশোর রবীন্দ্রনাথের এ দু'টি প্রবন্ধ-পুস্তকে বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ'এর প্রভাব তেমনই প্রকট। এই প্রভাব কেবল বিষয়-বস্তুতে নয়, প্রকাশভঙ্গীতে—ভাষায়, আঙ্গিকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে উপন্যাস ও প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মূলতঃ বঙ্কিমী ভাষা। পদ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, তা'তে আমাদের চমকে উঠতে হয়। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য আমাদের উনিশ-শতকী কাব্য-ঐতিহ্যের অনুগত নয়, তাকে সে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে প্রথম দিকে ব্যস্ততা ছিল না, ছিল মন্থরতা ও রক্ষণশীলতা—বঙ্কিম-প্রবর্তিত পথেই তিনি অনেকদিন চলেছেন। কিন্তু এটাই রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্ব সম্পর্কে শেষ কথা নয়। বঙ্কিম-অনুসারী রক্ষণশীল সাধু গদ্য তিনি অর্ধ-জীবন ভোর ব্যবহার করেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে। প্রাক্-'সবুজপত্র' পর্ব পর্যন্ত এই সাধু ভাষার অন্তরালে আরেকটি ধারা রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছিলেন—তা মুখের ভাষা—সাহিত্যে যা ছিল বিপাংক্তেয়। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আঠারো বছর বয়সে; আর 'ছিন্নপত্র' (১৮৯৪) রচনা করেন চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে; এগুলি জনসমক্ষে প্রচারের কথা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ একবারও ভাবেন নি, তাই এই পত্র-গুচ্ছে তিনি 'স্বাধীনভাবে' মনের কথা মুখের ভাষায় লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিধা ও সংকোচ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন 'সবুজপত্রে' (১৯১৪)। চলিত ভাষাকে তিনি সকল কাজের জন্য বরণ করে নিলেন; দীর্ঘ তিরিশ বছরের (১৮৮৩-১৯১৪) টানা-পোড়েন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রূপ ছিল কি রকম? 'ভারতী' পত্রিকায় বাংলা ১২৮৮-৮৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—এ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গদ্যের রূপ ও স্টাইল—এ দুইই লক্ষ্য করা যাবে।

> "ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে, ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে, হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।
>
> যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না।" ['মনের বাগান বাড়ি']

তারপর 'ভারতী' পত্রিকায় বাংলা ১২৯১-৯২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'আলোচনা' (১৮৮৫) পুস্তক হইতে 'ডুব দেওয়া' শীর্ষক প্রবন্ধের 'এক কাঠা জমি'-র কয়েকটি ছত্র লক্ষ্য করা যাক।

> "একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেখানে ততই অনুরাগ সূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষেতেমনি। লোক হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবলমাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুন তাঁহার নিকট কোন জিনিসের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না।"

আর একটি প্রবন্ধ-সংকলন 'সমালোচনা'-র (১৮৮৮, ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮-৮৯ সালে প্রকাশিত) একটি পুস্তক-সমালোচনা গ্রহণ করি। 'ডিপ্রোফণ্ডিস্' (ভারতী : আশ্বিন, ১২৮৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "টেনিসন এই কবিতাটিকে The Two Greetings কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুইভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া, দ্বিতীয়ত তাঁহার আপনাকে তফাত করিয়া। এক তাঁহার মর্ত্যজীবন ধরিয়া আর এক তাঁহার চিরন্তন সত্তা ধরিয়া। একটিতে তাঁহাকে আংশিকভাবে দেখিয়া আর-একটিতে তাঁহাকে সর্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইভাগ দেখিতে পাইয়াছেন ; একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন, আর একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের, দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির।" ['এক কাঠা জমি']

এটি পড়লেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সাধু-গদ্য রচনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন— ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্য ও ক্রিয়াপদের বিরলতা এই লেখাটিকে গতি দিয়েছে।

'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে ছোট ছোট বাক্যের সাবলীল গতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটি প্রবন্ধে গুরুগম্ভীর দীর্ঘ বাক্য আছে। 'লিপিকা'র যে স্টাইল তার খানিকটা আভাস পাই 'আলোচনা' গ্রন্থের (১৮৮৫) 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে। সুন্দরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, তাহার কোনখানে বিরোধ-বিদ্বেষ নাই। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল! এই মিলই সুন্দরের নির্যাস। যাহাতে মিল নাই, তাহা সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর তাহার হাতের সাধারণের

সহিত আশ্চর্য মিল আছে। আমাদের মনই সৌন্দর্যপিপাসু। এইজন্য সুন্দরকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। এখন যাহাদের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ নাই, তাহাদের জন্য কে চেষ্টা করিবে? কবি।—তাঁহার কাজই হইতেছে আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া।"

ধর্ম-সম্পর্কিত রচনায় দেখা যায়—পরবর্তী 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধধারার ভূমিকা রচিত হয়েছে এই বঙ্কিমী স্টাইলের অনুসারী সাধু গদ্যে। শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত (৮ মাঘ, ১৩০৭ সাল) 'ব্রহ্মমন্ত্র' অভিভাষণের (১৯০০) কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি।

> "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে—সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সে ধর্মের লীলা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসার সুখের জন্য—আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ সম্ভব হয়।"

এই ভাষণে দেখি দীর্ঘ পল্লবিত একাধিক বাক্যাংশযুক্ত সাধু বাক্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ শক্তি নিয়োগ করেছেন। বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর লেখকদের ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্যে এই লক্ষণটি ধরা পড়ে।

গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সকল গল্পই সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু এই সাধুভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা'র রচনাকাল কার্তিক, ১২৯১ সালে (১৮৮৪)। দ্বিতীয় গল্প 'রাজপথের কথা' অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সালে লেখা। এ দুয়ের ভাষণ বঙ্কিমী সাধু ভাষা—গুরুগম্ভীর, মন্থরগতি সংলাপ অংশও সাধু ভাষায়। 'ঘাটের কথা'র প্রথম কয়টি ছত্র দেখা যাক: "পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিত। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।"

এরপর রচিত গল্প তৃতীয় গল্পটি—'দেনাপাওনা'র রচনাকাল ১২৯৮ সাল (১৮৯১ খ্রীঃ)। এই গল্পের ভাষাও সাধুভাষা, কিন্তু এ ভাষা কত সাবলীল, কত

স্বচ্ছন্দগতি, কত ভারমুক্ত। গোড়ার কয় ছত্র দেখুন: 'পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ-কার্তিক-পার্বতী তাহার উদাহরণ।"

এর পর থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ গল্পগুচ্ছের সকল গল্পই সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু দিনে দিনে তা' আরো সাবলীল ও স্বচ্ছন্দগতি হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

১. "লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নব-শীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য—এবং সৌন্দর্যের অরুণ পাণ্ডুরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন নদীকূল-লালিত অম্লান প্রফুল্ল কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।"

[রাজটীকা; আশ্বিন, ১৩০৫]

বঙ্কিমী অনুপ্রাস ও সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর এখানে আছে। কিন্তু এর সাবলীল গতি অক্ষুণ্ণ আছে।

২. "আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন বেদুইন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমায় সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেন শা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান

হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!"

[ক্ষুধিত পাষাণ, শ্রাবণ, ১৩০২]

এখানে শব্দ ও অলঙ্কারের মেলা বসে গেছে। এই সুপ্রচুর আড়ম্বরের মধ্যে থেকে সাধু গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ কী অনায়াসগতিতে চালনা করেছেন, তাই এখানে লক্ষণীয়।

৩. "ঘাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরাম অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়-প্রকাশের অবকাশ দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।"

['সমাপ্তি', আশ্বিন, ১৩০০]

এখানে সন্ধি ও সমাসের ঘটা আছে। দীর্ঘ বিশেষণের বহুল ব্যবহার ঘটেছে, তথাপি এর স্বচ্ছন্দ গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি।

৪. "হায়, ভুল বলিয়াছিলাম! তুমি আমার আছ, একথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটি আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোন জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।"

['দৃষ্টিদান', পৌষ, ১৩০৫]

এখানে শব্দের ঐশ্বর্য বা সমাসের বাহুল্য নেই, সাধু গদ্যের ক্রিয়াপদকে রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু এর চাল চলতি ভাষার চাল।

গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত এই চারটি উদাহরণের ভাষা সাধু ভাষা। এগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। সন্ধি-সমাসের বাহুল্য আছে, কিন্তু তা গদ্যের গতিকে মন্থর করে নি। বিশেষণ ও উপমা অজস্র আছে। দীর্ঘ বিশেষণ ও দীর্ঘ উপমা—দুই-ই রবীন্দ্রনাথ অনায়াস নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বিশেষণগুলি অনিবার্য, উপমাগুলি একান্ত স্বাভাবিক। স্তরে স্তরে উপমা রবীন্দ্রনাথ চয়ন করেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর উদ্ধৃত অংশটিতে লক্ষ্য করা যায় বাক্যাংশের পর বাক্যাংশে কেমন অনায়াসে একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা পুরোপুরি ব্যবহার করলেন সর্বপ্রথম 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে (শ্রাবণ, ১৩২১)। যখন 'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকেই মেনে নিলেন, এ গল্প সেই সময়ে—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

দুই

এই চলতি ভাষাকে গ্রহণ করার পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছিল? তা কি বাইরের তাগিদ—প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহ, না অন্তরের তাগিদ? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের সূচনায় এ কথা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে চলতি ভাষার চর্চা করেছেন। যখন 'আলোচনা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি বঙ্কিমী ভাষায় লিখছেন, তখন প্রকাশ্য সভায় নয়, বৈঠকখানায় ও চিঠিপত্রে—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্নপত্র'-এ চলতি ভাষাকেই মেনে নিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) তাঁর চলতি ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস, কিন্তু কোনমতেই প্রথম রচনা নয়। এর আগে তিনি লিখেছেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' (১৮৯১), 'ছিন্নপত্র' (১৮৯৪), 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালা, 'গোরা' উপন্যাসের (১৯১০) সংলাপের অংশ; হাস্যরচনা ও কৌতুক নাট্যগুলি, অচলায়তন (১৯১১) পর্যন্ত নাটক। 'সবুজপত্র' এ ক্ষেত্রে মূল প্রেরণাস্থল নয, তা নিমিত্ত মাত্র। এই চলতি ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ইতঃপূর্বেই ঘটেছে। আঠারো বছর বয়সে লেখেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লেখেন পঞ্চাশ পেরিয়ে। এই সুদীর্ঘকাল তিনি উপরিউক্ত গ্রন্থগুলিতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে, আচার্যরূপে প্রদত্ত ভাষণে ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট লিখিত পত্রগুচ্ছে এই চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই সাধনার পরিপূর্ণ ফল আমরা পেলাম। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার প্রথম সরকারী সাহিত্য রচনা (নাটক বা কৌতুক বাদ দিয়ে)। এই উপন্যাস থেকে শুরু হল নোতুন যাত্রা। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যে সাধুভাষাকে তিনি ব্যবহার করে এসেছেন, এখানে তা অবলীলাক্রমে ত্যাগ করলেন। অভ্যস্ত প্রথাকে বর্জন করতে এতটুকু বাধলো না, আর কোনদিন—জীবনের শেষ পর্যন্ত বাকি তিরিশ বছর—আর কখনো পিছন ফিরে তাকালেন না। চলতি ভাষাকে বরণ করে ঘরে তুললেন, তা কি শুধু 'সবুজপত্রে' লেখার তাগাদায়? তা নয়; বাইরের তাগাদা হলে তা দুদিনে ফুরিয়ে যেত; জীবনের তিরিশ বছর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলবার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ নিজের ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের নির্মাতারূপে দেখা দিলেন। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) থেকে 'সভ্যতার সংকট'

(১৯৪১) অন্তিম ভাষণ এই পর্ব সযত্নে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে চলতি ভাষাকে সাহিত্যের চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চলতি ভাষা কাকে বলে? সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষার পার্থক্য কোথায়? তা কি শুধু ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের রূপ পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে? রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে এই প্রশ্নের জবাব দিলেন, প্রমাণ করলেন ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের রূপ পরিবর্তনের উপর সাধু ও চলতি ভাষার প্রভেদ নির্ভর করে না। তিনি প্রমাণ করলেন, দুয়ের স্বকীয় চাল, বাগভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য আছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬) আর একদিক দেখা গেলো। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা পরীক্ষা আলোচনার আগে তাঁর প্রাক্-সবুজপত্র পর্বের চলতি ভাষার দু একটা নমুনা নেওয়া যাক।

আঠারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (বাং ১২৮৮ সাল, ইং ১৮৮১ খ্রীঃ প্রকাশিত) লিখেছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল, কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই। ···আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" এ প্রসঙ্গে পরে ২৯শে অগস্ট, ১৯৩৬-এ কবি বলেছেন: "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর সপক্ষে একটা কথা আছে—সে হচ্ছে এর ভাষা! নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হ'ল প্রায় ষাট। সে ক্ষেত্রে ত আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দাখিল করবো না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।" এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে একে হাজির করতে লেখকের আপত্তি ছিল এই জন্যে যে, চিঠির ভাষা ও মুখের ভাষা এক হওয়া প্রয়োজন, একথা স্বীকার করলেও প্রকাশ্য সাহিত্য দরবারে এই চলতি ভাষার ঠাঁই হতে পারে—তা তিনি ভাবেন নি। সে কথা ভেবেছিলেন পরে—'ছিন্নপত্রের' আমলে—দশ বছর পরে—সে চিঠিগুলিকে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত করতে তিনি ইতস্তত: করেন নি। এখন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের' তৃতীয় পত্র থেকে একটু তুলে দিচ্ছি—চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতা দেখাবার জন্য। একটি বল-নাচের বর্ণনা: "নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে মনে করো

চল্লিশ পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠছে। একটা নাচ শেষ হলো বাজনা থেমে গেল, নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল-মিষ্টান্ন-মদিরার আয়োজন, হয়তো আহার পান করলেন, না হয় দু'জনে নিভৃতে কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারিনে, সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না।"

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' পুস্তকে (১৩২১ বাং, ১৮৯১ ইং) য়ুরোপের উদ্দেশে যাত্রার সূচনায় ২২শে অগস্ট, ১৮৯১ তারিখের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> "তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্ছে; মনে হলো আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী—সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত ব্যাকুল বাহু বিক্ষেপ করে ডাকছেন, বলছেন, আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাসনে; এখনো ফিরে আয়। ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই, দূরে লাইটহাউসের আলো জ্বলে উঠল। সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্য ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।"

'ছিন্নপত্রে' জানুঅরি, ১৮৯১ তারিখ-অঙ্কিত কালীগ্রাম থেকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "এই যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার

শস্যক্ষেত্র, স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে সমস্ত দরিদ্র সত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য সে করেছে।"

শিলাইদা থেকে ২১শে জুলাই, ১৮৯২ তারিখের এক পত্রে লিখছেন :

"কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁছেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি, নদীর যে রোখ, যেন লেজ দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো, গতি গর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে – এই খেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি, এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে কী আর বলব। ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হোতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব।"

প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বের চলতি ভাষায় রচনার আর দু-একটি উদাহরণ পরীক্ষা করা যাক্। পূর্বধৃত উদাহরণগুলি চিঠিপত্র, তা প্রকাশ্য সাহিত্যসভার জন্য উদ্দিষ্ট নয়, একথা স্মর্তব্য। 'স্বদেশ' গ্রন্থের (১৯০৭) 'নূতন ও পুরাতন', 'শিক্ষা' (১৯০৮) গ্রন্থের 'শিক্ষার মিলন', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের (১৯০৭) 'নানা কথা', এবং 'শান্তিনিকেতন' (১৯১০) ভাষণ সঙ্কলনের 'শ্রাবণসন্ধ্যা'—অন্ততঃ এই চারটি প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার আধারেই উপস্থিত করেছেন।

'নানাকথা' প্রবন্ধে (১২৯২ বাং, ১৮৮৫ ইং) রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে, মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়, তার গন্ধে, তার গানে। অতীতকালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আসে ; বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয় এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ , এর মধ্য দিয়ে মানুষ রঙ পায় সুর পায় আপন চিরন্তন মনের। তাই যখন শুনি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানু' দেখা যেত, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পূর্বপুরুষদের চিত্ত অনুভব করি, তাঁদের সেই মেঘ দেখার সুখ আমাদের সুখের সঙ্গে যুক্ত হয় ; বুঝতে পারি, যাঁরা গেছেন তাঁরাও আছেন।"

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে (১৩০৮ বাং) বলছেন :

"আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে

সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে।"

'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১৩১৭ বাং) বলছেন:

"আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত-কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে; মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে। অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় কেউ যদি কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্‌ঝর্‌ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।"

প্রাক্‌-সবুজপত্র-পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাই চলতি ভাষার ব্যবহার মাঝে মাঝেই করেছেন, এর চর্চা কখনো সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন নি। কিন্তু এই পর্ব মূলত সাধুভাষার পর্ব। এই পর্বে তিনি সাধু গদ্য রচনায় চরম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'শিক্ষা', 'স্বদেশ', 'সমূহ', 'রাজাপ্রজা', 'সমাজ', 'পঞ্চভূত', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশী সমাজ', 'চরিত্র পূজা', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'আধুনিক সাহিত্য': প্রথম মহাযুদ্ধের আগে প্রকাশিত এই সব প্রবন্ধ-পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্য রচনায় অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই সকল সুপরিচিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি যাতে এই নিপুণতার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যাবে: 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (শিক্ষা), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'নববর্ষ' (স্বদেশ), 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা' (প্রাচীন সাহিত্য), 'বঙ্কিমচন্দ্র' (আধুনিক সাহিত্য), 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষ', 'পাগল' ও 'শরৎ' (বিচিত্র প্রবন্ধ)।

তিন

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) ও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)—এই দু'টি উপন্যাসই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রসাহিত্যে—সাধু ও চলিত গদ্য—এই দুই ধারার অবসান ঘটল। রবীন্দ্রনাথ চলিতকে বরণ করে নিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের অভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করে গেলেন।

'চতুরঙ্গে' কেবল বিবরণ নয়, সংলাপও সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু তার মধ্যে চলতি ভাষার সাবলীলতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ বইয়ের ভাষা সংহত, চাপা, তবু তাকে ঠেলছে ভেতর থেকে। সাধারণতঃ সাধুভাষায়—আমরা যে সব ক্রিয়াপদ

ব্যবহার করি, তার ব্যবহারেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, চলতি ক্রিয়াপদকে ঠাঁই দিলেন। ক্রিয়াপদের রূপভেদে সাধু ও চলিত ভাষার যে ব্যবধান এতদিন ছিল, তাকে তিনি ভেঙে দিলেন।

নীচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করা যাক্:

"শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড় একটা আঘাত বাজিল যে, ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, 'শচীশ জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড় মৃত্যু'।"

এই উদ্ধৃতির নিম্নরেখ শব্দগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, সাধু ও চলিত গদ্যে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপের বিভিন্নতা কী ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। চলতি ভাষার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন পূর্বোদ্ধৃত উদ্ধৃতিগুলিতে যে প্রবণতা ছিল, তা যে সীমা লঙ্ঘন করে যেতে চাইছে, তা এ থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়। 'চতুরঙ্গের' সংহত, কাটছাঁট বাক্য যে ভেতরে ভেতরে আবেগে উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ—এর পরই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হলো 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বাহন আগাগোড়াই চলতি ভাষা। তাতে রবীন্দ্রনাথ যেন চলতি গদ্যের তরঙ্গ বাজিয়ে গেলেন। 'চতুরঙ্গে'র সংহতি ও সংযম থেকে আমরা মুহূর্ত-মধ্যে উত্তীর্ণ হলাম উচ্ছলতা ও ঘূর্ণিপ্রবাহে। এ উচ্ছলতা চলতি গদ্যের, এ ঐশ্বর্য ভাষার ঝকমকে অলংকারে—বিরোধাভাসে, অনুপ্রাসে, যমকে, শ্লেষে। 'ঘরে বাইরে'র সূচনাতেই আমরা এই উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত অলংকরণ লক্ষ্য করি। চলতি ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছেন, তা বোঝাবার জন্য হয়ত-বা এই অতিরিক্ততার চমক লাগিয়েছেন। বাংলা গদ্যের মুক্তিসাধনে 'ঘরে বাইরে' তাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রইল। এ উপন্যাসের সূচনাটি লক্ষ্য করা যাক্, "মাগো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদূর, সেই লালপেড়ে শাড়ী, সেই তোমার দু'টি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গম্ভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার

মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে ঊষা সতীর দান; দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?" এই স্টাইল সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। প্রশ্নভঙ্গির বাহুল্য, হ্রস্ব বাক্য, উপমার আতিশয্য, 'সেই' ও 'সে যে' পদের বহুলতা—এগুলি হয়ত সরকারী ভাবে চলতি গদ্য রচনার প্রথম প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া যখন রবীন্দ্রনাথ সাম্‌লে গেলেন, তখন তিনি 'শেষের কবিতা'র অর্থালংকারের মোহে, ঔজ্জ্বল্যে ধরা দিলেন—ভাষাপ্রসাধনে মন দিলেন।

সে কথা আলোচনার আগে দুটি বিষয় স্মর্তব্য। 'ঘরে-বাইরে'তে দেখেছি চলতি গদ্যের ঐশ্বর্য। প্রাক্‌-সবুজপত্র পর্বে আমরা সাধু গদ্যের ঐশ্বর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছি 'প্রাচীন সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'স্বদেশ' প্রবন্ধ পুস্তকে। সাধু গদ্যের ঐশ্বর্যরূপকে একবার মাত্র 'ঘরে-বাইরে'র চলতি ভাষার ঐশ্বর্যরূপের পাশে উপস্থিত করতে চাই। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'কেকাধ্বনি' (রচনা: ১৩০৮ বাং, ১৯০১ ইং) প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিলাম:

> "কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থান বিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর-ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্য-পিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শত সহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেংকার-ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান, কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।"

এই অংশে গুরুগম্ভীর সংস্কৃত-প্রধান ভাষার ধ্বনিরোল আমাদের হৃদয়ে যে দোলা দেয়, তাকে কোনোক্রমেই 'সাধু' গদ্য বলে দূরে ঠেলে রাখতে পারি না।

আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে—সবুজপত্র-পর্বের ঠিক আগে—'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রচনা করেন। এর ভাষা সাধু গদ্য। তবু এতে যে নমনীয়তা,

সাবলীলতা ও প্রাখর্য আছে, তা বিস্ময়কর। 'জীবনস্মৃতির' স্টাইল একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। এ বিষয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি : "রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যমণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্বের ও রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।" [রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর : পৃঃ ৯]

জীবনস্মৃতির সূচনা থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিয়ে এই স্টাইলের সাক্ষাৎ পরিচয় দিচ্ছি :

> "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যে-ই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে অভিরুচি তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলিহাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কতো বড়োকে ছোট করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়। কয়েক্ বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনেব ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবন বৃত্তান্তের দুইচারিটি মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের ; সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে চাহিয়াছে, সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।"

তারপর বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে জীবন, সে পর্বের আনন্দবেদনা-মিশ্রিত স্মৃতিচিত্রগুলি অননুকরণীয় ভাষায় এঁকে গেছেন।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, সাধু গদ্যের পরিপূর্ণ ও মহৎ রূপটি আয়ত্তে পাবার পর রবীন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য তার চর্চা ছাড়লেন। যিনি প্রাচীন সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি লিখেছেন, তিনি যে আর কোনদিন সাধু গদ্যের চর্চা করলেন না একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তবু তাই সত্যি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকেই মেনে নিলেন এবং শিরোপা দিলেন। এই ভাষা তাঁর পরবর্তী সকল গদ্য রচনায় দেখা গেছে। 'গল্পগুচ্ছে'র তৃতীয় খণ্ডে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

'অতিথি' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অপূর্ব সমৃদ্ধ সাধু গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে পিছনে ফেলে এলেন। চলতি গদ্যে লিখলেন 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ, ১৩২১ বাং, ১৯১৪ ইং)। এই পত্রটি কেবল নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেছে, তা নয়, গল্পরাজ্যে ভাবে ও ভাষায় মূর্তিমান বিদ্রোহরূপে দেখা দিয়েছে। এর ভাষার এমন একটি পার্থক্য ও তীক্ষ্ণতা আছে যা আমাদের প্রতি ছত্রেই সচেতন করে তোলে। সূচনা থেকে একটু তুলে দিচ্ছি :

"আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি! চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছো, আমিও শুনেছি। চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি। আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আফিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আফিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল, তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজবউয়ের চিঠি নয়।"

এই চলতি গদ্য—কথ্য ভাষা হয়েও পুরোপুরি মুখের কথা নয়। সাহিত্যিক চলতি ভাষার যথার্থ রূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই ভাষায় একটি সযত্ন প্রসাধনের ও শালীন প্রকাশের পরিচয় পাই। 'ঘরে-বাইরে'র চলতি ভাষায় যে আড়ম্বর, তা প্রথম প্রকাশের আড়ম্বর। অলংকারের সেখানে বাহুল্য, প্রসাধন সেখানে উগ্র। কিন্তু এই ভাষায় সেই উগ্রতা ও আতিশয্য দূর হয়েছে। এই গল্পেরই আর ক'টি ছত্র লক্ষ্য করা যাক্ :

"যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে একথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালে, মনে ভয়ই হ'ল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদর যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড় সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।" ['স্ত্রীর পত্র']

এখানে লক্ষণীয়, কী নৈপুণ্যে নিরুচ্ছ্বাসকণ্ঠে এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এরপর 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪ / ইং ১৯১৭), পাত্র ও পাত্রী' (পৌষ, ১৩২৪) প্রভৃতি পরবর্তী গল্প এই চলতি গদ্যেই লেখা হয়েছে।

চার

রবীন্দ্র-গদ্যের বিবর্তনে এর পর নাম করতে হয় 'লিপিকা' (১৯২২) বইটির। এই কথিকাগুলি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গদ্য ও পদ্যের সীমানায় অবস্থিত এই বইটি গদ্যছন্দের অগ্রদূত। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে দেখব এর ভাষার সাবলীলতা ও প্রাখর্য। রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ গ্রহণশীল ও উদার ছিলেন, তার প্রমাণ এ বইয়ের ভাষা। সংস্কৃত থেকে দেশী বিদেশী শব্দ-নির্বিচারে সবকিছুই প্রয়োজন মতো তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন, অথচ কোথাও ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, স্ল্যাং-এ পরিণত হয়নি।

সংস্কৃতপ্রধান ভাষার নমুনা :

> "সেই আকাশ পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্র গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বাচনীয় তাই হঠাৎ বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রংটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনীতে মেঘ-মল্লারের সব মীড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।" ['মেঘদূত']

দেশী শব্দ-প্রয়োগের নমুনা :

> "এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম অকালকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য় ; এ দৌড়য় বিনা কারণে, যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু করতে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব।" ['ঘোড়া']।

বিদেশী শব্দ-প্রয়োগের নমুনা :

> "কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না : 'খাজনা দেব কিসে ?' শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।" ['কর্তার ভূত']

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার আছে। কী সংস্কৃত, কী দেশী, কী বিদেশী যে শব্দই প্রযুক্ত হোক না কেন, হয়েছে তার প্রয়োগ অপরিহার্য বলে, জোর করে আসেনি. আর চলতি ভাষার চাল কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

রবীন্দ্র-গদ্যধারার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসের ভাষা ও স্টাইল সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা দরকার। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দের তর্কপূর্ণ সাহিত্যিক আবহাওয়ায় এই উপন্যাসের জন্ম—'কল্লোল'-গোষ্ঠী ও 'কল্লোল'-বিরোধী-গোষ্ঠীর বাদ প্রতিবাদ থেকে এই উপন্যাস প্রেরণা পেয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। রচনার স্টাইল ও ভাষা এই তর্কের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। 'শেষের কবিতা'র ভাষা বাংলা গদ্যে কারুশিল্পের চরম নমুনা। সত্তর বছর বয়সে হাওয়া বদলের ঘূর্ণিতে থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ দিলেন, তিনি আধুনিক, প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল। 'শেষের কবিতা'র ভাষা আমাদের মনকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে তোলে। ভাষার মধ্যে ক্রিয়াপদের বিরলতা, কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ ও শব্দ নিঃসংকোচে গ্রহণ, বাক্য-বিন্যাসে মাঝে মাঝে ব্যুৎক্রম, এপিগ্রামের ছড়াছড়ি। এই সবের মাধ্যমে চলিত গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ দৌড় করালেন, বেঁকিয়ে হেলিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে—তৎসম থেকে দেশী, তদ্ভব থেকে বিদেশীতে লাফ দিয়ে গদ্যরাজ্যে রাতারাতি পরিবর্তন এনে দিলেন। 'ঘরে-বাইরে'তে (১৯১৬) যে ভাষা-পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তার চরম ফল প্রকাশ পেল 'শেষের কবিতা'য় (১৯২৯)। 'শেষের কবিতা'র সংলাপে এমন ঔজ্জ্বল্য ও প্রাখর্য রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন যা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মনে হয় নোতুন ভাবে কথা বলার উৎসাহেই কথা বলা হয়েছে। বোধ করি এ জন্যই কোনো প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গল্পের মোড়কে এপিগ্রাম-চানাচুর উপহার দিয়েছেন।'

'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিতের কথায় এই তীক্ষ্ণাগ্র সংলাপের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যোগমায়াকে অমিত বলছে, "আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা ; মায়ের কোলে জন্মেছি। মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।" এই সাজানো বাক্যবিন্যাসের পেছনে কতটা আন্তরিকতা আছে, আর কতটা চমক লাগানোর প্রয়াস আছে তা বিবেচ্য। তবু 'শেষের কবিতা' এই উজ্জ্বল প্রখর লাস্যময় নৃত্যচঞ্চল ভাষার জন্যই পছন্দ করি, একথা বলা খুব অন্যায় হবে না। অমিত রায়ের কথায় এপিগ্রামের ছড়াছড়ি, সেগুলি তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থসমৃদ্ধ। কয়েকটি উদাহরণ নিন : 'সম্ভবপরের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা' ; 'বর্বরতা

পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত', 'সময় যাদের বিস্তর তাদের পাংচুয়াল্ হওয়া শোভা পায়' ; 'যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়' ; 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে' ; 'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এ দুই-এ তফাৎ আছে', 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না।' এ-তো গেল অমিত রায়ের কথা। কিন্তু লেখকের বর্ণনা, তাতেও এই লক্ষণগুলি প্রকট। শিলং পাহাড়ে বর্ষাগমের বর্ণনা : "তাই ও যখন ভাবছে পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে—বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জীর গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, এইবার ঘনবর্ষণে গিরি-নির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কুলছাড়া করবে।" এই বর্ণনার নিম্নরেখ শব্দগুলিতে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সাধু স্টাইলকে অস্বীকার করবো বললেই করা যায় না তার প্রমাণ এই বর্ণনা। কিন্তু লক্ষ্য করুন নরেন মিটারের বর্ণনা :

> "দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও ; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এইজন্য আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরে বোহেমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। চিত্রকলাকে সে ফলাতে পারে না—কিন্তু দুইহাতে চটকাতে পারে।...তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাস বৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত।...এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য সম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।"

বাংলা সাহিত্যে নোতুনের দাবী অমিত তুলেছিল এই কথায় :

> "চাই কড়া লাইনের খাড়া রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন কি যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙ্‌য়ের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।"

'শেষের কবিতা'র স্টাইল এই কয়টি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। শব্দ

প্রয়োগে ও শব্দ গঠনে (যথা—'বন্ধুনি', 'ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা', 'শাড়ীটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে ল্যাপ্টানো', 'বিল্‌ডিঙের আদলে') রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংস্কারমুক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধে যে স্টাইল দেখা যায়, তা বহুল পরিমাণেই 'শেষের কবিতা'র এই স্টাইলের কাছে ঋণী। কিন্তু এই চরম চমকলাগানো ম্যাজিকবিদ্যা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। সাধু গদ্যে তিনি আর ফিরে যান নি, কিন্তু বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি যে তৎসম শব্দ-প্রধান, তা অস্বীকার করেন নি।

বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ দুটি উপন্যাস লেখেন, তার একটি হলো 'মালঞ্চ' (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি উপন্যাসে (দুইবোন-মালঞ্চ-চারঅধ্যায় পর্বে) একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—তা হলো বাক্যের হ্রস্বতা, ক্রিয়াপদ ও কর্তার ব্যুৎক্রম, সংলাপের অ-সাধারণতা। এর সূচনা 'চতুরঙ্গে', বিকাশ 'শেষের কবিতা'য়, পরিণতি শেষ 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। এদের ভাষায় কবি জাদু লাগিয়েছেন। প্রায়শই লিরিক গুণটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণতি যেমন নিষ্ঠুর ভাষাও তেমনি তীক্ষ্ণাগ্র। এর পরিণতিতে যেমন রোমাঞ্চকতার প্রশ্রয় নেই, ভাষাতেও নেই লিরিকের নমনীয়তা। 'মালঞ্চে'র গোড়াকার বর্ণনাটা এই মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে :

> "পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু করা। নীরজা আধশোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাসে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।"

আরেকটু বর্ণনা নিই :

> "বাজল দুপুরে ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না। যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।"

এই স্টাইলে লক্ষ্য করা যায় বাক্যের সংক্ষিপ্ততা, ঋজুতা, ক্রিয়াপদের স্থানপরিবর্তন, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য। প্রাক্-সবুজপত্র পর্বের তৎসম শব্দের প্রাধান্য এখানে কথ্য ভাষার প্রবাহে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

জীবনের শেষপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ দু'টি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন যা ভাষাবিচারে—

স্টাইলের পরিণতিবিচারে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি হল: 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) ও 'তিন সঙ্গী' (১৯৪০)।

'ছেলেবেলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওটি রচনা করেছি বালভাষিত গদ্যে'। এই গদ্যের প্রবহমানতা ও দ্যুতি লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। এই স্মৃতিকথার সূচনায় কবি বলেছেন:

"আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কল্‌কাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়বেরকরা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউবা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথার পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চাদর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদ বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষাকে স্ল্যাং সমেত সাহিত্যের দরবারে এনেছেন। কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গী, তার ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, তৈরী-করা যুগ্মশব্দ: সবই এখানে রয়েছে।

'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য কেবল গল্প-উপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণে নয়, ভাষাতেও পরিস্ফুট। এর ভাষায় যে নাটকীয় উপাদান ও সর্বগামিতার লক্ষণ বর্তমান, তাকে চলতি বাংলা গদ্যের চরম ঐশ্বর্যরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সামান্য উদাহরণেই এ'কথা প্রমাণিত হবে:

"পলাশফুলের রাঙা রঙের মাৎলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যবসাদাররা মৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। ফুলের পাতা থেকে জমা করেছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে পাকা মহুয়া-ফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম—তনিকা।" [শেষকথা, তিনসঙ্গী]

'তিন সঙ্গী'র ভাষা এই ছিপ্‌ছিপে নদীর মতো। এটি চলতি বাংলা গদ্যের উচ্ছ্রিত রূপ। পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রইল এই ভাষায় —এখানে ভাষার নমনীয়তা ও কাঠিন্যের রমণীয় পরিণয় সাধিত হয়েছে।

জীবনের শেষ গদ্যরচনা অশীতিবর্ষ-পূর্তি-উৎসবের অভিভাষণে—'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১)—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।···ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!"

এখানে দীর্ঘ প্রসারিত বাক্যের পুনরাবির্ভাব ও তৎসম-তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগের দ্বারা সাবলীল গতিটি বজায় রাখা হয়েছে। এই সমন্বয় সাধনে রবীন্দ্র-গদ্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

সাবলীলতা রবীন্দ্র-গদ্যের প্রাণবস্তু। অলংকরণের বা চমকলাগানোর প্রয়াস কখনো এই সাবলীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। আঠারো থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যে দীর্ঘ সাহিত্যজীবন, তা বাংলা গদ্যের ইতিহাসে আপন স্বাক্ষর রেখে গেছে।

১৫

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

এক

সবাই কবি নন, কেউ কেউ কবি,—একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য সব কবি উঁচুদরের সমালোচক নন। কেউ কেউ সমালোচক হিসেবেও শ্রদ্ধার্হ। অনেকে আছেন যাঁরা একাধারে কবি ও সমালোচক; যেমন গ্যেটে, কোলরিজ, এলিঅট। "সেখানেও বিভ্রান্তির অভাব হয় না, কোলরিজের হ্যামলেট-সমালোচনায় কোলরিজের চরিত্রের প্রতিকৃতি দেখা যায়। টি এস এলিয়টের হ্যামলেট-সমালোচনা এক সময় কিঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন ইহা বস্তাপচা হইতে চলিয়াছে।"

[ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সমালোচনা-সঞ্চয়ন, পৃ. ২২৯]

কবি-সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। "কবির কাব্য-সমালোচনা একটা অভিনব সার্থকতা লাভ করিতে পারে যখন তাহা জুপিটারের মস্তিষ্ক হইতে মিনার্ভার মত নূতন সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হয়। ইহার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি (যাহা নামে প্রবন্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে গদ্যকাব্য), আর তাঁহার 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি' 'উর্বশী' ও 'স্বপ্ন' নামক কবিতা।"

[তদেব, পৃ. ২২৯]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে কোনো অনড় অচল ধারণায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি জানতেন, সমালোচনা-প্রক্রিয়া সৌন্দর্যশাস্ত্রের ধারণার সঙ্গে সমান্তরিতভাবে চলে। সাহিত্যশিল্পে আমাদের অন্বেষণ ও লক্ষ্য বারবার পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যে দর্শন ও মনস্তত্ত্ব আমরা খুঁজি, কখনো সমাজনীতি সৌন্দর্যনীতির উপর প্রাধান্য লাভ করে, কখনো বা নীতি আমাদের সৌন্দর্যবোধকে আড়াল করে দাঁড়ায়। কখনো-বা শব্দের অন্তরালবর্তী অর্থই আমাদের অন্বেষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য-ভাবনায় কোনো কথাই শেষ কথা নয়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার পরিচয় পাই তাঁর লেখায়।

সাহিত্য-সমালোচনা অর্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচারকেই বুঝেছেন:

> "সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়।

অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।" ['সাহিত্যবিচার', সাহিত্যের পথে]

'সাহিত্যের পথে'-র গ্রন্থপরিচয়-অংশে এই কথার উপর তিনি জোর দিয়েছেন যে, সাহিত্য-সমালোচনায় তিনটি প্রক্রিয়া আছে—পরিচয়, ব্যাখ্যা, বিচার। এই তিনটি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। সেইসব ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই তিনের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। এবং সাহিত্য-বিচারে তিনি লেখকের অন্তর্জীবনের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, সদ্য-উদ্ধৃত উক্তি)।

দুই

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যাত হয় বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে। ১২৯৮-৯৯ বঙ্গাব্দে (১৮৯১-৯২ খ্রী) 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের চারখানি ও লোকেন্দ্রনাথের তিনখানি পত্র প্রকাশিত হয় (রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি 'সাহিত্য'-গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে ; লোকেন্দ্রনাথের পত্রগুলি এতকাল বাদে অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সমালোচনা-সঞ্চয়ন', ১৩৮৩, গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে)। যে বিষয় নিয়ে দুই বন্ধুতে আলোচনা করেছেন তার আবেদন চিরন্তন, তা একেবারে গোড়ার কথা—সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস। লোকেন্দ্রনাথ তাঁর কবি-বন্ধুর অনেক বক্তব্যকে মেনে নেন নি, পরন্তু কিছু তীক্ষ্ণ গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তার জবাব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য বিশদতর ও স্পষ্টতর করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চারটি পত্র-প্রবন্ধে ('সাহিত্য'-গ্রন্থভুক্ত) তাঁর নিজস্ব মতামত পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই অভিমতের দোষগুণ বিচার করেছেন ('সমালোচনা-সঞ্চয়ন' দ্রঃ)। এখানে রবীন্দ্রনাথের মতামতগুলি উপস্থিত করি।

১. রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে সত্য বলে নির্ধারিত করেছেন, এবং এই সত্যই সাহিত্যের সত্য। "আমার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার (অর্থাৎ সত্যের) সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে, তা হলেই সত্যকে নিতান্ত

জড়পিণ্ডের মত মনে হবে না।" 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই মতকেই ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ দিয়েছেন—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

২. সাহিত্যের সত্য কীভাবে প্রকাশিত হয়? রবীন্দ্রনাথের মতে, "যখন কোনো একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়,……তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না ·· তখনই সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়।··· এইরকম সাহিত্য-আকারে যখন সত্য পাই তখন সে সর্বতোভাবে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়।"

৩. পত্র-চতুষ্টয়ে রবীন্দ্রনাথ কবির 'নিজত্ব' প্রকাশকে সাহিত্যের মূল লক্ষ্য বলে নির্দেশিত করেছেন। প্রথম পত্রে ('আলোচনা') 'নিজত্ব' বলতে শুধু নিজের অনুভূতি, ভাল লাগা মন্দ লাগাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যেই মানুষের চিরন্তন মনুষ্যত্ব। দ্বিতীয়পত্রে 'সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথ 'নিজত্ব'কে প্রসারিত করে দেখেছেন। যে নিজত্ব সাহিত্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠে তা সাহিত্যিকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব, বিশেষ জীবন-দৃষ্টি। "আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। তা-ই আমাদের জীবনের মূল সুর বা মূল তত্ত্ব।" এই সাহিত্যতত্ত্বের উপরই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে ও শেক্সপীয়রের সাহিত্য থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছেন। বিচিত্রকীর্তি গ্যেটের অন্যান্য কীর্তিতে তাঁর আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়, একমাত্র সাহিত্যে-ই তাঁর মনের ও হৃদয়ের গভীর ও ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়রের নাটকে তৎসৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে শেক্সপীয়রের মনোভাব তাঁর 'মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করেছে।'

৪. 'লেখকের নিজত্ব' ও 'জীবনের মূলতত্ত্ব'—এ দুটি অভিমত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন প্রথম দুটি পত্রে ('আলোচনা' ও 'সাহিত্য')। এ দুয়ের সামঞ্জস্যের প্রয়াস দেখা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে ('সাহিত্যের প্রাণ', 'মানবপ্রকাশ')। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'নিজত্ব' বা 'জীবনের মূলতত্ত্ব' বিশেষভাবে আধুনিক কালের লক্ষণ, এমন মনে করার কারণ নেই

পুরাকালে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সম্পর্ক ছিল গভীর, নিবিড় ও প্রশ্নাতীত, কিন্তু সংশয়বিদ্ধ বর্তমানযুগে সেই সহজ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যেহেতু এখন শুধু সাহিত্যের মধ্যেই তা প্রাপণীয়, তাই সাহিত্য এখন অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াসটি এখানে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সাহিত্য শুধু নিজত্বও প্রকাশ করে না, পরত্বও প্রকাশ করে না; সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'ল পরিপূর্ণ মানবিকতা। রবীন্দ্রনাথ আরো মনে করেন, সাহিত্যবিষয়ের মাপকাঠি দুটি—সাহিত্যের প্রকাশ-ক্ষমতা এবং মানবিকতার প্রকাশ-সামর্থ্য। সেই সাহিত্যই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে যার মধ্যে প্রকাশের সৌন্দর্যের সঙ্গে (মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির) ব্যাপক সহিতত্ব বা পূর্ণ মানবিকতা প্রকাশিত হয়।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত এই চারটি ক্ষেত্রেই তাঁর আপত্তি তিনটি পত্রে পেশ করেছেন। এইসব অভিমত ও আপত্তি এবং তাদের যৌক্তিকতার বিশদ বিচার হয়েছে 'সমালোচনা-সঞ্চয়ন'-এ। (অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের এই বিচার উক্ত গ্রন্থে অবশ্যদ্রষ্টব্য)।

স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের মতামত যতটা রোমান্টিক ততটাই মিস্টিক। সাহিত্যের প্রধান গুণ প্রকাশের ক্ষমতা, একথা তিনি মনে করেন, কিন্তু তাকে স্পষ্ট করেন নি, তার সীমা নির্দেশ করেন নি। সাহিত্যে সত্যের স্থান আছে বলে তিনি মনে করেন। সে-সত্য অনেকটাই রোমান্টিক, বস্তু-বিচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে পূর্ণ মানবিকতার প্রকাশ দেখেছেন। এর মধ্যে মিস্টিক ভাবনা সক্রিয়। "রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আমাদের অন্তরে একটি মর্মগত মূল জিনিস আছে, তা ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সম্মিলনে জগতকে ও আপনাকে জানে। এই ঐক্যই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাই চিরস্থায়িত্ব দাবি করিতে পারে। সেই কারণেই ইহা সত্য ও সুন্দর এবং ইহার প্রকাশই সাহিত্য। এই ঐক্য যত ব্যাপক হইবে সাহিত্য তত উৎকর্ষ লাভ করিবে। যুক্তিবাদী লোকেন্দ্রনাথ এই মিস্টিক ঐক্যকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই এবং কবি ও মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ ইহাকে উপমাবাহুল্যে আচ্ছন্ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় এই ঐক্য স্পষ্ট হয় নাই। তবু তিনি যে সাহিত্যের মধ্যে, নিজত্ব হইতে পরত্বে উত্তরণের মাধ্যমে সাহিত্যের তাৎপর্য খুঁজিয়াছেন, ইহাই নন্দনতত্ত্বে তাঁহার প্রধান অবদান।"

[ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'সমালোচনা-সঞ্চয়ন' পৃ ৯৯]

'সাহিত্য' গ্রন্থে চারটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, পরবর্তীকালে 'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' (সাহিত্যের পথে) প্রবন্ধে তার প্রতিধ্বনি শুনি।

লোকেন্দ্রনাথকে লেখা প্রথম পত্রে ('আলোচনা', সাহিত্য) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, মানবসঙ্গব্যাকুলতাই সাহিত্যের মৌল প্রেরণা। মানুষের মাহাত্ম্য স্বীকার করাই প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষ্য ছিল বলে তিনি মনে করেন ('সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্যের পথে)। সাহিত্য কেন ?– মানবজীবনের মহিমাকে রূপদান-ই সাহিত্যিকের লক্ষ্য বলে তিনি মনে করেন ('সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্যের পথে)। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন প্রকাশের উপরে। 'সৃষ্টিমাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।' প্রকাশ অর্থে তিনি বুঝেছেন, মানবপ্রকাশ। 'সাহিত্যে বিশ্বমানব আপনাকেই প্রকাশ করিতেছে।' তিনি মনে করেন, প্রকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ তার সংকীর্ণতার সীমাকে অতিক্রম করে। তাতেই মানুষ যথার্থ সত্যতা অর্জন করে। প্রকাশের মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের চেতনা আর সত্যতার চেতনা এক হয়ে মিলে যায়। ('তদেব')

তিন

সৌন্দর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সাধনা পত্রিকার কাল থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৮৯১ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত সাহিত্য-চিন্তামূলক নিবন্ধে ও কবিতায় তার ক্রমবিকাশ অনায়াসলক্ষণীয়।

স্বীকার্য, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-ই সৌন্দর্যবাদের ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ধারণাটি তিনি কোথা থেকে পেলেন, তা সন্ধান করলে দেখা যাবে, ইংরেজি রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় শিল্প-মতবাদ ও ফরাসি রোমান্টিক সৌন্দর্যবাদ ও প্রতীকবাদ নানা রচনা ও ব্যক্তি মারফত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁচেছে।

রবীন্দ্রনাথের সুন্দর-সত্য-শিব সম্পর্কিত ধারণার মূল পাই ভিক্তর কুজাঁ (Victor Cousin 1792-1867)-রচিত, 'সত্য-শিব-সুন্দর' ভাষণে ('Du vrai, du beau et du bien', 1836 ; English translation : 'Lectures in the True, the Beautiful and the Good', 1854)। রবীন্দ্র-অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসি থেকে এই বই বাংলায় অনুবাদ করেন। ঠাকুর-পরিবারে এই গ্রন্থের সমাদর ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কুজাঁর মতে, সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের যোগ নেই। তিনি 'সুন্দর' বলতে নৈতিক সৌন্দর্য ওরফে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে বুঝেছেন ; শিল্পের উদ্দেশ্য একে প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথও তা-ই মনে করেন।

সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্রবিনিময় কালে। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে লিখেছিলেন—

"ফরাসি কবি গোতিয়ে রচিত 'মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপাঁ' পড়ে (বলা উচিত আমি ইংরাজি অনুবাদ পড়েছিলুম) আমার মনে হয়েছিল, গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক তার মূলতত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারি নে। গ্রন্থের মূল-ভাবটা হচ্ছে, একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরছে। সৌন্দর্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ-শতদলের ওপর লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনিগহ্বরে ও অগাধ সমুদ্রতলে প্রচ্ছন্ন; যেন তা গোপনে আহরণ করে আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তির মতো কৃপণের সংকীর্ণ সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জিনিস। এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না—রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র, প্রতিদিনের সূর্যালোক, প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমাদের চারিদিকে, সৌন্দর্য এই তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে। এই বিশ্বব্যাপী সত্যকে সংকীর্ণ করে আনতে পূর্বোক্ত ফরাসি গ্রন্থে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা হয়েছে বলা যেতে পারে। ‥‥ …

গোতিয়ের সহিত ওআর্ডসওআর্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওআর্ডসওআর্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে তা পূর্বোক্ত ফরাসিস্ সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়—তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন, তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই যে, এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই, ওআর্ডসওআর্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।"

['সাহিত্য' বৈশাখ ১২৯৯/১৮৯২/সাহিত্য]

এই আলোচনা থেকে সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি জানতে পারি। তিনি সৌন্দর্যকে বিশ্বব্যাপী সত্য বলে মনে করেন, আর সেজন্যই সৌন্দর্যের সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ রূপ দেখতে চান না, তার অনন্ত বিস্তার ও গভীরতা চান। সৌন্দর্যের বৃহৎ সত্য বলতে তিনি এই গভীরতা, বিস্তার ও ব্যাপ্তিকেই বুঝিয়েছেন। সৌন্দর্য তাঁর

কাছে জড় শক্তি নয়, "সৌন্দর্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে।" এই পত্র-প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন, "অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য ; সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।"

স্মর্তব্য, এসময়ে রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী (১৮৯৪) কাব্যের কবিতাগুলি লিখছেন, গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের গল্প লিখছেন। কিছু পরেই লিখেছেন 'চিত্রা'র (১৮৯৬) কবিতাগুলি। সর্বত্রই হয় আদর্শ সৌন্দর্যের অভিমুখে যাত্রা, নয় ভূতলের স্বর্গখণ্ডে সৌন্দর্যের সন্ধান লক্ষ্য করা যায়। ঠিক তারপরেই লিখেছেন 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের (১৮৯৭ খ্রীঃ/১৩০৪ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধনিচয়। পঞ্চভূতের অন্যতম চরিত্র তত্ত্ববাদী ব্যোম সৌন্দর্য-তত্ত্ব আলোচনা করেছে। আমরা জানি, পঞ্চভূতের চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথেরই অংশবিশেষ। ব্যোমের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

> "ব্যোম কহিল, ঐ যে আত্মার সৃজনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ, উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা বন্ধনস্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে ; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি, সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল পিণ্ডমাত্র, আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তুসমষ্টির মতো এমন পর আর কী আছে। কিন্তু আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা। সে মাঝখানে একটা সৌন্দর্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল—সে দিন বড়োই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতুনির্মাণকার্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারিদিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর-পৃথিবীকে আপনার ও জড়-পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে।" ['সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', পঞ্চভূত]

সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এখানে স্পষ্টতর। মানুষের জীবনে সৌন্দর্যের ভূমিকা কী, তা এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত।

রবীন্দ্রনাথের আর-এক বন্ধু প্রিয়নাথ সেন, যিনি একসময় তাঁর সাহিত্য-দিশারী ছিলেন। প্রিয়নাথ-রবীন্দ্রনাথ পত্র-বিনিময় ('প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'র পরিশিষ্টে সংকলিত) লোকেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময়ের মতোই মূল্যবান। 'রস্কিন' প্রবন্ধে ('প্রদীপ', ১৩০৭/১৯০০) কলাকৈবল্যবাদ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন রাস্কিন, সাঁত ব্যুভ, ফ্লোব্যার, টেইন-এর মতবাদ আলোচনা করেছেন। প্রিয়নাথ কলাকৈবল্যবাদ বা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অন্যনিরপেক্ষ সৌন্দর্যকে বড় করে দেখতে চেয়েছিলেন।

প্রিয়নাথ 'রস্কিন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

"রস্কিনের মতে তাহাই সৌন্দর্য, যাহা কলা-উপভোগক্ষম বৃত্তিকে আনন্দ দেয়, যাহা কেবল উন্নত উদার ব্যক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট এবং সমধর্মা অপর ব্যক্তির দ্বারা উপযুক্ত বা দৃষ্ট।...

কিন্তু রস্কিনের ঐ উক্তিগুলির ভিতর যে ধর্মভাব ও আস্তিকতার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা কি সত্য? এমন ভক্ত আস্তিক কি নাই, কলাপার-দর্শিতা ত দূরের কথা, সৌন্দর্যজ্ঞানই যাহার নাই? আস্তিকতা ভক্তি বা ধর্মভাব, কলাজ্ঞান বা কলা-রচনাশক্তি উদ্বোধিত করে না। কলারচনার পক্ষে সৌন্দর্য-জননীশক্তি আবশ্যক—এমন অনেক কলারসিক জগতে আছে এবং ছিল, সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে যাহাদের সমকক্ষ নাই, কিন্তু যাহারা ঘোরতর নাস্তিক এবং নীতি সম্বন্ধে যাহাদের জীবন জঘন্য। · ···

ফলকথা সৌন্দর্য—কেবলমাত্র সৌন্দর্য—প্রত্যেক কলা-ব্যবসায়ীর মূলমন্ত্র হওয়া চাই—তাহা হইলেই কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। · ·

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার সারমর্ম এই ঃ কলাবিদ্যার কার্য চিত্তরঞ্জন। সে চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্য-সৃষ্টির দ্বারা সাধ্য। সৌন্দর্য বলিলে আমরা সকল সৌন্দর্যই বুঝিব—কেবলমাত্র রস্কিনের ন্যায় নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বুঝিব না, বা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবলমাত্র ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য বুঝিব না। কারণ, ললিতকলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র। বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে। যখনই যাহা তুমি সুন্দর করিয়া মানবের চক্ষে ধরিবে, তখনই তুমি ললিতকলার সৃষ্টি করিলে। সৌন্দর্যের জন্যই ললিতকলা। ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ।"

রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের প্রবন্ধ পড়ে চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষে কাব্য ও নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আকৃতির সৌন্দর্য এবং আচরণের সৌন্দর্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত, কিন্তু সৌন্দর্যের হিসাবে না গিয়ে কোন-প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়।" (৬ আষাঢ় ১৩০৭/১৯০০ জুন)

একটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের বক্তব্য অনুমোদন করেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। প্রিয়নাথ 'রস্কিন' প্রবন্ধে সাহিত্যকে অন্যনিরপেক্ষ কলাসত্যের শাসনাধীন বলে মনে করেছেন, কিন্তু সাহিত্যে নীতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। সৌন্দর্যের হিসাবে নীতি-উপলব্ধি, এবং সেভাবে দেখার ফলে ললিতকলার আস্বাদনে নীতি অবাঞ্ছিত নয়, বরং গ্রাহ্য, রবীন্দ্রনাথ একথা এই পত্রে লিখেছেন।

সৌন্দর্য, সত্য, নীতি, কলাকৈবল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এইসব আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে মঙ্গল থেকে বিচ্যুত করে দেখতে চান নি। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের (১৯০৭) রচনাগুলির অন্তরালে মঙ্গলযুক্ত সৌন্দর্যচেতনা ক্রিয়াশীল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) তার সমর্থন পাই। বস্তুত এ সময়ে (১৯০০-০৭) রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলযুক্ত সৌন্দর্যভাবনাকে আশ্রয় করেছিলেন। দুটি গ্রন্থ থেকে সদৃশ অনুচ্ছেদ উপস্থিত করে দেখানো যায়, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা এই পর্যায়ে কোন্ রূপ পেয়েছিল।

১. সৌন্দর্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে সেখানে বাহ্যসৌন্দর্যের বিধান তাহাতে আর খাটে না। সেখানে তাহার আর ভূষণের প্রয়োজন কী? প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাহাকে বাহ্য সৌন্দর্যের নিয়মে বিচার করাই চলে না। শিবের ন্যায় তপস্বী, গৌরীর ন্যায় কিশোরীর সঙ্গে বাহ্য সৌন্দর্যের নিয়মে ঠিক যেন সংগত হইতে পারেন না। শিব নিজেই ছদ্মবেশে সে কথা তপস্যারতা উমাকে জানাইয়াছেন। উমা উত্তর দিয়াছেন 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্', আমার মন তাঁহাতেই ভাবৈকরস হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এ যে রস এ ভাবের রস; সুতরাং ইহাতে আর কথা চলিতে পারে না। মন এখানে বাহিরের উপরে জয়ী, সে নিজের আনন্দকে নিজে সৃষ্টি করিতেছে। শম্ভুও একদিন বাহ্য সৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি,

মঙ্গলের দৃষ্টি, ধর্মের দৃষ্টির দ্বারা যে সৌন্দর্য দেখিলেন তাহা তপস্যাক্লশ ও আভরণহীন হইলেও তাঁহাকে জয় করিল।
['কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', পৌষ ১৩০৮/১৯০১/প্রাচীন সাহিত্য ১৯০৭]।

২. সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্র চোখে পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর ও আর একদিকে অসুন্দর, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তার পরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিস আমাদের মনকে টানে সেটা হয়তো চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই সেখানে আমরা চোখ-ভুলানো সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তারপর কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরও বাড়িয়া যায়। সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরও ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন কেবল রূপসী নহে। যেখানে ধৈর্য-বীর্য ক্ষমা-প্রেম আলো ফেলে সেখানে রঙচঙের আয়োজন আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। কুমারসম্ভব কাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেব তাপসী উমার নিকট শংকরের রূপ গুণ বয়স বিভবের নিন্দা করিলেন, তখন উমা কহিলেন: মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্। তাঁহার প্রতি আমার মন ভাবের রসে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আমাদের জন্য আর কোনো উপকরণের প্রয়োজনই নাই। ভাবরসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়। ['সৌন্দর্যবোধ', পৌষ ১৩১৩/১৯০৬/সাহিত্য ১৯০৭]

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন। 'চিত্রা'র 'পূর্ণিমা', 'আবেদন' ও 'উর্বশী' কবিতায় (অগ্রহায়ণ ১৩০২/১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্যবোধকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী ধরনের, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন, সেখানে সামঞ্জস্যবোধের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে কেবল মঙ্গলবোধ নয়, সামঞ্জস্যবোধও জড়িত আছে। এক্ষেত্রেও 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে সদৃশ বক্তব্য উদ্ধার করে দেখানো

যায়, সাহিত্যতত্ত্বালোচনা, ধর্মালোচনা ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় কীভাবে এক চিন্তাসূত্রে বিধৃত হয়েছিল।

১. ধর্মের অধীনে তাহার (মদনের) যে নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ, সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না। কারণ, ধর্মের অর্থ ই সামঞ্জস্য, এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে।

['কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', পৌষ ১৩০৮/প্রাচীন সাহিত্য]

২. আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এইজন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। খুব একটা টকটকে রঙ, খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য, নিজের চারিদিকের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে। সংগীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া আকাশ মাত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে, সুসংগতি—আঘাত নহে, আকর্ষণ—আধিপত্য নহে, সামঞ্জস্যে আমাদিগকে আনন্দ দান করে। এইরূপে সৌন্দর্যকে প্রথমে চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্যকে চিনিবার চর্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্যকে চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া চারিদিককেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি। ['সৌন্দর্য ও সাহিত্য', বৈশাখ ১৩১৪/সাহিত্য]

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সামঞ্জস্য ও সুষমা-ই সৌন্দর্য।

সৌন্দর্যবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণায় কেবল কালিদাসের প্রভাব-ই যথেষ্ট নয়। ফরাসি রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের প্রভাব-ও কম নয়। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়—'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদ উগোর রোমান্টিক ভাবনা ও গোতিয়ের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদ বা কলাকৈবল্যবাদের দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা ঐ গ্রন্থে লভ্য।

সুন্দর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তার গভীরতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম বিশ্বসমরোত্তরকালে সেই বিবর্তনের পথরেখাটি অনুসরণযোগ্য। তিনি একবার বলেছেন, "যে প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি।" ('তথ্য ও সত্য', ভাদ্র

১৩৩১, সাহিত্যের পথে)। আবার বলেছেন, "সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সেকথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়। তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন, মানুষের মুখ।" ('সাহিত্যতত্ত্ব', ১৩৪০ ভাদ্র, সাহিত্যের পথে)। তখন মত পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। "যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্য তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও তা বিশিষ্ট।" (তদেব) যা সামান্য, যা প্রত্যক্ষগোচর, যা নিকটের, তাও সাহিত্যের অমরাবতীতে ঠাঁই পেতে পারে, একথা স্বীকার করে কবি বলেছেন—"হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো এমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্তরা স্বাভাবিক নয়। ইয়াগোর অহেতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাকবেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পণখা নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা তদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয়, কেবল এই জবাবটা পেলেই হ'ল, যে চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ।" (তদেব)

সুন্দরের জায়গায় এলো 'মনোহর', এলো 'স্বভাবজাত সৃষ্টি', এলো 'প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ'। "যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তা-ই বাস্তব।" এখানে কেবল বিশুদ্ধ আনন্দরূপ নয়, প্রয়োজনের রূপও এসেছে—তবে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে। প্রশ্ন এই যে, প্রয়োজনের রূপ সৃষ্টির কোঠায় উঠলেই কি তার প্রত্যক্ষ বাস্তব খোলসটা খসে পড়ে আর সে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে পরিণত হয়? তার প্রয়োজননেই, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, আবার বিশুদ্ধ আনন্দরূপকেও চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই চিন্তাসংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকা (১৯৩৬):

> "একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে

বলার দরকার। বললুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুতঃ বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ। নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।"

শেলী একথাই বলেছিলেন—'Poetry turns all things to loveliness ; it exalts the beauty if that which is most beautiful, and it adds beauty to that which is most deformed" (A Defence of Poetry)

পাঁচ

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি নোতুন কথা বলেছেন ; সাহিত্যকে একটি নবতর ইন্দ্রিয় বলে মনে করেছেন। কবির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি একথাটি উত্থাপন করেছেন :

"যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন তাঁহাকে আমরা কবি বলি। হিমালয় কেন, একটা পানাপুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেকে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয়। মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে দেখিতে পায়, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটিকেই দেখাইতে পারে তবে মন তাহাতে নূতন একটা রস লাভ করে। এইরূপ সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মতো হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়।" [তদেব]

ছয়

সাহিত্যপাঠের আনন্দের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা আসলে তীব্র উপলব্ধি। দুঃখের ও সুখের তীব্র উপলব্ধি তাঁর কাছে আনন্দকর, কারণ সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক। সাহিত্যবোধ এই অস্মিতাবোধ। এই বক্তব্য ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড়া থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায়, তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে

এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুতঃ মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশংকা এসে বাধা দেয়। সে আশংকা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না।" ['ভূমিকা', সাহিত্যের পথে, ১৩৪৩/১৯৩৬]

ট্রাজেডির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দুঃখজাত আত্মবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ট্রাজেডির রস নিয়ে আলোচনায় বলেছেন—

"রসমাত্রেই, অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই, আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। ···দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়েও প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি, এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, একথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমেছে কত, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।"

['সাহিত্যতত্ত্ব', ভাদ্র ১৩৪০, 'সাহিত্যের পথে' ১৯৩৬]

পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রী একথাই বলেছেন,—'Tragedy satisfies us even in the moment of distressing us'; পুনশ্চ, 'In a tragedy we identify ourselves with the hero.'

সাত

সাহিত্যে আমরা সত্যকে চাই, স্পষ্ট করে বলা যায়, সত্যের আনন্দরূপকে চাই। "সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য।" ('সৌন্দর্যবোধ' ১৩১৩/সাহিত্য)

এই আনন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যভাবনার আনন্দ বলে প্রতিভাত হয়েছে। আনন্দ বা সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বার-বার কীট্স-এর শরণ নিয়েছেন।

"আধুনিক কবি বলিয়াছেন: Truth is beauty, beauty truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলাসনা দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।" ('সৌন্দর্যবোধ', পৌষ ১৩১৩, সাহিত্য)

তিরিশ বছর পরে সেই কথাই তিনি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন:

> "মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়; আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হ'ত তবে বুক যেত ফেটে।
>
> এই কথাটা যেদিন স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীটস্-এর বাণী মনে পড়ল, Turth is beauty, beauty turth. অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা 'হৃদয় মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তা'ই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তা'ই সুন্দর।
>
> মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র লীলার জগৎ সাহিত্যে।" [আশ্বিন ১৩৪৩/১৯৩৬]

রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্য আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রসারের ক্ষেত্র। সাহিত্যে আমরা যখন কোনো মানুষ দেখি তখন তাকে স্পষ্ট করে দেখি। সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়ে তাকে দেখি। এইভাবে দেখায় যে আনন্দ আছে, তা-ই সাহিত্যের আনন্দ।

"স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া। সাহিত্য তেমনি করিয়া একটা সামঞ্জস্যের সুষমার মধ্যে সমস্ত চিত্র দেখায় বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। এই সুষমা সৌন্দর্য।" ('সৌন্দর্য ও সাহিত্য', বৈশাখ ১৩১৪/সাহিত্য)

তাই এ-কথা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ সমন্বিত দৃষ্টির ফল।

আট

সাহিত্য আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে না, তা মানুষকে ভাতকাপড় দেয় না, দেয় চিরস্থায়িত্ব। "সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমালোচকের দল যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান সাহিত্যের অভাব হইতেছে, কেবল নাটক নভেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁশ হয় না। কারণ সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।" ('সাহিত্যের সামগ্রী', কার্তিক ১৩১০/১৯০৩/ সাহিত্য)। তিরিশ বছর পরে একই কথা বলেছেন, "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি-ছোঁয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।" ('সাহিত্যতত্ত্ব' ১৩৪০, সাহিত্যের পথে)। বিজ্ঞানের দাবিকে এখানে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মে ও সাহিত্যজিজ্ঞাসায় পঞ্চাশ বছর (১৮৯১-১৯৪০) ধরে বারবার বলতে চেয়েছেন, সাহিত্য কোনো বিশেষ কালের বা রুচির দাসত্ব করবে না, মদমত্ত বিজ্ঞানের অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তির কাছে বা রাষ্ট্রের কাছে প্রণত হবে না। যেখানে রসের ভোজ, সেখানে জীবনের স্বহস্তে পরিবেশন। কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা, অহংবুদ্ধি বা রুচিবিকৃতি সেখানে জয়লাভ করতে পারবে না। সাহিত্য মানবসংসারের শিল্পরূপ। এর বাইরে আর কোনো প্রাপ্তি বা লোভের প্রত্যাশা সাহিত্যের থাকা উচিত নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। সাহিত্যের আনুগত্য জীবনের কাছে, আর কোন কিছুর কাছে নয়,—বিদায়ের পূর্বে একথা প্রত্যয়দৃঢ় গভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ,—

"জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে

অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে, যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য ডন কুইকসট, ধন্য রবিনসন ক্রুশো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে, আঁকা পড়ছে জীবন-শিল্পীর রূপ-রচনা। কোনো কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্বমাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনা-কৌশলেব পরিচয় দিতে থাকে তা হলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না। 'চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপরপক্ষে—

তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।"

['সাহিত্যের মূল্য', ২৫ এপ্রিল ১৯৪১, সাহিত্যের স্বরূপ]

এখানেই সাহিত্য-শাস্ত্রী জীবনকে মেনেছেন।

১৬

কাব্যাদর্শের বিরোধ: রবীন্দ্রনাথ: দ্বিজেন্দ্রলাল

বাংলা কাব্যসংসারে একদিন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় সমাদর ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যদুনাথ সরকার তাঁর কাব্যরীতির প্রশংসা করে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। তারপর এমন দিন এলো যেদিন রবীন্দ্র-কাব্যরীতি একমাত্র আদর্শ বলে গৃহীত হ'ল। হেমচন্দ্রীয় কাব্যরীতি থেকে রবীন্দ্রীয় কাব্যরীতি ও কাব্যাদর্শে উত্তরণের ইতিহাস খুবই বিচিত্র ও কৌতূহলপূর্ণ। এই ইতিহাসে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি প্রধান ভূমিকা আছে। হেমচন্দ্রীয় কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতি অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ।

হেমচন্দ্রীয় কাব্যরীতিটি কী?

হেমচন্দ্র 'এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলা'য় বিশ্বাস করতেন। সহজ সরল বক্তব্যকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণাই কাব্যের চরম লক্ষ্য বলে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি যুগের ভেরীবাদক ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য সুদূরবর্তী অস্পষ্ট কিছু নয়, কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় তিনি বার হন নি, কোনো স্পষ্টতা-অতিক্রমী ব্যাকুলতায় আলোড়িত হন নি।

হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শ সামাজিক ও যৌথ চিন্তার পটে মুদ্রিত। তাঁর ভাবগুলি সহজ সরল সনাতন, তিনি দশজনের একজন মাত্র, নীরবে নিভৃতে আপন হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকে হেমচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। সেদিন তাঁর কবিতা বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল।

হেমচন্দ্রের কাব্যরীতি প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"তাঁহার কাব্যে সামাজিকতা অতি সুন্দর পরিস্ফুট হয়; তিনি যাহা ভাবেন যাহা করেন তাহা দশের জন্য, লোকসমষ্টির জন্য; একাকী ঘরের কোণায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন লোকের বা 'পর্ণকুটীরে অতি-বিষণ্ণ' নির্জন বনবাসীর প্রতি উদ্দেশ করিয়া হেমচন্দ্রের কবিতা গীত হয় নাই। তাঁহার প্রতি ছত্রে দেখা যায় যে তিনি জনসমষ্টির মধ্যে একজন।......

হেমচন্দ্রের প্রায় সব পদ্যেই এই সামাজিকতা আছে। কী বিন্ধ্যগিরি কী পদ্মের মৃণাল কী কালচক্র যাহাই কবি দেখেন তাহাতেই তিনি জড়িত ও দেশের কথা

ভাবেন ; শুধু এদেশ নহে, জগতের অন্যান্য দেশও তাঁহার মনে পড়ে। আবার তাঁহার কতগুলি কবিতা শ্রেণীবিশেষকে লইয়া। এমন কি 'শিশুর হাসি'তে পর্যন্ত এই সার্বজনীন ভাব আছে ; তিনি একা এই সুখকর দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন না—

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না হাসে, কে না চায়,
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল মোহন—
জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই !

এমন কি রাত্রে একাকী—

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্মবন্ধু জন।

হেমচন্দ্র বিজনচিন্তায় পর্যন্ত দেশ ও জনসমাজকে ভুলিতে পারেন না।

এই ভাবের পূর্ণবিকাশ তাঁহার স্বদেশপ্রেমসূচক পদ্যগুলিতে। এ ক্ষেত্রে হেম সর্বশ্রেষ্ঠ।" ('দুই রকম কবি : হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯০৭)

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যজীবনের সূচনায় হেমচন্দ্রের এই কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতিকে আশ্রয় করেছিলেন। 'আর্যগাথা' প্রথমভাগ (৫ মার্চ, ১৮৮২) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতার উচ্চ প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রলাল করেছিলেন (দ্রষ্টব্য : 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধ, ১৯০৬)। 'আর্যগাথা'র (প্রথম ভাগ) দেশপ্রেমমূলক কবিতা ঐ আদর্শে রচিত।

হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতার লক্ষ্য অতীত গৌরব প্রচার ও উদ্দীপনা সঞ্চার :

সেই আর্যাবর্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন (ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন (ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীর দর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,

কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি সীমা ?
সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথারে আজি সে জাতি-মহিমা !······
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?
(কবিতাবলী, ১৮৮০)

দ্বিজেন্দ্রলাল অনুরূপ মনোভাব অনুরূপ রীতিতে ব্যক্ত করেছেন—

মেল রে নয়ন ;
ভারতসন্তান উঠ—উঠ রে এখন।
শতাব্দী শতাব্দী পরে,
আবার সে রবিকরে
ভাস্বক ভুবন :
দেখ সকলেই হাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
তুমি কেন রবে আর্য বিষাদে মগন ;
বিভাবরী অবসানে
উঠ রে প্রফুল্ল প্রাণে—
প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
ইতিহাস মধুস্বরে, তব জাগরণ তরে,
ভারত-গৌরব-গান করেন কীর্তন ;
শুনি তাহা কোন্ প্রাণে
আছ পড়ি এই স্থানে
করিয়ে শয়ন।
('মেল রে নয়ন' / আর্যবীণা / আর্যগাথা ১ম, ১৮৮২)

জাতীয় উদ্দীপনা সঞ্চার, অতীত গৌরব স্মরণ, ভারতমহিমা প্রচার—হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম-কবিতার এই ছিল লক্ষ্য, দ্বিজেন্দ্রলালেরও তাই। হেমচন্দ্রের মতোই

দ্বিজেন্দ্রলাল বহির্মুখী কবিচিত্তের অধিকারী, সমাজ-সচেতন কবি, চড়া গলায় দেশপ্রেমের ভাবনা প্রকাশে উৎসুক।

হেমচন্দ্রের প্রভাব কিশোর রবীন্দ্রনাথের উপরেও পড়েছিল। তেরো বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ দুটি দীর্ঘ বর্ণনাপ্রধান কবিতা লিখেছিলেন—'অভিলাষ' (তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত, ১৮৭৪) ও 'হিন্দু মেলার উপহার' (হিন্দু মেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত, ১১ ফেব্রুঅরি ১৮৭৫)। প্রথমটি নীতিমূলক, দ্বিতীয়টি দেশপ্রীতিমূলক কবিতা।

কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের হেমচন্দ্রের প্রভাবের পরিচায়ক কয়েকটি স্তবক উদ্ধার করি। (উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য'।)

রবীন্দ্রনাথের 'অভিলাষ'—

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়। (১)
তোমার বাঁশির স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে। (২)
ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে। (৫)
কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কি গো কটাক্ষ করিবে? (২৭) (রচনা ১৮৭৪ খ্রী)

হেমচন্দ্রীয় রূপকচিত্রণ ও নীতি-আরোপ-প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলায় উপহার'—

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায় ! (১)
স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়ে নাক' পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায় ! (২)
ঝংকারিয়া বীণা কবিরা গায়,
'কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্ ! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।' (৪) (রচনা : ১৮৭৫ খ্রী)

পরাধীনতার জন্য যে বেদনা-বিলাপ এখানে ধ্বনিত হয়েছে, হেমচন্দ্রের কবিতা তার উৎস। অতীত গৌরব-স্মরণে ও বর্তমান হীনাবস্থা দর্শনে আক্ষেপ এখানে ধ্বনিত। হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ' কবিতায় এই সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছিল—

"যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস, বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা।

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত-নাম।......

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ করে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা।......

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।"

রবীন্দ্রনাথের উপর হেমচন্দ্রের প্রভাব কেবল দেশপ্রেম-কবিতার আক্ষেপে বিলাপে দেশানুরাগ-সঞ্চারে নয়, প্রকৃতি-বর্ণনায় ও প্রকৃতি-অনুভবেও লক্ষণীয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথের পূর্ণিমা নিশি-বর্ণনা :

আজি পুরণিমা নিশি
তারকা কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে।

[শৈশব-সংগীত, ১৮৮৪]

হেমচন্দ্রের অনুরূপ বর্ণনা এই বর্ণনার প্রেরণা-উৎস—

কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কলকল করে ধীরে তরঙ্গিনী-জল!

['যমুনাতটে', কবিতাবলী, ১৮৮০]

হেমচন্দ্র এই 'যমুনাতটে' কবিতায় মানুষের চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ অনুভব ও প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে কবি ব্যথিত মনের সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন :

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবনপিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত উপরি
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেছেন—উপমা ও প্রকাশরীতির সাদৃশ্য লক্ষণীয় —

কে আছে এমন যার এ হেন নিশীথে,
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠে নি উথলি।
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায় নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবানিশি তার,
হৃদয়ের এক দিক শূন্য হয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্মভেদী একটি নিশ্বাস ?

(কবিকাহিনী, তৃতীয় সর্গ, ১৮৭৮)

হেমচন্দ্রের এই প্রভাব কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে স্বল্পকাল (১৮৭৫-১৮৮৪) স্থায়ী হয়েছিল। অপর একটি প্রবল প্রভাব ইতোমধ্যে হেমচন্দ্রীয় কাব্যরীতি ও কাব্যাদর্শকে অপসৃত করেছিল ও বাংলা কাব্যে নোতুন পথ উন্মোচন করেছিল। তা হল বিহারীলালের কাব্যপথ। হেমচন্দ্রের বহির্মুখী চড়া গলায় সমাজভাবনামূলক কবিতার স্থানে এলো বিহারীলালের অন্তর্মুখী নিচুগলার ব্যক্তিভাবনামূলক গীতি-কবিতা। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ছিলেন সমাজনির্ভর বহির্মুখী কবি, বিহারীলাল সমাজ-বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কবি। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর্যগৌরববোধের উচ্ছ্বাসে বাঙালিমাত্রে তরঙ্গিত হয়েছিলেন, হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ তার প্রমাণ। এই ধবনের দেশানুভূতি কবিচেতনার বহির্মুখীনতার ফল। আবার, প্রকৃতির আশ্রয়ে সান্ত্বনা লাভ বা ভাবোচ্ছ্বাসের চরিতার্থতা লাভের যে পদ্ধতি হেমচন্দ্রের কবিতায় দেখা গেল, তার অনুসৃতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন আছে, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগে আছে। যেমন 'কে গহন বনে' কবিতাটি—

কে গহন বনে
(বসি) প্রকৃতি শোভায়, হয়ে বিমোহিত
তুষে বনরাজি গীতি প্রতিদানে।
বুঝি দুখী কেহ' ত্যজি নিজ গেহ,
সংসারের শত দ্বেষের ভয়ে,

আসিয়ে কাননে, গায় নিজ মনে,
সকরুণ তানে ব্যথিত হয়ে।
কিম্বা বনদেবী ডাকে নরগণে
লভিতে বিশ্রাম পশিয়ে কাননে।

দুই

রবীন্দ্রনাথ অচিরে হেমচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শকে নবরূপ দিলেন ; হেমচন্দ্রীয় আশা উদ্দীপনা উৎসাহ কঠোর বস্তুবিচার ও সূক্ষ্ম জীবনজিজ্ঞাসার আলোকে রূপায়িত হল। সরল শিশুসুলভ উদ্দীপনার স্থানে এলো সজাগ বুদ্ধি ও স্পষ্ট বিচার। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার নবরূপ দেখা গেল 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯), 'হাসির গান' (১৯০০) ও 'মন্দ্র' (১৯০২) কাব্যে। তার আগেই বেরিয়েছে 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩)। এ কাব্যের প্রথম ভাগের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের মিল অপেক্ষা অমিলই বেশি। কবির নিজের কথায়, "দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে। এই দশ বৎসরে বঙ্গভাষাও কত অমূল্য রত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যখন আর্যগাথার প্রথম ভাগ (১৮৮২) প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভাষায় অধিক নূতন সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল না। তাই বুঝি সে আদর পাইয়াছিল ! আজ দেশে গীতের ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জ্বল নাট্যমন্দিরে শতপ্রাণোন্মাদী গীতধ্বনির শত কোমল বেণুবীণা ঝঙ্কারের ভিতর আজ এই পুরানো সুর কি কেহ শুনিতে চাহিবে ?"

১৮৮২ থেকে ১৮৯৩ : এই দশ বৎসরে বাংলা কাব্যে যুগান্তর ঘটে গিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২) থেকে মানসী (১৮৯০) এবং সোনার তরী (রচনাকাল ১৮৯২-১৮৯৩)।—এই পর্বে বাংলা গীতিকবিতার নবজন্ম হয়েছে।

আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯৩) দ্বিজেন্দ্রলালের গীতিধর্মিতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে। নারীপ্রেম, স্পষ্ট করে বলা যায়, পত্নীপ্রেম এই কাব্যের প্রেরণাভূমি। নবজাগ্রত রোমান্টিক চেতনায় নারীর অনাবিষ্কৃত-পূর্ব মহনীয় রূপটি ধরা পড়েছে। বিশুদ্ধ লিরিক হিসাবে কয়েকটি কবিতা অনবদ্য। যেমন,

চাহি, অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক হইয়ে থাকি।

ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে ;
ওই মুখ পানে চাই ; ও মুখ কমলে
জানি না কি মধু আছে।

এই প্রেমপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যভূমি সমাচ্ছন্ন। সূক্ষ্ম হৃদয়সংবেদনা ও রোমান্টিক ভাবুকতা এই কাব্যের প্রাণ। এরপরই জীবন-জিজ্ঞাসার কাব্য এলো। ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ ও বিদ্রূপশাণিত দৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালি চরিত্রালেখ্য অঙ্কন করলেন 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানে'। তারপরই এলো 'মন্দ্র' (১৯০২) : বুদ্ধি ও যুক্তির কাব্য, স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতার কাব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সজাগ বিচারশীল মন এই তিন কাব্যে ক্রিয়াশীল।

যে-কালে (১৮৮২-৯৩) দ্বিজেন্দ্রলাল আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগের কবিতা লিখেছিলেন সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে রোমান্টিক সৌন্দর্যভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপকে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতার আয়ুধরূপে গ্রহণ করেছিলেন যে সময়ে তখনি রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ অনুভূতিকে (সৌন্দর্যানুভূতি) একমাত্র আশ্রয়রূপে অবলম্বন করলেন। তার ফলে কাব্যরীতি ও কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল পরস্পর থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ, আষাঢ়ে ও মন্দ্র কাব্যের সপ্রশংস আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, একথা ঠিক ; কিন্তু একথাও ঠিক যে তিনি দ্বিজেন্দ্র-কাব্যরীতি ও কাব্যাদর্শকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিচারপ্রবণ যুক্তিবাদী বাস্তবসচেতন স্পষ্টতাপন্থী কবি। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রবণ সৌন্দর্যমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক ব্যাকুলতার কবি। বুদ্ধি ও যুক্তি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আশ্রয়, সৌন্দর্যানুভূতি ও কল্পনা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছুটা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য। আর দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা স্পষ্ট সহজবোধ্য। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রীতি তর্কপ্রবণ গদ্যাত্মক রীতি, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রধান বাস্তববর্জিত রীতি। দ্বিজেন্দ্রলালে প্রত্যক্ষতার ছবি, রবীন্দ্রনাথে সুদূরের আহ্বান।

হেমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিতার ধারা অনুসরণ করে যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন,

"হেমচন্দ্রের যৌবনে যে প্রবল আশা ও স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালাকে নাচাইয়াছিল তাহা চলিয়া গেল ; কারণ ফল আশানুরূপ হয় নাই। নৈরাশ উৎসাহের স্থান অধিকার করিল। নেতারা 'সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি' জগৎজয়ের আশা অনেক দিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছেন ; শুধু দুটো মোটা খেয়ে মোটা প'রে মান সম্ভ্রম বজায় রেখে দেশের

লোক দেশে থাকবে এই ভাবনায় ব্যস্ত।......মানসদৃষ্টি সঙ্কুচিত হওয়ায় আমাদের ভাবগুলি বেশী গভীর, বেশী সূক্ষ্ম, বেশী তীব্র।"

[দুই রকম কবি : হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। 'প্রবাসী' ভাদ্র ১৩১৪, ১৯০৭ খ্রীঃ]

অন্তর্মুখিতা রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণ—এই কথাটি যদুনাথের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। বহির্মুখিতা থেকে অন্তর্মুখিতার পথেই বাংলা কবিতার যাত্রা। বাংলা কাব্যে উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশক এই যাত্রাপথের কাহিনী। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' ও 'ভারত বিলাপ' কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমনোমোহিনী' ও 'সে যে আমার জননী রে' কবিতাকে, এবং হেমচন্দ্রের 'পদ্মে মৃণাল' কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাকে উপস্থিত করে যদুনাথ দুই কবির দৃষ্টির ভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বায়রনের ভক্ত, দ্বিজেন্দ্রলালও তা'ই। সুরা শোণিত ও স্বাধীনতার কবি বায়রন উচ্চকণ্ঠ, স্পষ্টতাবাদী, ব্যঙ্গপরায়ণ। দ্বিজেন্দ্রলালও তা'ই। বায়রন প্রকৃতির বিচিত্র রূপদর্শনে উৎসাহী, প্রকৃতির অন্তরোদ্ঘাটনে আগ্রহী নন, কালের অমোঘ বিধানরূপে সমুদ্রকে তিনি বন্দনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তা করেছেন। আপন সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত বায়রন ব্যঙ্গ-কবিতায় প্রতিশোধ নিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তা করেছেন। বায়রন যুক্তিবাদী, অনেক সময়ে সমাজ সম্পর্কে তিক্ত। দ্বিজেন্দ্রলালও তাই।

সুতরাং একথা স্বীকার্য দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রকৃতির ভিন্নতার জন্যই তিনি রবীন্দ্র-প্রবর্তিত কাব্যসরণি গ্রহণ করেন নি। উভয়ের সৌহার্দ্যকালে উভয়ে দুই কাব্যপথের পথিক, পরবর্তী কলহ ও সংঘর্ষ বড় কথা নয়। দ্বিজেন্দ্রীয় কাব্যরীতি, রবীন্দ্রীয় কাব্যরীতি—দুই রীতির মূলে আছে জীবনদৃষ্টি ও কাব্যাদর্শের ভিন্নতা, ব্যক্তিগত বিরোধ নয়।

বস্তুজগৎ সম্পর্কে কবিমনের অসহনীয়তা ও অতৃপ্তিবোধ, মৃত্যুর প্রতি আসক্তি, দুঃখের বন্দনা, বিষাদের আবাহন প্রমুখ রোমান্টিক লক্ষণ সন্ধ্যাসংগীতে (১৮৮২) ফুটে উঠল। তারপর প্রভাতসংগীতে (১৮৮৩) এক প্রবহমান আনন্দ-অনুভূতি স্রোতে কবির নিমজ্জন। 'অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা' থেকে আনন্দধ্বনির উৎসার ও প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ কাল থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে আনন্দস্রোতে প্রত্যাবর্তন—এই অনুভূতি, এই আনন্দ প্রভাতসংগীত কাব্যে বাংলা গীতিকবিতার নবজন্ম ঘটাল। রোমান্টিক কবিধর্মের সব লক্ষণ এখানে প্রতিভাত। মানসীতে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবিচিত্তে জেগে উঠেছে। এই আকাঙ্ক্ষাকে কবি বলেছিলেন Despair ও Resignation। প্রকৃতির অসীমতা ও রহস্য সম্পর্কে উপলব্ধি কবিতায় এমন এক ছায়া (অস্পষ্টতা, সুদূরতা) সঞ্চার করে, যা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বুদ্ধির

অতীত, তা 'অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া'। 'মানসী'তে (১৮৯০) এই রহস্যচ্ছায়া আপতিত হয়েছে, প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতিমারূপে দেখা দিয়েছে। একদিকে প্রকৃতি সম্পর্কে সুদূর রহস্যময়তার উপলব্ধি, অপরদিকে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়সম্পর্ক স্থাপন—দুয়ে মিলে মানসী কাব্য এই নবতর সৌন্দর্যচেতনায় উন্নীত। 'সন্ধ্যায়', 'ধ্যান', 'শেষ উপহার' কবিতা এবং 'মেঘদূত', 'একাল ও সেকাল', 'অহল্যার প্রতি' কবিতা প্রকৃতিভাবনার এই দুই রূপের পরিচায়ক।

'সোনার তরী' কবিতাটিতে (রচনা : ফাল্গুন ১২৯৮/মার্চ ১৮৯২) রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

তিন

বাংলা সাহিত্য আসরে রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূচনা হয় বর্তমান শতাব্দীর সূচনায়। এই বিরোধিতা উপলক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতিগত মতভেদ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূচনা হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১১ বঙ্গাব্দে)। এই বৎসর হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয়মূলক প্রবন্ধটি লেখেন, সেটি তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম রচনা। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তন ও জীবনদেবতা-সম্পর্কিত আলোচনার উৎসভূমি। এই প্রবন্ধে কবি জীবনবৃত্তান্ত থেকে 'বৃত্তান্ত' বাদ দিয়ে 'জীবন'কেই বড়ো করে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধ-শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিতেছে। সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে…তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।'

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত অচিরে সমর্থিত হল অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ' (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ১৩১৩/১৯০৬) প্রবন্ধে। কাব্যের সত্য যে বৃহৎ জীবনের গভীর সত্য—এই অভিমত এখানে ব্যক্ত হ'ল।

অজিতকুমারের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ উপলক্ষে আসরে প্রবেশ করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামক প্রতিবাদ-প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্য-ভাবনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রকাব্যে 'বৃহৎ আইডিয়া'র নামে যে 'অস্পষ্টতা'কে অজিতকুমার সমর্থন করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তার প্রতিবাদ করলেন এবং 'সোনার তরী' কবিতাটিকে 'দুর্বোধ্য, অর্থশূন্য ও স্ববিরোধী' আখ্যা দিলেন।

এখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষান্ত হলেন না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত আত্মপরিচয়মূলক প্রবন্ধটিকে আক্রমণ করে লিখলেন, 'কাব্যের উপভোগ' (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, মাঘ

১৩১৪/১৯০৮)। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কবির 'দম্ভ ও অহমিকা' লক্ষ্য করেছিলেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্টা। কেননা এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।' (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪/১৯০৮)।

'কাব্যের অভিব্যক্তি' (১৯০৬) প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু তীব্রভাবেই 'সোনার তরী' কবিতাটিকে আক্রমণ করেছিলেন।

"কবিতাটির গদ্যার্থ এই :

একজন কৃষক শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ধান কাটিয়া নির্ভরসা হইয়া কূলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল যে এক 'যেন চিনি মাঝি' পাল তুলিয়া দিয়া নৌকো করিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া ধানগুলি দিল। পরে নিজেও যাইতে চাহিল। মাঝি তাহাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল।

এখন কবিতাটির গদ্যার্থ যা দাঁড়ায় তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কোন কৃষক রাশি রাশি ধান কাটিয়া, কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কূলে নির্ভরসা হইয়া বসিয়া থাকে না; সে ধান সে বাড়ী লইয়া যায়। এবং কোন কৃষক ধান কাটিয়া গৃহে না লইয়া গিয়া, স্ত্রী-পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া এক 'যেন মনে হয় চিনি' মাঝির সহিত পলাইয়া যাইতে চাহে না। কৃষকের নির্ভরসা হইবার কোনই কারণ কবিতার কোন স্থানে পাওয়া যায় না। বরং রাশি রাশি ধান কাটিয়া তাহার বিশেষ উৎফুল্ল হইবারই কথা। কবিতাটি নিশ্চয় রূপক। কবি তাঁহার 'বৃহৎ আইডিয়া' প্রকাশ করিবার জন্য যে উপমা বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা মূলে অস্বাভাবিক।

..... কাবতা হইতে কি অর্থ দাঁড়ায়?

যিনি আমার দেবতা, তিনি আমার হৃদয়ে সদা বিদ্যমান। তিনি এই মাঝির মত কোথা হইতে আসিয়া ভাসিয়া বিদেশে চলিয়া যান, যাঁহাকে 'যেন মনে হয় চিনি', তাঁহাকে কেহই সর্বস্ব অর্পণ করে না। তাহার পর এই 'বিদেশে' 'কোন দিকে নাহি চায়', 'গান গায়', 'ছোট সে তরী'—এ সকলেরই বা আধ্যাত্মিক অর্থ কি? সব কথারই কি আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিবে!—ভাল! তাহার পর এক শ্লোকে কবি আরাধ্য দেবতাকে তাঁহার সর্বস্ব বিনা সর্তে দান করিতে চাহিতেছেন; পর শ্লোকেই বলিতেছেন, 'আমারে লহ করুণা করে', এ কি সুসঙ্গত?......

এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নহে—অবোধ্য নহে—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।

পাঠক কবিতাটির গদ্যার্থ দেখিলেন, পদ্যার্থ দেখিলেন, এখন দেখুন ইহার বর্ণনা কিরূপ স্বভাবসঙ্গত। কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না ; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে।......তাহার পরে শ্রাবণ মাসে 'এল বরষা' কিরূপ ? বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসেই বর্ষা আসে। তাহার পবে 'একখানি ছোট ক্ষেত' হইতে 'রাশি রাশি ভারা ভারা' ধান হইয়াছে। ক্ষেত বডই উর্বরা ! ক্ষেতের 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'। ক্ষেতখানি তবে একটি দ্বীপ। তবে এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। এসব জমি শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহিব হয়। তাহাব পর এক শ্লোকে পড়িলাম মাঝি 'তরী বেয়ে' আসিতেছে। তাহার পরেই দেখি 'ভরা পাল'। এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ ভরা পালে কেহই তরী বায় না। শ্লোকের একছত্রে দেখিলাম 'নৌকা আসে পারে'। পরে একছত্রে দেখি সে যায় 'কোন্ বিদেশে'। নিশ্চয় মাঝি নৌকা হঠাৎ ফিরাইয়া লইয়াছে।

আমাব বলা উদ্দেশ্য, যে, হেঁয়ালিতে কবিতা লিখিলেই কবিতা উত্তম হয় না।..... কবিতা হেঁয়ালী নহে। কবিতা মিষ্ট ছন্দোবদ্ধ নহে। যে কবিতা পড়িতে পড়িতে হৃদয় আলোড়িত হয়, উৎসাহে আনন্দে কারুণ্যে হৃদয় ভবিয়া যায়, যাহা প্রকৃতির বা মানব-হৃদয়ের সুচিত্র, যাহা আত্মাকে প্রসারিত করে ও বহির্জগতের দিকে মহা সহানুভূতিতে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই কাব্য। কাব্য যদি দুর্বোধ্য হয় তাহা হইলে এ উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় না।

যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা। তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না।.....অস্পষ্টতা দোষ, গুণ নহে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবিশ্বাস এখানে ব্যক্ত হয়েছে : যা স্পষ্ট, যা প্রত্যক্ষ, স্বভাবসঙ্গত, সুবোধ্য, অর্থযুক্ত, যুক্তনিষ্ঠ, বস্তুগ্রাহ্য, তা'ই উৎকৃষ্ট কবিতা। দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতার কবি, যুক্তিনিষ্ঠা ও বাস্তবের কবি।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যচেতনা থেকে তা দূরবর্তী। 'সোনার তবী' কবিতার রোমান্টিক বিষাদ, প্রকৃতির জন্য ব্যাকুলতা ও সুদূরের আমন্ত্রণে সাড়া দেবাব আগ্রহ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যভাবনায় স্থান পায় নি। সেকারণেই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যভাবনা—সৌন্দর্যবাদ, আনন্দবাদ ও অনুপ্রেরণাবাদকে দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রহণ করতে পারেন নি। (রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মতাদর্শের বিরোধের বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্র-বিতান' ও 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস'।)

দ্বিজেন্দ্রলালের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন যদুনাথ সরকার। তাঁর মতে—

'রবীন্দ্রনাথের গত ষোল বৎসরের (১৮৯০—১৯০৬ মানসী হইতে খেয়ার) কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে।·· ···এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন স্মৃতি-অভ্যস্ত ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষে নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না; এবং না বুঝিতে পারিয়া অমনি নববাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে ঢিল ছুঁড়িলে শুধু 'হাসির সমালোচনা' করা হয়।" [প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৩।১৯০৬]

চার

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যভাবনা থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতো দূরবর্তী ছিলেন তার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল তাঁর মন্দ্র কাব্য (১৯০২)। স্পষ্টতা ও গদ্যাত্মকতা মন্দ্রকাব্যের ভিত্তিভূমি। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক স্বপ্নের কবি, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রখর বস্তুচেতনার কবি। মন্দ্র কাব্য থেকে রোমান্সের কল্পনা নির্বাসিত, বাস্তববোধ সদা-অভ্যর্থিত। এই বাস্তববোধকেই দ্বিজেন্দ্রলাল এক কঠিন আবেগের তরঙ্গে স্পন্দিত করে তুললেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল উগ্র ব্যক্তিত্ববাদী কবি। তাঁর ব্যক্তিত্বের উগ্র স্পর্শ রয়েছে মন্দ্র কাব্যে। হেমচন্দ্র যেখানে শুধুই সামাজিক দৃষ্টির কবি, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বস্তুসচেতন যুক্তিবাদী কবি। এই বাস্তববোধের উৎস কবির সচেতন সদাজাগ্রত চিন্তাবৈদগ্ধ্য। এই চিন্তারীতিতেই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্ট জীবনচেতনা ও সংশয়-জিজ্ঞাসা মন্দ্রের কবিকে এক প্রশ্নসংকুল দ্বন্দ্ববিদীর্ণ পৃথিবীতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। কবিহৃদয়ের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

হায় সত্য! হা বিজ্ঞান! হা কঠোর! হা নৃশংস!
কাড়িয়া নিয়েছ সব জীবনের সার অংশ;
সুন্দর দেহের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া, তার
কঙ্কাল রেখেছে ছাড়া—শুষ্ক শুষ্ক সভ্যতার। —স্বপ্নভঙ্গ

কবি উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলেছেন—

দিব সত্য যত চাহো; উনবিংশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে জানি স্থির
অন্য গান লাগিবে না ভালো! —স্বপ্নভঙ্গ

বাস্তববোধ কবিকে সচেতন করে তোলে কঠোর সংসার সম্পর্কে। স্বার্থান্ধ সৌন্দর্যবিরহিত কর্দমাক্ত কলুষিত জীবনের রূপ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দেয়—

কোথা হতে ক্ষরিয়াছে মধু—অমনি এ
ব্যগ্র পিপীলিকাদল সারি সারি গিয়ে
চায় স্বাদ মিটাইতে কাল্পনিক ক্ষুধা,
অমর হইবে যেন পিয়ে সেই সুধা !
কোথায় ক্ষরেছে ব্রণ—মক্ষিকার মত
ছুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্রণক্ষত
লক্ষ্য করি'।

—আগন্তুক

কবির মনে হয়—

ভূধর দুরধিগম্য, দূর হতে অতি রম্য
ধূম্র নীল তুষার কিরীটী—
নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর, কঙ্করকীর্ণ,
শুষ্ক,—যেন উকিলের চিঠি।

—কুসুমে কণ্টক

তবে কি তিনি কেবলি সংশয়বাদী, সংসারবিরক্ত, অজ্ঞেয়বাদী কবি? জীবনের প্রতি কোনো মমতাই কি তাঁর নেই? জীবন সম্পর্কে কোনো আশ্বাস মন্দ্র-রচয়িতা দিতে পারেন নি !

একথা ঠিক, জীবনের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতাই তিনি দেখেছেন। তবু তা শেষ কথা নয়। মন্দ্র কাব্যে ব্যঙ্গাত্মক সংশয়পূর্ণ জীবনদৃষ্টির কালো মেঘের অন্তরালে বিদ্যুৎরেখার মতো ঝলসে উঠেছে সৌন্দর্যের সংকেত, জীবনের প্রতি মমতা, রোমান্টিক স্বপ্নের জন্য ব্যাকুলতা। বাস্তবজীবন সম্পর্কে কবির শ্রদ্ধা নেই, আছে অসহিষ্ণুতা। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ঝলসে উঠেছে তীক্ষ্ণ অসির মতো। তবু, তারি অন্তরালে দেখা দিয়েছে জীবনানুরাগ।

নহে সবই কালসর্প, কীট ও কণ্টক ;
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।—আছে বিশ্বে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব—
প্রেমের রাজস্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা,—
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালোবাসা,

চিরপ্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম,
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম,
চিরস্নিগ্ধ ; যেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান। —আগন্তুক

তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন।

খুলে দিও দ্বার।—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো,
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিনে যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলিগন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;— আমি ওপারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।

—সুখমৃত্যু

কবির জীবনানুরাগ ও মর্ত্যমমতার টেস্টামেণ্ট এই 'সুখমৃত্যু' কবিতা।

মন্দ্রের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তবচেতনা ও যুক্তি-আশ্রয়কে অবলম্বন করেছেন। রোমাণ্টিক স্বপ্নলোক নয়, প্রত্যক্ষ মানবসংসার তাঁর বিচরণক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও কল্পনাভঙ্গির ভিন্নতা ধরা পড়ে একই বিষয়ে রচিত দুজনের দুটি কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ 'বধূ' কবিতায় (মানসী কাব্যভুক্ত) বধূ-জীবনের বাস্তব বেদনাকে রূপান্তরিত করেছেন মানবহৃদয়ের চিরন্তন রোমাণ্টিক ব্যাকুলতায়। প্রকৃতির প্রতি স্নেহাকর্ষণ ও প্রকৃতি-জননীর স্নেহ-আহ্বান 'বধূ' কবিতায় ব্যক্ত।

'বেলা যে পড়ে এলো, জলকে চল্'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল্!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল্'।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'নববধূ' কবিতায় এই রোমান্টিক প্রকৃতি-ব্যাকুলতা নেই, আছে সামাজিক কৌতূহল, অনুকম্পা ও বাস্তব গদ্যভঙ্গি। বাঙালি মেয়ের কৈশোর, যৌবন ও নবজীবনের খুঁটিনাটি গদ্যাত্মক বর্ণনায় বাঙালি সংসারের গার্হস্থ্য রূপটি চিত্রিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের বধূর মুখে শুনি বিবাহোত্তর অভিজ্ঞতার বর্ণনা—

কেহ বা কহে 'দিব্যি বৌ' কেহ বা কহে 'ভালো'
কেহ বা কহে 'মন্দ নহে' কেহ বা কহে 'কালো'।
চলিয়া যায় বিবিধ সমালোচনা করি হেন
আমি একটা নূতন কেনা ঘোড়া কি গরু যেন।

এখানে রোমান্টিকতার কোনো প্রশ্রয় নেই, আছে তীক্ষ্ণ বাস্তবচেতনা। এই বাস্তব অস্তিত্ব-সচেতনতাই এই কবিতার রস।

আর রবীন্দ্রনাথের বধূর মুখে শুনি—

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ
কেহ বা ভাল বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

কঠিন স্নেহহীন সংসারে নির্মমতায় পীড়িত বধূর কণ্ঠে বেজে উঠেছে স্নেহাকাঙ্ক্ষা, তার চরিতার্থতা প্রকৃতি-জননীর স্নেহাশ্রয়ে এবং তা মানব-হৃদয়ের চিরন্তন রোমান্টিক ব্যাকুলতায় উত্তীর্ণ হয়েছে—

'বেলা যে পড়ে এলো, জল্‌কে চল্‌'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুই চিন্তালোকের অধিবাসী। একারণেই দুজনের কাব্যরীতি ও কাব্যাদর্শে এতো দুস্তর ব্যবধান। উনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দের প্রথম প্রহরে বাংলা কাব্যে এই দুই রীতি ও আদর্শের বিরোধ ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতির জয় ঘোষিত হয়েছে।

১৭

গাজিপুর : পদ্মাতীর : রবীন্দ্রনাথ

"আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি।" 'মানসী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন। নোতুন পরিবেশে রবীন্দ্র-কাব্য বারবার নোতুন পথে যাত্রা করেছে, এই সূত্রের অনুসরণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গোড়ার দিকের আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক ও রোমান্টিক, দূর ঐতিহাসিক ও নিকট বর্তমান পরিবেশের প্রভাব কতো গভীরভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মুদ্রিত হয়েছে, তা নোতুন করে ভেবে দেখা দরকার। আর কিছু না হোক, রবি-প্রতিভাকে নবরূপে আবিষ্কার করা যাবে। 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' পরিবেশ-প্রভাব-পটভূমিতে আমরা রবি-প্রতিভা-সন্ধানে নিযুক্ত হতে পারি।

১৮৯০ থেকে ১৯১০ : এই বিশ বৎসরের পর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্য আপন ক্ষমতার জোরে নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্বে রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে—মানসী, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, কণিকা, কথা ও কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, উৎসর্গ, স্মরণ, শিশু, খেয়া ; গদ্যগ্রন্থ—য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র, পঞ্চভূত, শান্তিনিকেতন ; নাটক ও প্রহসন—মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, বিসর্জন, মন্ত্রী-অভিষেক, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ, শারদোৎসব। এই পর্বে তিনি চারটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন—হিতবাদী (সাহিত্য-বিভাগ), সাধনা, নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার। এই সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গে ও উড়িষ্যায় ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দেখাশোনা করেন, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-রূপে কাজ করেন। এই পর্বেই তিনি সাহিত্য-নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

এই পর্বে তিনি অতিশয় কর্মব্যস্ত ছিলেন এবং উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে নিরন্তর ছোটাছুটি করেন। নিভৃতে নির্জনে ধ্যানের প্রশান্তি ও অবসর-লাভের সৌভাগ্য এই পর্বে খুব কমই এসেছে। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাত তাঁকে এ-সময়েই পেতে হয়েছে। পিতারূপে, স্বামীরূপে সংসারের কঠিন কর্তব্যভার বহন করতে হয়েছে। পিতা, ভ্রাতৃজায়া ও সহধর্মিণীর মৃত্যুশোক, মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য এবং দেশমাতৃকার আহ্বান তাঁকে এই পর্বে তিনদিক থেকে আকর্ষণ করেছে।

অথচ এসময়েই তাঁর কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, গল্প ও প্রবন্ধের ডালা ভরে উঠেছে ; মহাকালের তরণীতে সাহিত্যের পাকা ফসল তিনি এ-সময়েই তুলে দিতে পেরেছেন।

কর্মক্লান্ত নগরজীবনের শ্রান্তিপিষ্ট কবি বারবার এ-সময় প্রকৃতির কাছে ছুটে যেতে চেয়েছেন এবং প্রকৃতিকে অসংস্কৃত রূপেই গ্রহণ করার জন্য তার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই প্রকৃতিপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে উপরিলিখিত কাব্যনিচয়ে ও গল্পগুচ্ছে। সংসারের সহস্র দাবি মিটিয়েই তিনি কিভাবে প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তার পরিচয় এখানেই পাই। পদ্মার বুকে বজরায় তিনি অকারণ পুলকে ভেসে বেড়াতে পারেন নি। জমিদারির কাজ, কলকাতায় সংসার ও সমাজ, সাহিত্যপত্রিকা ও স্বদেশী আন্দোলন, বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের সহস্র চিন্তা তাঁর নির্জন সাধনায় হানা দিয়েছে। নির্বিঘ্ন প্রকৃতিধ্যান ও সৌন্দর্যসম্ভোগের অবসর এ-সময় তিনি পান নি।

অথচ এই পর্বেই দেখি প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্যধ্যানে কবিমন কী ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, কবিতায় গল্পে প্রবন্ধে ভাষণে ছায়াপাত করেছে, কাব্যপথে মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজে উঠেছে। কবি যে-কর্মের ক্রীতদাস ছিলেন না, তিনি যে ধ্যানের মুক্তপুরুষ ছিলেন, তার পরিচয় এখানে পাই। প্রতিভার যে আগ্নেয় কিরীট রবীন্দ্রনাথ মাথায় পরেছিলেন, বেদনার মূল্যে তা ক্রীত, শোকের অনলে তা পরিশুদ্ধ। সেই মুক্ত শুদ্ধ বাণীসাধক কিভাবে সংসারের সহস্র বন্ধন ও পিছুটানকে আকর্ষণ করে প্রকৃতির আনন্দ দু'হাত ভরে গ্রহণ করে জীবনে সম্ভোগ করেছিলেন, তার পরিচয় এ পর্বে পাই।

দুই

গাজিপুর কবিজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'মানসী' কাব্যের প্রধান ২৮টি কবিতা এখানে বাসকালে রচিত হয়। এই রোমান্টিক শহর কবিমনে শিশুকাল থেকেই স্বপ্নের ঘোর সৃষ্টি করেছিল। গাজিপুরে যখন তিনি যান, তখন পিতা বর্তমান, সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হয় নি, পত্নী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা বেলাকে নিয়েই তাঁর সংসার। গাজিপুর তাঁকে টেনেছিল দুটি কারণে—গাজিপুরের গোলাপ-খেত, এর অনুষঙ্গে মনের মধ্যে পেয়েছিলেন রোমান্স-স্বর্গ সিরাজের আকর্ষণ ; এবং প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী দুর্গমালা। বলা বাহুল্য, বাস্তবের গাজিপুর রোমান্সের গাজিপুরের সমকক্ষ হতে পারল না। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষে তিনি গাজিপুর যান, ১২৯৫-এর বর্ষাশেষে কলকাতায় ফেরেন। এই ছয় মাসে গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যের মূল্যবান ফসল। গাজিপুর সিরাজ-সমরখন্দ নয়, আগ্রা-দিল্লী নয় ;

তথাপি গাজিপুর কবিমানসের বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র বলে প্রমাণিত হয়েছিল। 'মানসী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে।"

এই মুক্তির আনন্দ 'মানসী' কাব্যের ২৮টি কবিতায় ধরা পড়েছে। যে নোতুন পরিবেশে তিনি এগুলি রচনা করেন, তার বর্ণনাও এখানে পাই। কবি বলেছেন:

> "একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকা চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচান একটা মহা-নিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায়. খোলার চালওয়ালা পল্লী।"

এই পরিবেশে রচিত কবিতাগুলিতে 'মানসী' কাব্যের মর্মকথাটি ব্যক্ত হয়েছে। তার সুর নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নের সুর, স্বপ্নচারণায় ও রোমান্সের সৌন্দর্যলোক-পরিভ্রমণে তার জগৎ আবদ্ধ। সৌন্দর্যের স্রোতে গা ভাসাবার অনুকূল অবসরস্থল এই গাজিপুর। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাড়ির নিত্য-কোলাহলের পর এই অক্ষুন্ন অবসর কবিকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করল।

সংসারের রহস্যকে দূর থেকে দেখার, নিভৃতে প্রেম-সম্ভোগের, পত্নীর নিরন্তর সাহচর্যের অনুকূল অবকাশ মিলল অলস প্রতপ্ত মধ্যাহ্নের কোকিলডাকা মুহূর্তগুলিতে। 'মানসী' কাব্যে যে বৃহতের জন্য ব্যাকুলতা, তা এখানেই দেখা গেল। ভোগের জগৎ থেকে ভোগোত্তর জীবনের কবিহৃদয়ের ব্যাকুল গভীর তীব্র ক্রন্দন এখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠল। সংসার-প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কবিমানস যে তৃপ্ত নয়, জীবন-মধ্যাহ্নে, প্রতপ্ত যৌবনের মধ্য দিনেই যে ব্যাকুলতা কবিহৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করে দিচ্ছে, তার পরিচয় এখানে পাই। গাজিপুরের রুক্ষ উদাস প্রকৃতির প্রভাব 'মানসী' কাব্যে প্রবল। এ কাব্যের যে প্রকৃতি-দৃষ্টি, তা প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরা রমণীরূপে দেখেছে; প্রকৃতিকে স্নেহশালিনী জননীরূপে দেখে নি। সমাজ-সংসার-প্রকৃতিতে আপন ধ্যানের সমর্থন

না পেয়ে বেদনাকাতর কবিকণ্ঠে যে আর্ত ক্রন্দনধ্বনি বেজে উঠেছে, গাজিপুর তাকেই ভাষা দিয়েছে।

কবি যখন গাজিপুরে এসেছেন, তখন সঙ্গে এনেছেন বৌ-ঠাকরুনের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর) মৃত্যুজনিত শোক। সেই শোক তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে আছে। সঙ্গিনী তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবী ও কন্যা বেলা। এই মৃত্যুশোক এবং পত্নীপ্রেম : এ দুয়ের টানা-পোড়েনে কবিহৃদয় ক্ষতবিক্ষত। এই পটভূমিতে গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি বিচার্য।

কবি বলেছেন,

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে৷
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
['জীবন-মধ্যাহ্ন']

তারপর কুটিল হল পথ, জীবন হল জটিল, বারবার পতন ঘটল। সকল আশা ও বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, তাই কবির অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা—'কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি, কোন্ পথে চলেছে জগৎ'। গাজিপুরের সেই 'কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার প্রান্তরের প্রান্ত আম্রবনে', 'নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে', 'দূরদূরান্তরশায়ী উদাস মধ্যাহ্নে' কবি তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করেছেন।

নিরুদ্ধ শোক আজ বিষাদের অশ্রুতে মুক্তি পেল—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষঃস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা। ['জীবন-মধ্যাহ্ন']

কিন্তু অত সহজেই সমস্যার সমাধান হয় না। গুরুভার শ্রান্তি কবিকে আচ্ছন্ন করে, প্রশান্ত প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় আর্ত ক্রন্দন :

কত বার মনে করি পূর্ণিমা-নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখিসম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন। ['শ্রান্তি']

জীবন-মানসীর স্মৃতি কবিকে তাড়না করে ফেরে। 'বিচ্ছেদ', 'মানসিক অভিসার', 'পত্রের প্রত্যাশা' কবিতায় কবিমনের গোপন কামনা ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কবি জাগ্রত হয়েছেন, আরামের শয্যাতল ছেড়ে বেদনার পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই কবিকে শান্ত করে না।

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাই এই কাব্যের উপজীব্য। এই তার শক্তি, এই তার দুর্বলতা। 'মানসী' কাব্যের জনপ্রিয়তার মূল এইখানে। কোনো বাস্তবাতীত প্রেরণা বা স্বর্গীয় অনুভূতি এখানে নেই। প্রকৃতি এখানে কবির কাছে 'red in tooth and claw', তা নিষ্ঠুর, অন্ধ, মানুষ-হৃদয়ের বেদনার প্রতি উদাসীন। কবির কাছে এখন মনে হচ্ছে,—God's in his heaven, and all's *wrong* with the world। নিষ্ঠুর উদাস প্রকৃতির পরিবেশে মানসিক অশান্তির লগ্নে এটাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। কবির—

মনে হয় সৃষ্টি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিবে বেদনা।
['নিষ্ঠুর সৃষ্টি']

'মানসী' কাব্যের প্রকৃতি-চেতনা অনেকটা বায়রনীয় চেতনার সমগোত্রীয়। মানব-জীবন ও সংসার সম্পর্কে 'মানসী' কাব্যে প্রকৃতির প্রতি কোনো মায়ামমতা নাই। গাজিপুরে প্রাকৃতিক পরিবেশেও কবি সান্ত্বনা পান নি। 'প্রকৃতির প্রতি', 'মরণস্বপ্ন', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'কুহুধ্বনি', 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতাগুলি তার পরিচয়স্থল।

গাজিপুর সম্পর্কে কবি বলেছেন—"কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়।" এই কোকিলের ডাক 'কুহুধ্বনি' কবিতার উৎস। সংসারের সকল সংগ্রাম-কোলাহলের উপরে চিরন্তনের দাবি নিয়ে ওই কুহুধ্বনি। এ এক নোতুন Ode to the Nightingale।

'কুহুধ্বনি' কবিতার মধ্যাহ্ন-দৃশ্যটি গাজিপুরের বাংলো থেকে দেখে লেখা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বঙ্গেতর গ্রামের কী নিপুণ আলেখ্য !—

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি ;
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূর নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি ;
রাখালশিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে ;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।

এই মধ্যাহ্ন-চিত্রের আবহ-সংগীত কোকিলের পঞ্চমে কুহুধ্বনি। তা শুনে কবির মনে হয়—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর ;
সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়-স্বর।

'মানসী' কাব্যের এই মূল সুর—বিষাদ ও শ্রান্তি—despair ও resignation।

'মানসী' কাব্যের উচ্চকোটির প্রেমকবিতাগুলি ('বধূ', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম', 'অপেক্ষা', 'সুরদাসের প্রার্থনা') গাজিপুরেই রচিত। বাস্তবজীবনে প্রেমের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি ঘটে অনিবার্য ব্যর্থতায়, আমাদের সংসারের কঠোর সত্যের সঙ্গে অন্তরতম ব্যাকুলতার কোনো সঙ্গতি নেই, এই গভীর উপলব্ধি এসকল কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। জীবন-মানসী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-আঘাতে উজ্জীবিত কবিমানসে এই সত্য গাজিপুরের অক্ষুন্ন অবসরের গভীর চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যাকুল সুদূরের আহ্বান শুনি 'বধূ' কবিতায়—

"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্‌!"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধাঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌"।

সংসারে প্রেমের অপমান ঘটে, বিকৃতি দেখা দেয়, সে-কথা কবি বলেছেন—

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো। ['ব্যক্ত প্রেম']

প্রেমের ইতিহাসে এটাই ট্রাজেডি।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে!

['গুপ্ত প্রেম']

এই বেদনার অপমান কবিকে সংসারের স্থুল প্রেম থেকে দূরে নিযে গেছে। 'মানসী' কাব্যের অন্যতম প্রধান কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা' গাজিপুরে রচিত। পরবর্তী কাব্যে কবির উত্তরণের আভাস পাই এই কবিতায়। স্থুল কামনা ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের রাজ্য ছেড়ে কবি মহত্তর প্রেমের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, নর্মসখী মানসসুন্দরীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন—এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত এখানে পাই। এ কবিতার দশম স্তবকে মানসসুন্দরীর প্রথম আভাস পাই ঃ

বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?

এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।

মানসসুন্দরী সম্পর্কে কবি এই আশা ব্যক্ত করেছেন—।

চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, এই চাঁপাগাছ
দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নবজগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

দেশকালাতীত বাস্তবোত্তর এই সৌন্দর্য-প্রতিমাই মানসসুন্দরী। কবি এখন লালসা ও কামনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের মহত্তর স্তরে পৌঁছেছেন, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের অশান্তি ও সংশয় এখন সমাপ্ত হতে চলেছে, 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে সর্বপ্রেমতৃষা' তার ইঙ্গিত পেয়েছেন। 'For ever shalt thou love and she be fair' এ-কথা কবি-জীবনে সত্য হতে চলেছে। তাই গাজিপুরে রচিত এই কবিতা রবীন্দ্র-প্রেমকবিতার একটি আলোকস্তম্ভরূপে বর্তমান রইল।

'সোনার তরী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণে 'মানসী' কাব্য সম্পর্কে কবি পুনর্বার বলেছেন :

"মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলাঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম, এর পূর্বে তা কখনো করিনি। নতুনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে; তারই এসেছিল ডাক; মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল।"

গাজিপুরের রোমাণ্টিক পরিবেশ তাই মানসী-কাব্যের প্রধান প্রেরণাস্থল হয়ে রইল। এর পর হল পট-পরিবর্তন ও পালা-বদল।

তিন

'সোনার তরী' ও 'মানসী' কাব্যের রচনার মধ্যে ব্যবধান দেড় বৎসর। এই সময়ে কবি 'হিতবাদী' (সাহিত্য-বিভাগ) ও 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন ও উত্তরবঙ্গ-উড়িষ্যায় ঠাকুরবাড়ির জমিদারি-পরিদর্শনে আত্মনিয়োগ করেন। এই জমিদারি-পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনিচ্ছা ছিল, পিতার আদেশে তিনি এই কর্মে প্রবৃত্ত হন। তার ফলে বাংলা সাহিত্যের ঘরে যে ফসল ওঠে, তা অমরতার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সোনার তরী-চিত্রা-গল্পগুচ্ছ-ছিন্নপত্র : এ ফসলের ক্ষেত্র পদ্মাতীরবর্তী গ্রাম ও পদ্মানদী। মধ্য-যৌবনের কবি সেদিন মধ্য ও উত্তর বঙ্গের অভ্যন্তরভাগে জলপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্ত্যমমতা : এ দুইই যুগপৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যে এইকালে প্রকাশলাভ করেছে। পদ্মাতীরবর্তী গ্রাম্যজীবনের ছোট সুখ ছোট দুঃখের প্রতি কবির মমতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পদ্মার চরে অনির্বচনীয়ের আভাসবাহী সূর্যাস্ত-দৃশ্য। কবিহৃদয়ের প্রকৃতিপ্রেম ও সংসারাসক্তি : এ দুই-ই সত্য। এ দুয়ের টানা-পোড়েনে যে ধূপছায়া-শাড়ির বুনট—তার আঁচলে পদ্মার তরঙ্গলীলা, নিঃশব্দ সূর্যাস্ত আর উদার মধ্যাহ্ন আকাশের ছায়াপাত হয়েছে।

এই পরিবর্তিত পটভূমি সম্পর্কে কবি নিজেই মন্তব্য করেছেন : "সোনার তরী লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি

প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা-শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে ; যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।"

[রচনাবলী-সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪৭]

রবীন্দ্র-গল্পের শ্রেষ্ঠ ফসল যে চুয়াল্লিশটি গল্প ('গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্ভুক্ত) সেগুলি রচিত হয়েছে পদ্মার পটভূমিতে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের (১২৯৮-১৩০২ বঙ্গাব্দ) মধ্যে। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কবিতাগুলিও এই সময়ে রচিত। তারপর ছোটগল্পের ধারা বন্ধ হয়েছে বাহ্যত 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ধানে, সে-স্থানে পাই কাহিনী-কাব্য ও কাহিনীমূলক কবিতা (কথা, কাহিনী)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেবল শতাব্দীর সমাপ্তি নয়, কবিজীবনের একটি অধ্যায়েরও সমাপ্তি। কবি এলেন শান্তিনিকেতনে, ছোটগল্পের ধারা বন্ধ, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মব্যস্ত মুহূর্তগুলিতে পদ্মার শান্তি ও আলস্য তিরোহিত, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের দিন সমাগত। তাই পদ্মার পটভূমি ছোটগল্পের ধাত্রী।

মানসী-তে গাজিপুরের রুক্ষ প্রকৃতি, সোনার তরী-চিত্রা-গল্পগুচ্ছে পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের শ্যামল প্রকৃতি, ক্ষণিকা ও চৈতালি-তে তার অনুস্মৃতি, আর খেয়া-গীতাঞ্জলি ও 'শান্তিনিকেতন'-উপদেশমালায় রাঢ়বঙ্গের কঠিন গৈরিক প্রকৃতি।

পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গ আলোচ্য পর্বের সাহিত্যের প্রেরণাস্থল। এই পর্বে কাব্যের রসের উৎস রহস্যময়ী পদ্মা আর ছোটগল্পের রসের উৎস পদ্মা ও তার শাখানদী-তীরবর্তী ছায়া-সুনিবিড় গ্রামগুলি। "হে পদ্মা, তোমায় আমায় দেখা শতবার"—রহস্যময়ী সুন্দরী পদ্মার প্রতি কবি বারবার তাঁর হৃদয়ের অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। পদ্মা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিপুল গভীর প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়েছে। সুদীর্ঘ জীবনের নানা পর্বে এই প্রভাবের নব নব পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এর প্রথম সার্থক পরিচয় পেলাম উনিশ শতকের শেষ দশকে।

রবীন্দ্র-ভাষ্যকার শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই পদ্মালালিত ভূখণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : "বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলময় হইয়া গিয়া পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয় প্রকাশ করে—তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। নদী নালা বিল ইহার জলভাগ, আর বর্ষাজলের স্ফীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত গ্রামগুলি এবং অনন্ত শস্যক্ষেত্র ইহার স্থলভাগ। পদ্মা প্রধান নদী, অবশ্য যমুনাও (ব্রহ্মপুত্র) কম নয়। আর আছে আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই (গৌরী নদী) ও ইছামতী প্রভৃতি নদনদী। আর রাজসাহী জেলা ও পাবনা জেলার একাংশ ব্যাপিয়া অনির্দিষ্ট-আকার চলন-বিল, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার মতো

নয়। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই বিচিত্র ভূখণ্ড মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণত জীবনচিত্র যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হোক, এখানেই ইহার আসমানদারির সার্থকতা। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সূত্রে এই ভূখণ্ড রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাদটীকায় আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে।

"এই ভূখণ্ডের কথা যখন ভাবি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। মনে হয়, মধ্যবঙ্গে অবস্থিত এই ভূখণ্ডে বঙ্গের মধ্যেকার কোন্ সত্য যেন প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, সিংহবাহিনী পদ্মা পরিপূর্ণ বিজয়গৌরবে আপন বামচরণ চলন-বিল-রূপী ঐ কালো অসুরটার স্কন্ধের উপর স্থাপন করিয়াছেন আর তাঁহাকে ঘিরিয়া আত্রেয়ী এবং গৌরী, বড়ল এবং নাগর নদনদীসমূহ বাঙালী-জীবনের ধ্যানের বিচিত্র পূর্ণতাকে যেন প্রকাশ করিয়াছে। এহেন ভূখণ্ড কবি-প্রতিভার যোগ্য ধাত্রী বটে। এই ভূপ্রকৃতি যেন ষড়্‌মাতৃকার মতো কবিকে স্তন্যদান করিয়াছে—আর তাই বুঝি কবিও প্রতিভার ষড়্‌মুখে জননীর ঋণ শোধ করিয়াছেন।

"এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অংশের প্রধান নায়ক পদ্মা, আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত অজ্ঞাত মানব।" ['রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', পৃঃ ১৬-১৭]

পদ্মা এই পর্বে কবিমানসের ধাত্রী, প্রেরণাদায়িনী, জীবনসঙ্গিনী। পদ্মাকে কবি স্বতন্ত্র মানবীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায় তার পরিচয় রয়েছে। পদ্মা কবির কাছে 'আইডিয়া' মাত্র নয়, দিব্যশরীরী সত্তা, তার উপস্থিতি ও সাহচর্য কবি অনুভব করেছেন বাস্তবসত্যরূপে। পদ্মাকে কবির মনে হয়েছে "স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা", "ছিপছিপে মেয়ের মতো", বলেছেন "ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটি প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়", "পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি।" এ ধরনের অজস্র অনুরাগমিশ্রিত মন্তব্য 'ছিন্নপত্রে' ছড়ানো রয়েছে।

পদ্মাকে রবীন্দ্রনাথ যে কত গভীরভাবে ভালবাসেন তার একটিমাত্র সাক্ষ্য 'ছিন্নপত্র' থেকে উদ্ধার করছি। ভালবাসার অনুষঙ্গ ভয়—বিচ্ছেদাশঙ্কা এখানে দেখা দিয়েছে :

> "হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর ফিরে পাবো না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাবো! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকবো! আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।"

[১৬ই মে, ১৮৯৬, শিলাইদা, 'ছিন্নপত্র']

এই একান্ত অনুরাগ ও প্রণয়ার্তির প্রতিধ্বনি শুনি 'পদ্মা' কবিতায় (চৈতালি) :

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে···
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?···
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

এই অনুরাগের বেদনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা নোতুন করে পাই। ১৩০২ বঙ্গাব্দে এই বেদনা প্রকাশের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে রচনাবলী-সংস্করণে দেখি তার নোতুন অভিব্যক্তি ('সোনার তরী'-র ভূমিকা, বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) : "আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে ! পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে।"

চার

'গল্পগুচ্ছ'য় মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব রূপলাভ করেছে, আর 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় বিশ্বপ্রকৃতি ও নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনার কাব্যফসল সঞ্চিত হয়েছে। পদ্মার ক্ষুরধার সে প্রবাহ, অনন্ত শস্যক্ষেত্র, উন্মুক্ত গগনললাট, ব্যাকুল মধ্যাহ্ন, উদাসিনী সন্ধ্যা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র নির্বিশেষ সৌন্দর্যলোক গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির ধীরস্নিগ্ধ শুশ্রূষায় কবি বারবার সঞ্জীবিত হয়েছেন। পদ্মার প্রেমে নোতুন করে বাঁধা পড়েছেন ; বলেছেন—"প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুল্‌কুল্‌ করে ওঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়।"

[৯ই ডিসেম্বর ১৮৯২, শিলাইদহ, 'ছিন্নপত্র']

সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের যে বিষাদ ও বৈরাগ্য, তার পটভূমি এই পদ্মালালিত ভূখণ্ড। ছিন্নপত্রের ১৪, ১৮, ২৭, ৩৫, ৬৬, ১৫২ সংখ্যক পত্রগুচ্ছ তার প্রমাণ। নিস্তব্ধতা, খোলা আকাশ ও কর্মবিরতির পটভূমিতে পৃথিবীর বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও বিষাদ ফুটে ওঠে, এ-সত্য কবি হৃদয়ঙ্গম করেছেন পদ্মার নির্জন চরে সান্ধ্য-ভ্রমণকালে (দ্রঃ ১৪ সংখ্যক পত্র, 'ছিন্নপত্র')। "পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম—সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম।"

যৌবনমধ্যাহ্নেই সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের যে বিষাদের সুর, তা কেবল sad song of humanity নয়, তা প্রকৃতির অন্তর থেকে কবির অন্তরে ঠাঁই নিয়েছে। তাই পূরবীতে বা টোড়িতে বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি ব্যক্ত হয়, এ-কথাই কবির মনে হয়েছে। পদ্মার চরে যে-সন্ধ্যাকে কবি দেখেছেন, তা পূরবীর বেদনা-সুরকে বস্তুরূপ দিয়েছে। নিঃসঙ্গ পথযাত্রিণী সন্ধ্যা-রমণীকে দেখে কবি-হৃদয়ে যে রোমান্টিক বেদনার গীতধ্বনি উত্থিত হয়েছে, 'সোনার-তরী'-'চিত্রা'য় তো তারই ঝঙ্কার শুনি।

'বসুন্ধরা' কবিতায় যে-সন্ধ্যার চিত্রটি পাই, তা যে পদ্মাতীরের সন্ধ্যাচিত্র, এ সত্য মুহূর্তেই অনুভব করতে পারি—

দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে—যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে—
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে

শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল।

['সোনার তরী']

এই বিষাদব্যাকুলতাই 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র ধ্রুবপদ। এ বিষাদ কেবল সন্ধ্যায় নয়, মধ্যাহ্নেও। নিম্নধৃত কবিতাংশ তারই পরিচয়স্থল। হেমন্তের দ্বিপ্রহরে 'যেতে নাহি দিব'র কাতর বেদনা সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে—

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তরমাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী। ['সোনার তরী']

পদ্মাপ্রকৃতি একবার কবিকে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে, আরেকবার গ্রামপ্রকৃতির অভিমুখে আহ্বান করে। নির্জন-সজনের সংগমে 'সোনার তরী'র কাব্যফসল দেখা দিয়েছে। নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা আর সবিশেষ মর্ত্যমমতা, এ দুই প্রধান সুরকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে বিষাদ ও বৈরাগ্য। তা কেবল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির নয়, কবিপ্রকৃতিরও। পদ্মাতীরবর্তী ভূখণ্ডে চরে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে তারই সমর্থন। 'অক্ষমা' ও 'দারিদ্র্য' সনেটে সবিশেষে মর্ত্যমমতা, এগুলি 'গল্পগুচ্ছ'র দোসর ; আবার 'সোনার তরী', 'মানসসুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান, এগুলি 'চিত্রা' 'জীবনদেবতা'র দোসর। 'চিত্রা'র 'সিন্ধুপারে' কবিতায় নির্বিশেষ আদর্শ-সৌন্দর্যের সন্ধানে যে কবি আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনি-ই 'স্বর্গ হতে বিদায়' কামনা করে মর্ত্যমমতার পরিচয় দিয়েছেন—'শূন্য নদীপারে অবনতমুখী সন্ধ্যা'— এ তো সেই সন্ধ্যা, যাকে 'ছিন্নপত্রে' বারবার দেখেছি জনহীন চরের উপর দিয়ে

বিষণ্ণবদনা রমণীরূপে চলে যাচ্ছেন। একবার মহিমালক্ষ্মী সৌন্দর্যপ্রতিমার পদপ্রান্তে কবির অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, আরবার পদ্মাতীরবর্তী সুখদুঃখভরা মানবজীবনের জন্য ব্যাকুল বেদনাপ্রকাশ। 'সুখ' ও 'সন্ধ্যা' কবিতা দুটিতে পদ্মাতীরবর্তী গ্রামজীবনের প্রসন্ন সরল আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। আর এই সন্ধ্যা-বন্দনা থেকেই কবি পুনর্বার নির্বিশেষ সৌন্দর্যের পথে চলে গিয়েছেন। 'সন্ধ্যা'র শূন্যতা থেকে 'সিন্ধুপারে'র 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লিমুখর' রাতে জীবনদেবতার প্রবল আকর্ষণে কবির নিরুদ্দেশযাত্রা। পদ্মাতীরের জনপদ কবিকে মর্ত্যমমতার পথে টানছে আর পদ্মাচরের সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত কবিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই বলেছি, পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের এই ভূখণ্ড 'সোনার তরী'-'চিত্রা' কাব্যের, সেইসঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ' 'ছিন্নপত্র'র প্রেরণাস্থল।

পরবর্তী কাব্য 'চৈতালি'তে মর্ত্যমমতার সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে। 'গল্পগুচ্ছ'র সংসারাসক্তি নোতুন করে 'চৈতালি'র কবিতাগুচ্ছে পাই। পদ্মার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এই পর্বে রচিত 'পদ্মা' কবিতাটিতে। 'দুর্লভ জন্ম' সনেট কবির মর্ত্যমমতার testament। আর 'মধ্যাহ্ন' কবিতা পদ্মাতীরবর্তী জনপদের একটি নিপুণ আলেখ্য। মর্ত্যমমতার সঙ্গেই রয়েছে সেই ঔদাস্য বৈরাগ্য ও বিষাদ। অলস মধ্যাহ্নের বিষাদ-সুরটি কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছে, পরবাসী কবি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সেই পদ্মাতীরবর্তী জনপদবাসীদের একজন বলে মনে করেছেন। পদ্মাতীরের জনপদের প্রতি কবির আন্তরিক ভালবাসা ও একাত্মতার ফলে আমরা পেয়েছি গল্পগুচ্ছের উৎকৃষ্ট গল্পনিচয়। গিরিবালা, ফটিক, সুভা, মৃন্ময়ী, তারাপদ, রতন, উমা প্রভৃতি বালক-বালিকা গল্পগুচ্ছের বৃহদংশের নায়ক-নায়িকা এবং তারা পদ্মাতীরবর্তী জনপদবাসী। গল্পগুচ্ছের আলোচনায় পদ্মা ও পদ্মার স্নেহের দুলালদের প্রাধান্য—এই বৈশিষ্ট্য পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাই পদ্মাতীর ও পদ্মানদী অক্ষয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

১৮

বোলপুর ঃ রবীন্দ্রনাথ

১৮৯৬ থেকে ১৯০৫ ঃ এই দশবৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানা কর্মব্যস্ততা ও অশান্তির পর্ব। কখনো শিলাইদহ, কখনো কলকাতা, কখনো বা বোলপুর—কোথাও তাঁর স্থিতি নেই। ব্যক্তিগত জীবনে নানা আঘাত ও দুর্বিপাক তাঁকে এ সময় সহ্য করতে হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি পরিদর্শন, কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থক্ষতি ও সে ক্ষতি সামলাবার জন্য প্রচুরতর আর্থিক ঋণ, শেষপর্যন্ত বিশহাজার টাকার দেনার জালে জড়িয়ে পড়া; স্ত্রী-পুত্রকে শিলাইদহে নিয়ে বসবাস, স্ত্রীর আপত্তি, শেষপর্যন্ত শিলাইদহে বসবাসের সংকল্প ত্যাগ; পিতার, কন্যার, স্ত্রীর ও অন্য আত্মীয়ের মৃত্যু; সাধনা ও বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকা সম্পাদনা, কলকাতায় ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের বাগ্‌বিতণ্ডা; স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, মতভেদ ও সংস্রব ত্যাগ; বোলপুর বোর্ডিং-স্কুলকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপে স্থাপনা (১৯০১), তার পরিচালন-সমস্যা—আর্থিক ও অন্যান্য সংকট; বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে প্রেরণের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ; কন্যার বিবাহদান, পুত্র ও জামাতার শিক্ষাদান প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র কর্মের দায় ঘাড়ে নিয়ে কবি এ সময়ে চলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, কিছুতেই কোনো বাইরের আঘাতেই তাঁর অন্তরের ধ্যানভঙ্গ হয় নি।

শতাব্দীর শেষবৎসরে—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'; এরপরই 'নৈবেদ্য' (১৯০১)। শিলাইদহে অশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি 'নৈবেদ্য'র গভীর ধ্যানের ও কঠিন প্রতিজ্ঞার কাব্যরূপ দান করেন। এগুলিতে প্রকৃতি-পরিবেশ বা প্রকৃতি-বর্ণনা নেই। প্রাচীন ভারতের মহান্‌ জীবনের প্রতি, তার উচ্চসংকল্প ও কর্মসাধনার প্রতি, রোমান্সের প্রতি কবিমনের আকর্ষণ ও অনুরাগ এগুলিতে প্রকাশিত। তাই পরিবেশ-প্রভাব এখানে নেই। তারপর ১৯০৫-এ 'স্বদেশ' কাব্য—স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় লিখিত দেশপ্রেমের কবিতার সংকলন। এরপরই 'খেয়া' (১৯০৬), 'শিশু', 'স্মরণ' ও 'উৎসর্গ'। এই সময়ে 'গল্পগুচ্ছ'র আরো কিছু গল্প ও প্রচুর প্রবন্ধ—রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; 'নৌকাডুবি' উপন্যাস ও 'হাস্যকৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রকাশিত হয়। মূলতঃ এটি গদ্যের যুগ। নানা কর্মের, সামাজিকতার, চিন্তার ও সাধনা বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার সমস্যা কবিকে এখানে বাহ্যত বহির্জীবনের প্রতি আকর্ষণ

করেছে। এরি মাঝে 'খেয়া' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে; তা ভগবচ্চিন্তায় উদ্দীপ্ত, 'মিষ্টিক'-বোধে অনুপ্রাণিত, পরিবেশ-প্রভাব-মুক্ত, বাহ্যিক কোলাহল থেকে দূরে অন্তরদেশে প্রতিষ্ঠিত। গদ্যের আনন্দধারা যেমন শুকিয়ে এসেছে, প্রকৃতিধ্যানের ও প্রকৃতিতে সহজ আনন্দলাভের পথও তেমনি সংকীর্ণ হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যের অধ্যাত্মচিন্তাবাহী কবিতাগুলির মাঝে স্বদেশী গান ও কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অথচ এ দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই; আসলে অন্তরের গভীর ধ্যান বাইরের কোলাহলে ভঙ্গ হয় নি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাথমিক সংকটের ও স্বদেশীর উত্তেজনা থিতিয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ বীরভূমেই তাঁর ধ্যানের আসন ও কর্মের পীঠ স্থাপনা করলেন। তারপর নোতুন করে প্রকৃতিকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা, 'শারদোৎসব' ও 'গীতিমাল্য'-'গীতালি'-'গীতাঞ্জলি'তে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতির নোতুন রূপটি দেখা গেল। এই পাঁচটি গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। এগুলিতে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতি-বর্ণনার প্রথম ফসল সঞ্চিত হয়েছে।

'খেয়া' কাব্যের যে প্রকৃতি-বর্ণনা, তা কোনো ভৌগোলিক পরিবেশে ধরা দেয় না। মিষ্টিক কাব্যভাবনা যে প্রকৃতি-আলেখ্যে দেখা দিয়েছে, তা দেশকালের সীমার বাইরে। 'গীতাঞ্জলি'-গীতিমাল্য'-'গীতালি' কাব্যের যে শারদ-প্রকৃতি, তা খুব স্পষ্ট নয়। 'শারদোৎসব' নাটক সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য। বস্তুত, এগুলির উপর নির্ভর করে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতি দর্শন করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

বীরভূমের রুক্ষ বৈরাগী উদাস প্রকৃতির প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় (১৯০৯-১৬)। কবির ব্যক্তিগত জীবনে এই পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০২ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ: এই সাতবৎসরে মৃত্যু বার বার কবিকে আঘাত করেছে। কবিজায়া, কন্যা রেণুকা, পুত্র শমীন্দ্রনাথ, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ, বন্ধু শ্রীশচন্দ্র এই সময়ের মধ্যে লোকান্তরিত হন। 'স্মরণ' কাব্য (১৯০৩) ছাড়া আর কোথাও ব্যক্তিগত শোক প্রকাশ পায় নি। স্বদেশ-সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনায় এই পর্বে কবি খুবই ব্যস্ত। শান্তিনিকেতনে এই ব্যস্ততা ও উত্তেজনা-অন্তে যখন স্থিতিলাভ করে কবি বসলেন, তখনই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার রচনা, যদিও নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি বা শান্তি কবির ভাগ্যে ঘটে নি। 'ধর্ম' (১৯০৯) সাত বৎসরের (১৯০০-৭) ভাষণমালার সংগ্রহ, তা কতকটা নৈর্ব্যক্তিক, ধর্মতত্ত্বের প্রকাশ্য আলোচনা-সংগ্রহ। কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা বীরভূমের উদাস বৈরাগী পটভূমিতে ব্যক্তিগত ধ্যানের প্রকাশস্থল। কবিজীবনের মনন ও সাধনার ফল এই উপদেশমালায় সংগৃহীত হয়েছে। জীবনশিল্পী কবির ধ্যানলব্ধ বাণীমালার উপযুক্ত

পটভূমিরূপে শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রান্তর, উদার গগন, শান্ত বিভাবরী, প্রসন্ন প্রভাত বর্তমান। মৃত্যুর বর্ণবিরল পটভূমিতে এগুলি গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। শোকের পবিত্র অগ্নিতে দুঃখ ও মৃত্যুকে কবি নোতুন করে উপলব্ধি করেছেন, বৃহতের জন্য গভীর আন্তরিক আকুলতা প্রভাতী ও সান্ধ্য উপাসনান্তে প্রদত্ত ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে। খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি কাব্যধারায় এবং শারদোৎসব-অচলায়তন-রাজা-ডাকঘর নাট্যধারায় যে অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা, তারই স্পষ্ট প্রকাশ 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা।

রাঢ়-বঙ্গের উদাস বৈরাগী প্রকৃতি এই অধ্যাত্ম-সাধনার যোগ্য পটভূমি। বীরভূমের রুক্ষ উদার প্রান্তরে দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, নিশীথের আকাশে কোথাও মলিনতা নেই, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের সন্ন্যাসব্রত কোথাও মনকে বাঁধা পড়তে দেয় না : এ সবই কবিমনের ব্যাকুলতাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার পরিচয়মূলক কয়েকটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি :

[১] 'কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানই কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—'বাজে বাজে, রম্যবীণা বাজে'।...কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে, রম্যবীণা বাজে'। এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠেছে।...কাল কৃষ্ণ একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম; সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল।' ['শোনা', শান্তিনিকেতন ১]

[২] 'বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে নানা ক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক উৎসব, আমরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন যোগ দিয়েছি?'

['শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব', তদেব]

[৩] 'কালকের উৎসবমেলার দোকানি-পসারীরা এখনও চলে যায়নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জ্বেলে, গল্প করে, গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ চতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বসলুম তখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে। ভাঙা মেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না, শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তুরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।' ['মানুষ', তদেব]

[৪] 'জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে, এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেক দিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে সূর্যাস্তকে এবং নিশীথরাতের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। এই-যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতেই আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও-একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তরবায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধপ্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরমপ্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা, এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে।' ['আশ্রম', তদেব]

[৫] 'এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়া-গাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণ গন্ধ ফুল ফল—নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং-শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।'

['ভক্ত', শান্তিনিকেতন ২]

[৬] 'দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে। আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপরে একটা কোলাহল জেগে উঠল; তারপরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল—পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল। তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ সে-সব কথা বলার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কি রকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল—দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারিদিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়—চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।…

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর, সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে ; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করেছে।' ['বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা', তদেব]

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার সর্বত্র বীরভূমের উদাস রুক্ষ গৈরিক প্রকৃতির এই ধরনের বর্ণনা ছড়িয়ে আছে। জীবনের মধ্যবিন্দুতে উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অধ্যাত্ম-সাধনলোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি তারই যোগ্য পটভূমি। কবিকল্পনার উপর নোতুন পরিবেষ্টনীর প্রভাব যে কত গভীর, তারই পরিচয় এখানে পাই। পরবর্তী পনেরো বৎসরে রচিত কাব্যধারায় (পূরবী-মহুয়া থেকে আরোগ্য-জন্মদিনে: ১৯২৫-৪১) এবং নাটকে, গানে, প্রবন্ধে, ভ্রমণবিবরণে শান্তিনিকেতন বার বার দেখা দিয়েছে।

গাজিপুর, পদ্মাতীর, বোলপুর: এই তিন প্রকৃতি-চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তিন চিত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নেই, কিন্তু প্রেরণার উৎসরূপে এই তিন দৃশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

যৌবনের সূচনায় গাজিপুরকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন। উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সে-দেখা সেই গাজিপুর জীবনের শেষ প্রান্তে 'পুনশ্চ' ও 'আরোগ্য' কাব্যে ফিরে এসেছে। আর পদ্মাতীর, চর ও মধ্যবঙ্গের জনপদ তো বারবার রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছে। রাঢ়-বঙ্গের সন্ন্যাসী রুক্ষপ্রকৃতির প্রভাব পরবর্তী-কালে আরও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। পুনশ্চ-পরিবেশ-বীথিকা-বিচিত্রিতা-শেষ সপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী-প্রান্তিক-সেঁজুতি কাব্যধারা এই প্রভাবের পরিচয়স্থল।

কবি এই প্রকৃতি-দৃশ্যগুলিকে সমস্ত জীবন ধরে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করেছেন। কিছুই তিনি হারাতে চাননি। মুগ্ধদৃষ্টির প্রদীপে কবি বারবার এদের আরতি করেছেন ; বলেছেন:

'মন বলে, এই আমার যত দেখার টুক্‌রো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে ;

তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব কিছু।'

['দেখা', পুনশ্চ]

এর বেশি প্রত্যাশা কবির নেই। 'পুনশ্চ'-কাব্যের 'স্মৃতি' কবিতাটিতে চল্লিশ বৎসর পরে এবং 'আরোগ্য'-কাব্যের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটিতে পঞ্চাশ বৎসর পরে গাজিপুরের মধ্যাহ্ন-দৃশ্যটি ফিরে এসেছে। প্রথম-যৌবনের সঙ্গী গাজিপুরের গঙ্গার চর আর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন নোতুন করে কবিকে মুগ্ধ করেছে। আর পদ্মার নির্জন চর চলমান স্রোতের পটে আলোছায়ার খেলা আর পূর্ণিমা-বিভাবরীতে স্বপ্নময় তীরভূমি কবিকে পদ্মাপ্রেমী করে রেখেছে তাঁর সমস্ত জীবন। কবি পদ্মাকে দেখেছেন চল্লিশ বৎসর পরে; বলেছেন :

'পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে,
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহু দূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপরে।
আমার একলা দিন রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
…তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ
দেখা যায় অদূরে।
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।'

['কোপাই', পুনশ্চ]

প্রকৃতি-প্রেমী কবি এই সুন্দরী ধরণীর কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার আগে মর্ত্যমমতার শেষ স্বাক্ষর রেখে গেছেন 'আরোগ্য'-কাব্যের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটিতে (৩১শে জানুয়ারি ১৯৪১, শান্তিনিকেতন)। কবিজীবনে যে তিনটি প্রকৃতি-দৃশ্য

গানের ধুয়ার মতো ফিরে ফিরে এসেছে—সেই গাজিপুর, পদ্মাতীর ও বোলপুরের প্রকৃতি-আলেখ্য শেষবারের মতো দেখে নিয়েছেন। এ-কারণে এই কবিতাটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এটিব মধ্য দিয়ে সারাজীবনের প্রকৃতি-প্রেম ও তার প্রভাবের সানুরাগ অঙ্গীকাব শেষবারের মতো কবি রেখে গেছেন। মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত হয়ে সুগভীর মর্ত্যমমতা ও নির্মম নিরাসক্তি, দুয়েরই স্বীকৃতি কবি এখানে জানিয়েছেন; বলেছেন:

'পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে,
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।'

কবির মনে পড়ে—

'পশ্চিমেব গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা,
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।'

মনে পড়ে—

'সেই বহুদিন আগে,
দু-পহব রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে-তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের;
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে নৌকা খরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল—'

'সংসারের প্রান্ত-জানালায়' বসে এইসব ছবি কবির চোখে পড়েছে—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত-জীবন-পরিক্রমান্তে ফিরে এসেছেন শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তে, যেখানে—

'দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।'
['সংসারের প্রান্ত-জানালায়', আরোগ্য]

মর্ত্যমমতার Last Testament রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছেন এই কাব্যের 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' কবিতায়। জীবনের সমস্ত শোক দুঃখ, আঘাত বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি, কীর্তি সাফল্য,—যা কিছুর উপরে জয়লাভ করেছে কবির সুগভীর ধরণী-প্রীতি, এতেই কবি জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রেম-উপলব্ধির, এ আনন্দের ক্ষয় নেই,—এই মন্ত্রবাণী তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। আনন্দকম্পিত কণ্ঠে কবির এই ঘোষণা আমাদের পরম প্রাপ্তি :

'শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোলপুরের গৈরিক প্রকৃতি তাই অমর হয়ে রইল।

১৭

আট : রবীন্দ্র-কাব্য-বিচার

চিত্রা : আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধান

এক

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাব্বিশ বছর বয়সে তরুণ কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা নীতিবাদী সমালোচকদের (অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে) আক্রমণ করে লিখেছিলেন,

> "আমাদের বঙ্গভাষায় সাহিত্য-সমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ, এই উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না।...... বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী।.. সাহিত্যের অস্তিত্ব-হেতু আনন্দ। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।"
>
> ['সাহিত্যের উদ্দেশ্য', ভারতী ও বালক]

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদকে এই নীতিবাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস' সপ্তম অধ্যায়)। লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা এক পত্রে ('সাহিত্য'/বৈশাখ ১২৯৯/১৮৯২ খ্রী, সাধনা) সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি জানা যায়। তিনি সৌন্দর্যকে 'বিশ্বব্যাপী সত্য' বলে মনে করেন, আর সেজন্যই সৌন্দর্যের সীমাবদ্ধ রূপ দেখতে চান না, তার অনন্ত বিস্তার ও গভীরতা চান। 'সৌন্দর্যের বৃহৎ সত্য' বলতে তিনি এই গভীরতা, বিস্তার ও ব্যাপ্তিকে বুঝিয়েছেন। সৌন্দর্য তাঁর কাছে জড়শক্তি নয়, 'সৌন্দর্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে।' এখানেই তিনি আরো বলেছেন, "অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য; সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।"

পদ্মা-বিধৌত মধ্য-বঙ্গে বাসকালে যখন লোকেন্দ্রনাথকে এই পত্র-প্রবন্ধ লিখছেন, তখনি চিত্রা কাব্যের (রচনাকাল ১২৯৯-১৩০২/১৮৯৩-৯৫ খ্রী, গ্রন্থাকারে প্রকাশ

ফাল্গুন ১৩০২, মার্চ ১৮৯৬ খ্রীঃ,) কবিতাগুলি রচিত হয়। চিত্রা কাব্যে 'সৌন্দর্যের বৃহৎ সত্য' শিল্পরূপ লাভ করেছে। স্মর্তব্য, বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতার প্রথম পাঠক ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক অভিমতকে রবীন্দ্রনাথ সেদিন খুব মূল্য দিতেন। তার প্রমাণ, 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর কথায় তার আদিরূপটি বদলেছিলেন। সেকথা কবি অনেকদিন বাদে কবুল করেছিলেন—

> "প্রেমের অভিষেক-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম।" (রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকা)। পুনশ্চ, "যেতে নাহি দিব কবিতায় বাঙালিঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হইনি। হয়তো দু-চারটে লাইন বাদ পড়েছে।" (তদেব)

চিত্রা কাব্যকে সৌন্দর্য-প্রকাশ কাব্য বলে মনে করলে ভুল হবে না। এই কাব্যের কবি সৌন্দর্যকে 'বিশ্বব্যাপী সত্য' বলে বিশ্বাস করেন। সৌন্দর্য তাঁর কাছে জড়শক্তি নয়, তা একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ; তার আছে একটা আত্মা। তাঁর মতে, 'অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে', সেখানেই সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

চিত্রা কাব্যের এই মানস-পটভূমিকে রবীন্দ্রকাব্যপটভূমিতে বিস্তারিত করে দেখা যেতে পারে। কড়ি ও কোমল কাব্যের (১৮৮৬) পার্থিব প্রেমের স্তর অতিক্রম করে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন মানসী কাব্যের (১৮৯০) আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার স্তরে। সেখান থেকে উপনীত হন সোনার তরী কাব্যের (১৮৯৪) রোমান্টিক প্রেমের স্তরে। এখানেই কবি প্রথম উপলব্ধি করেন, তাঁর চালক এক অদৃশ্য মহৎ সত্তা, তাঁকেই বলেছেন 'মানসসুন্দরী' যাঁর উপর কবির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সোনার তরী-র রোমান্টিক প্রেমের স্তর থেকে কবির উত্তরণ হল চিত্রা-র মিস্টিক প্রেমের স্তরে। চিরন্তন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপধ্যান ও প্রেমবন্দনায় কবি তাঁর কাব্যসাধনার সার্থকতা খুঁজে পেলেন।

দুই

চিত্রা কাব্যের নাম-কবিতায় কবি আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধানে তাঁর যাত্রার কথা বলেছেন। যে অলৌকিক রহস্যময় সৌন্দর্য সোনার তরী-তে কবিকে ইঙ্গিতে আহ্বান করেছিল তা চিত্রায় এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। কবি তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বিশ্বব্যাপ্ত কসমিক রূপ ধ্যান করেছেন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবির কাছে দুই রূপে

প্রতিভাত। 'বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা।' (রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকা)।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তাঁকেই কবি দেখেছেন—

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

বিচিত্ররূপিণী আসলে কসমিক সৌন্দর্য। বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী, যাঁর পদপ্রান্তে কবি দিয়েছেন পুষ্পাঞ্জলি—

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।

তাঁকে কবি যখন অন্তরমাঝে পেয়েছেন, তখনি কবির নবজন্ম হয়েছে। কবি তাঁকে ভালবেসেছেন। এই প্রেমের মধ্যে কবি এক গভীরতর তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। তা কেবল ব্যক্তিগত মধুর অনুভূতি নয়, বিশ্বচেতনার সঙ্গে কবিচেতনার সংযোগসূত্র। তা কবির জন্মজন্মান্তরের ঐক্যবিধায়ক রহস্যময় শক্তি। তা কবির জীবনে দেয় পূর্ণতার সন্ধান—তার কাছে কবি নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেন—অপসৃত হয় বহির্জীবনের সব কোলাহল-বিক্ষোভ। মুছে যায় দেশকালের সীমারেখা, কবি মগ্ন হয়ে যান অন্তরলোকে—

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

এই আদর্শ বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপধ্যানেই কবি তাঁর সাধনায় সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি জগতের মাঝে বিচিত্ররূপিণী, অন্তরমাঝে অন্তরব্যাপিনী।

সোনার তরী কাব্যে কবি যে অলৌকিক সৌন্দর্যের চকিত দর্শন পেয়েছিলেন তাকে লৌকিক জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি। চিত্রা কাব্যে বহির্জীবন ও অলৌকিক সৌন্দর্যের মধ্যে বাস্তবিকই যে একটা সেতু আছে তা কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। পূর্ব কাব্যের সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে কবি এখানে এক অধ্যাত্ম-বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'চিত্রা' কবিতায় তারই শিল্প-স্বীকৃতি।

কবিকে মেনে নিতে হয়, এই অলৌকিক সৌন্দর্য একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। এই সৌন্দর্য একটি প্রবল ইচ্ছাশক্তি, একটি জীবন্ত সত্তা, একটি আনন্দ, একটি সক্রিয় আত্মা। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে কবির আত্মসমর্পণ। তাঁর স্বরূপ জানার ব্যাকুলতায় কবির প্রশ্ন—

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি। (অন্তর্যামী)

"আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মনক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্পসাধনায় এক-আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয়-আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে—যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে।" [তদেব]

'অন্তর্যামী' কবিতায় সেই যুগ্ম-সত্তাকে কৌতুকময়ী বলে কবি সম্বোধন করেছেন। তাঁকে বলেছেন 'আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী'; বিস্ময়ে শুধিয়েছেন—

এ যে সংগীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তরবিদারণ।

শেষে তারই পায়ে কবির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ :

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,
তবে তাই হোক। দেবী, অহরহ

জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও, প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো দয়াময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে ওগো নির্দয়
চঞ্চল প্রেম দিয়ে। [অন্তর্যামী]

এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণেই জীবনের সার্থকতা, একথা কবি আবার বলেছেন 'সাধনা' কবিতায়—

যা কিছু আমার আছে আপনাব শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চবণে আসি—
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।...
তুমি যদি, দেবী, লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্যনবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি—
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি। [সাধনা]

কবিব নিজের বলে কিছুই আর রাখেন নি। সেকথাই প্রশ্নচ্ছলে জোর দিয়ে বলেছেন—

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি। [শেষ উপহার]

সর্বস্বদানেব পর অন্তরতমের কাছে কবির ব্যাকুল প্রশ্ন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম। [জীবনদেবতা]

এই কৌতুকময়ী, অন্তরতম, জীবনদেবতা, 'আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী', অন্তর্যামী—ইনি কে? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলননাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।' (তদেব)। কোনো দৈবশক্তি বা ঐশী লীলা নয়, পরন্তু কাব্যপ্রেরণার নিগূঢ় উৎস এখানে ব্যঞ্জিত। কবির মনোলোকে যে আদর্শ প্রেরণা আছে, তাকেই বলেছেন 'অন্তরতম'।

একটি প্রবল ইচ্ছাশক্তি, একটি আনন্দ, একটি আত্মা রূপে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে দেখেছেন, তাকে বিশ্বব্যাপী সত্য বলে জেনেছেন, তাকেই এখানে বন্দনা করেছেন, তারি কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এই অলৌকিক আদর্শ অপ্রাপণীয় সৌন্দর্য-সন্ধানে কবির যাত্রা। চিত্রা কাব্যের শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে' এই যাত্রার আশ্চর্য বিবরণ। এক পৌষ-রাতে এক অবগুণ্ঠনবতীর অঙ্গুলি-সংকেতে অশ্বারোহণে এক অজানা নোতুন দেশে এলেন কবি, পৌছলেন গুহাপথ পেরিয়ে এক নিঃশব্দ জনহীন প্রাসাদে। সেখানে নীরবে অঙ্গুলি তুলে শয্যায় কবিকে পাশে বসাল সেই রহস্যময়ী। 'হিম হয়ে এল সর্বশরীর শিহরি উঠিল প্রাণ।' হঠাৎ দশদিকে বেজে উঠল বীণাবেণু, ঘোমটার ভিতরে হেসে উঠল রমণী, চমকে উঠে কবি শুধালেন—'কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে।' সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী কনকদণ্ড ভূমে আঘাত করল, প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল বিজন প্রাসাদ। তাকে ঘিরে দাঁড়াল শত নারী। নিয়ে গেল কতো ঘর পেরিয়ে এক ঘরে—যেখানে অবগুণ্ঠনবতী মণিবেদিকায় বসল। কবি ব্যাকুল হয়ে শুধালেন—'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।' চারদিক থেকে বেজে উঠল শত কৌতুকহাসি। তখন রমণী উন্মোচন করল অবগুণ্ঠন। তখন—)

চকিত নয়নে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে;
'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে,
অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।

[সিন্ধুপারে]

আদর্শ সৌন্দর্য চিরকালই অপ্রাপণীয়। তবু তারি সন্ধানে কবির যাত্রা। এই যাত্রায় যত বেদনা তত আনন্দ। সেই আনন্দ-বেদনাব উজ্জ্বল স্বাক্ষর চিত্রা কাব্য।

কবিতারচনার কাল-পারম্পর্য অনুযায়ী কবির নিয়ন্তা-শক্তি-পরিচিতিমূলক কবিতাগুলিকে এভাবে সাজানো যায়, 'অন্তর্যামী' (ভাদ্র ১৩০১), 'চিত্রা' (২৮ অগ্রহায়ণ), 'জীবনদেবতা' (২৯ মাঘ ১৩০২), 'সিন্ধুপাবে' (২০ ফাল্গুন ১৩০২)। চিত্রা-কাব্যের আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধান ও তার তত্ত্বসিদ্ধান্ত এদের ভাবকল্পনা-অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত।

সোনার তরী কাব্যে 'মানসসুন্দরী' (৪ পৌষ ১২৯৯) ও 'নিরুদ্দেশযাত্রা' (২৭ অগ্রহায়ণ) কবিতা দুটির পরিণতিতে আমরা পেয়েছি 'অন্তর্যামী'। 'মানসসুন্দরী'তে বাহিরে চিরপলাতক বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যলক্ষ্মী আর কবিব অন্তর্নিহিত কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস অন্তরলক্ষ্মীর মধ্যে ক্ষণিক অভিন্নতাবোধ লক্ষ্য করা গিযেছিল। কবির মনে এই যুগ্মসত্তার পরিণয়বন্ধন সাধিত হযেছিল, যদিও তা স্থায়ী হয় নি। তবে এই মিলন কবিকল্পনাকে উদ্বেল কবে তুলেছিল। 'খেলাক্ষেত্র হতে/কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে', 'ছিলে খেলার সঙ্গিনী—/এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,/জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।' তবু কবি তাঁকে সম্পূর্ণ চেনেন না। কবি রহস্যমধুরার বন্দনা করেছেন—'এখন ভাসিছ তুমি/অনন্তের মাঝে, স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি/করিছ বিহার।' কবির কাছে সে অ-ধরা; 'সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধবা?' তাকে জানার জন্যই কবি 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় বেরিয়েছেন। চিত্রাকাব্যের অগ্রদূতরূপে পাই এই কবিতা—জীবনদেবতার পূর্বাভাস পাই এখানে। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আহ্বানে স্বর্ণপ্লাবিত পশ্চিম দিগন্তের এক প্রেমিকহৃদয়ের অভিসার-যাত্রা। নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যলোকের অভিমুখে যাত্রা। এ যাত্রাপথের শেষ কোথায় তা কবির জানা নেই, তাই ব্যাকুল প্রশ্ন: 'স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়/আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি / তিমিরতলে।'

উত্তরবিহীন নিরুদ্দেশযাত্রার পরিণতিতে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কাছে কবির আত্মসমর্পণ। 'অন্তর্যামী' কবিতায় প্রশ্নেব তীব্রতা আর নেই, আছে অন্বেষণের ব্যাকুলতা—'কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে/আমি যে তোমারে খুঁজি।' আছে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—'আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার/ব্যথায পীডিয়া হৃদয়ের তাব/মূর্ছনাভবে গীতঝংকার/ধ্বনিছ মর্মমাঝে?' জিজ্ঞাসা অচিরে পবিবর্তিত হয়েছে সমর্পণের ব্যাকুলতায়—'আমার মাঝারে করিছ রচনা/অসীম বিবহ অপাব বাসনা,—/কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা/মোর বেদনায় বাজে!' তারপর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ: 'তবে তাই হোক, দেবী, অহরহ/জনমে জনমে রহ তবে রহ,/নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ / জীবনে জাগাও প্রিয়ে / নব নব রূপে ওগো রূপময/লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়/কাঁদাও আমারে ওগো নির্দয়/চঞ্চল প্রেম দিয়ে।' চিত্রা নাম-কবিতায় কবির নবজন্ম ঘোষিত; প্রেমের মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন এক

গভীরতর তাৎপর্য। বিশ্বচেতনার সঙ্গে কবিচেতনার সংযোগসূত্র—কবির জন্ম-জন্মান্তরের ঐক্যবিধায়ক—জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা সম্পাদনকারী এক রহস্যময় শক্তির কাছে কবির আত্মসমর্পণ : 'অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি/একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি/নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি/তুমি অচপল দামিনী।' 'জীবনদেবতা' কবিতায় যুগপৎ সংশয় ও আত্মসমর্পণ, ভালোবাসার দুই রূপ ব্যক্ত। 'ওহে অন্তরতম/মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ/আসি অন্তরে মম।' অচিরে এই সংশয়ের অবসান—'নূতন করিয়া লহ আরবার/চির-পুরাতন মোরে—/নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়/নবীন জীবনডোরে।' তারপরই 'সিন্ধুপারে' কবিতায় অজানা সিন্ধুপুলিনে গুহারাজ্যে অবগুণ্ঠনবতীর গুণ্ঠন-মোচনে রহস্যের অবসান—'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে। / সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি/চিরদিন মোরে হাসালো, কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি।'

অন্তর্যামীর প্রতি কবির আত্মসমর্পণের কেন্দ্রীয় ভাবটি আরো ছয়টি কবিতায় প্রকাশিত—'সাধনা', 'সান্ত্বনা', 'শেষ উপহার', 'মরীচিকা', 'উৎসব', 'রাত্রি ও প্রভাতে'।

তিন

চিত্রাকাব্যে মানবপ্রীতি কতটা এবং আদর্শ সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার তা বিরোধী কিনা, এ সংশয় মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। পাঠকমহলের এই সংশয় কবির অজানা ছিল না। তা দূর করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন-সায়াহ্নে লিখেছিলেন, "বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা।' 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা।······ জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী—কবির কাছে এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।" [রচনাবলী-সংস্করণে ভূমিকা]

সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-বিদায় অভিশাপ-ছিন্নপত্রাবলী-সাহিত্য (কিছু প্রবন্ধ)-গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড) রচনাকালে (১৮৯১-৯৫) রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে নিরুদ্দেশ ও অমর্ত্য সৌন্দর্যসন্ধানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি সুখদুঃখময় সাধারণ মানবজীবনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে থাকেন। তাঁর পদ্মাজীবনের সমস্ত অনুভূতিই দ্বি-কোটিক। একদিকে পদ্মার উচ্ছল স্রোতোবেগ, বিশাল বিস্তার এবং তার দূর-প্রসারিত নির্জন বালুচর অসীমের অনুভূতি ও রহস্যদ্যোতনার উৎস। অপরদিকে পদ্মার তীরের ছায়াচ্ছন্ন, মানবহৃৎস্পন্দনে মৃদু-আন্দোলিত, শান্তি-নিকেতন গ্রামগুলি

কবির মানবিক সহানুভূতি জাগিয়ে তুলে তাঁর মর্ত্যপ্রীতিকে ঘনীভূত করে। ছিন্নপত্রাবলীর পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য পাই। কবিহৃদয় এই দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণে দ্বিধা-বিভক্ত।

'প্রেমের অভিষেক' (১৪ মাঘ ১৩০০), 'এবার ফিরাও মোরে' (২৩ ফাল্গুন ১৩০০), 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২) চিত্রাকাব্যে বর্ধিত মানবপ্রীতির নিদর্শন, তাতে সন্দেহ নেই।

'প্রেমের অভিষেক' বাহ্যতঃ মর্ত্যপ্রেমের জয়গান। দীনহীন কেরানী, সহস্রের মাঝে একজন—সদা বহন করে সংসারের ক্ষুদ্রভার, সহে কত দয়া কত অবহেলা। সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন প্রবাহ থেকে তুচ্ছ কর্মাধীন কেরানীকে উদ্ধার করেছে তার প্রেমিকা, তাকে করেছে সম্রাট, পরিয়েছে গৌরব মুকুট, ঢেকে দিয়েছে তার সকল দৈন্য লজ্জা ক্ষুদ্রতা। একে কি সাধারণ মানুষের প্রেমসৌভাগ্য লাভের বিবরণী বলা যায়? কবিতার রূপসজ্জায় ভঙ্গিমায় মহিমান্বিত প্রেমের বন্দনায় বেজে ওঠে অন্য সুর।

> "ইহা যে কোনো উঞ্ছবৃত্তি, আপনার সৌভাগ্যস্ফীত কেরানীর ভাবোচ্ছ্বাস নহে, তাহা সমস্ত কবিতার দিব্যলাবণ্যময় অঙ্গদ্যুতিতে, উহার পৌরাণিক উল্লেখ-পরম্পরায় ও কাব্যসাহিত্যে বিশ্রুত, আদর্শ প্রণয়ীদম্পতির সহিত সাদৃশ্য-ঘোষণায় প্রমাণিত। মানসসুন্দরীর বিমূর্ত-কল্পনা নূতন ভাব-প্রতিবেশে এই কবিতাটির অন্তরপ্রেরণারূপে বিরাজিত। এই প্রেমিক যিনিই হোন তিনি অন্ততঃ হরিপদ কেরানীর সগোত্রীয় নহেন। কোন অবদমিত কামনার করুণ ব্যঞ্জনা নয়, সমৃদ্ধিমান, ঐশ্বর্যময় প্রেমই এখানে মর্ত্যলোকে অমরাবতী সৃজন করিয়াছে। এই প্রেমের স্বর্গীয় অধিকারে ইহার প্রেমিকের সৌন্দর্যের নন্দন-ভূমিতে অবাধ সঞ্চরণ।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়)। তার পরিচয়স্থল নিম্নধৃত অংশ—"হাত ধরে মোরে তুমি/লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি/অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান/অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,/সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,/ সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা/নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ/রবিচন্দ্রতারা, পরি নবপরিচ্ছদ/শুনায় আমারে তারা নব নব গান/নব-অর্থভরা, চিরসুহৃদসমান/ সর্বচরাচর।'

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে নোতুন সুর বেজেছে ; রবীন্দ্রনাথ আদর্শ সৌন্দর্যলোক থেকে ধূলির ধরণীতে ফিরেছেন ; আপনার সৌন্দর্যমগ্নতাকে আত্মধিক্কারে জর্জরিত করেছেন : এই ধরনের কথা শোনা যায় পাঠকমহলে। বিবেচ্য, এই দীর্ঘ কবিতাটি কি চিত্রা কাব্যের মূল সুরের বিবাদী।

এই দীর্ঘ কবিতা কয়েকটি পঙক্তি-ব্যূহে বিভাজিত। প্রথম দুটি ব্যূহে নিজ কাব্যচর্চাকে কর্তব্য-পলাতক বালকের বাঁশি বাজানোর পর্যায়ে ফেলেছেন, গরীব মানুষের প্রতিবাদহীন অদৃষ্ট-নির্ভর লাঞ্ছনার বাস্তব চিত্র এঁকেছেন, সংকল্প প্রকাশ করেছেন যে এদের প্রতি কেবল দরদ নয়, তাঁর আছে সংগ্রাম-স্পৃহা, এদের তিনি দেবেন স্বর্গ থেকে আনা বিশ্বাসের ছবি। পরবর্তী পঙক্তি-ব্যূহে আত্মধিক্কার—তাঁর বাঁশি (কাব্যরচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি) জনগণের কাজে লাগছে না বলে আক্ষেপ করেছেন ; শেষ পর্যন্ত জানিয়েছেন এই বাঁশি গণজীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনবে, বাঁশি ছেড়ে অসি ধরবেন না। অন্তিম ব্যূহের সূচনায় কবির আত্ম-সম্বোধন—'বলো, মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ।' কবি যেতে চেয়েছেন 'মহাজীবনে। জনগণের পুরোবর্তী হয়ে কবি বেরিয়েছেন অন্তরতম সত্যের সন্ধানে। শেষে দেখা গেল—'সে' আর কেউ নয়—কবির বহুপরিচিতা মানসলক্ষ্মী—'নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমা'। কবি বেরিয়েছিলেন গণঅভ্যুত্থানের অগ্রবর্তী সৈনিকরূপে, হয়ে গেলেন 'বিশ্বপ্রিয়া'র ভক্ত। সুতরাং এই কবিতা রবীন্দ্রকাব্যক্ষেত্রে বৈপ্লবিক দিক্-পরিবর্তনকারী বলে চিহ্নিত হতে পারে না। গণমুক্তি নয়, জীবনের অন্তরতম সত্য-ই কবির অন্বিষ্ট। 'বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে' ক্ষুদ্রতাকে বলি দিয়ে জীবনের সব অসম্মান বর্জন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। তাঁকে অন্তরে রেখে 'জীবনকণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী'। সংগ্রামী দলের অগ্রবর্তীরূপে নয়, একাকী যেতে হবে। নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা মহিমালক্ষ্মীর-চরণোপান্তে পৌছতে পারলে 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা'—এই বিশ্বাসে কবিতার সমাপ্তি। দুবছর পরে লেখা 'আবেদন' কবিতায় এ কবিতার বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' আর-একটি মানবপ্রীতিমূলক কবিতা বলে পরিচিত। সত্যি কি তা-ই ? এখানে কি স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের বিরোধ কল্পিত ?

কবির কাছে পৃথিবী অশ্রুসজল প্রীতিকোমল স্বর্গখণ্ডগুলির সমবায়। হৃদয়হীন ব্যথাহীন সুখমরুভূমি স্বর্গের বদলে কবি বরণ করেছেন ভূতলের এই স্বর্গকে। সুতরাং এখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের বিরোধ নয়, দুরকমের স্বর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কবি চেয়েছেন এক কল্পস্বর্গসুখ। স্বর্গের অমৃতের সঙ্গে মর্ত্যের প্রেমসুধা মিশিয়ে এই কল্পস্বর্গনির্মাণে কবি উদ্যোগী হতে চান। রঙ্গময়ী কল্পনার হৃদয়হীন স্বর্গ বাদ দিয়ে স্বর্গের অমৃতের সঙ্গে মর্ত্যের প্রেমসুধা মিশিয়ে, স্বর্গের তাপশৈত্যহীন পরিবেশে অশ্রুমন্দাকিনী বহিয়ে এক নবস্বর্গসুখ-আস্বাদনে কবি আগ্রহী। সে স্বর্গ মাতৃভূমি, তা ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির সমবায়। বিচ্ছেদবিরহমৃত্যুর পটভূমিতে নিবিড় শঙ্কিত ভালবাসায় ভরা ভূতলের স্বর্গকেই কবি চান। সুতরাং এখানে মানবপ্রীতির অবিমিশ্র

নিদর্শন পাই না। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'এখানে স্বর নেমেছে উর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের ভূমিতে', কিন্তু তা নবস্বর্গসুখ-প্রত্যাশী।

চার

চিত্রা কাব্যে কবির সৌন্দর্যচেতনা ব্যক্ত হয়েছে তিনটি কবিতায়—'আবেদন' (২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২), 'উর্বশী' (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২), 'বিজয়িনী' (১ মাঘ ১৩০২)। পর পর দুদিনে দুটি ও একমাস বাদে আর একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের কবি কাব্যরচনাসামর্থ্যের অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন।

'আবেদন' ও 'বিজয়িনী' কবিতায় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জয় ঘোষিত হয়েছে। প্রথম কবিতায় বহির্জগতের সব-কিছু থেকে স্বেচ্ছা-প্রত্যাহৃত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসেবায় একনিষ্ঠভাবে আত্ম-সমর্পিত ভালোবাসার পরিচয়। দ্বিতীয় কবিতায় তত্ত্বভারমুক্ত বিশুদ্ধ আত্ম-সমাহিত সৌন্দর্যের পদপ্রান্তে প্রণাম নিবেদিত।

'আবেদন' কবিতায় পূর্বেই বলেছি 'এবার ফিরাও মোরে'-এর সাংসারিক কর্তব্য-দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত। কবি এখানে তাঁর রানীর (মানসসুন্দরী) পরিচারকরূপে নিজেকে কল্পনা করেছেন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পরিচর্যার কোন্ পুরস্কার কবি চান? —দেবীর রক্তিম চরণতলে লুটিয়ে পড়ে প্রসাদ লাভ। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মালঞ্চের মালাকর হওয়াতেই কবি তাঁর কাব্য তথা জীবনসাধনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। রানীর রাজপ্রাসাদ ও তার সৌন্দর্যবিলাসের যে বিচিত্র বিবরণ কবি দিয়েছেন, তা কবির সৌন্দর্যসাধনার পরিচায়ক। 'কর্মভীরু অলস কিংকর, কী কাজে লাগিবি'—রানীর প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্যের উক্তিতে সৌন্দর্যসাধনার সারকথা কবি বলেছেন—'অকাজের কাজ যত,/আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত/আনন্দের আয়োজন।'

'বিজয়িনী' কবিতায় তত্ত্বভারমুক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের বিজয় ঘোষিত। সমগ্র কবিতাটিও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিমা। অচ্ছোদসরসীতে স্নানশেষে তীরে এসে দাঁড়াল রমণী—

> স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
> অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
> লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
> বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে
> পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে, অধরে,
> উরু'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
> বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়

ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার, সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া ॥

এতক্ষণ অন্তরালে সহাস্য বসন্তসখা মদন সুন্দরীর স্নানলীলা দেখছিল ; তার উৎসুক চঞ্চল আঙুল সুন্দরীর নির্মল কোমল বক্ষস্থল লক্ষ্য করে পুষ্পধনুশর নিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন বাঞ্ছিত অবসর পেয়ে সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর—

চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

স্নানোত্থিতা রূপসীর সৌন্দর্যলাবণ্যের কাছে সম্ভ্রমনত অনঙ্গের প্রহরণত্যাগে গভীর আত্ম-সমাহিত স্থির সৌন্দর্যের কাছে প্রণয়াবেগের পরাজয় ঘোষিত।

বিশ্বকাব্যসাহিত্যের বিরল শ্রেণীর গুটিকতক কবিতার অন্যতম 'উর্বশী'। এ কবিতার উৎকর্ষ-বিচারে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কাতীত সমালোচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুরাগ আদর্শকল্পনারঞ্জিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই মন্ময়তামুক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীর পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে এক সার্বভৌম রূপচেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রকল্পনার সমস্ত উপাদান—তাঁহার বিশ্বচেতনা, অসীমানুভব, রূপমুগ্ধতা, প্রণয়াবেশ—সবই আছে। কিন্তু কবির মনোলোক হইতে দূরবর্তিনী, সত্তাবৈশিষ্ট্য-সম্পন্না এক স্বর্গনারীকে অবলম্বন করিয়া ইহারা এক অভিনব মূর্তিতে সংহত হইয়াছে।"

[তদেব]

আটটি ত্রুটিহীন পুষ্পসম স্তবকে উর্বশী ওরফে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বর্ণনা কবি দিয়েছেন। ১. উর্বশী কোনো সাংসারিক সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ নয়। ২. ক্ষুদ্র সীমার গণ্ডীতে সে ধরা দেয় না—সে যেন বৃন্তহীন পুষ্প। ৩. উর্বশী অনন্তযৌবনা—যখনি সে বিশ্বে আবির্ভূত তখনি যৌবনে-গঠিতা পূর্ণপ্রস্ফুটিতা। ৪. যুগযুগান্তর ধরে বিশ্বের প্রেয়সী—তার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন হয় যৌবন-চঞ্চল। ৫. উর্বশীর নৃত্যের তালে তালে ত্রিভুবন স্পন্দিত, ছন্দিত হয়। ৬. অনন্তরঙ্গিনী ত্রিলোকবাসীর হৃৎপদ্মে রেখেছে অতিলঘুভার পাদপদ্ম—অস্পৃহা ক্রন্দন বক্ষশোণিতে সে জগতের কাম্য ৭. তার জন্য দিকে দিকে বেজে ওঠে ক্রন্দনরোল, তাতে উর্বশী কর্ণপাত করে না। ৮. সে গৌরবশশী কোনদিন ফিরবে না—তারই জন্য বসন্তের আনন্দে চিরবিরহ-দীর্ঘশ্বাস পড়ে, পূর্ণিমারজনীতে বেজে ওঠে ব্যাকুল বাঁশি, ঝরে অশ্রুরাশি; অবন্ধনা অ-ধরা উর্বশীর জন্যে নিখিলের প্রাণে জেগে থাকে আশা।

এই স্তবক-বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান যে উর্বশী নিখিলবিশ্বের আরাধিতা সৌন্দর্য-প্রতিমা। সবপ্রকার লৌকিক ও সাংসারিক পরিচয় ও কর্ম-অভ্যাস তার নেই। তার সৌন্দর্য দান-প্রতিদানে পরস্পরনির্ভর গার্হস্থ্য-আবেষ্টন থেকে মুক্ত। তার বাল্যইতিহাস মানুষের কৌতূহলকে প্রশমিত করে না।

"এই অলোকসম্ভবা রূপশিখা কবির দিব্যদৃষ্টির নিকট আত্মপরিচয়ের দীপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। উর্বশীর স্বরূপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে নিখিলের রূপতরঙ্গের ছন্দোময় প্রবাহে, স্খলিত তারকার ক্ষণদীপ্ত আত্মঘাতী চিত্তবিভ্রমে, মানবের অসংবরণীয় যৌবন-চাঞ্চল্যে ও সংযমশাসনছিন্ন রূপমোহে ও তাহার গভীরতর অনুভূতিতে এক চির-অতৃপ্ত, মর্মমূলজড়িত বেদনাবোধে। সে নিজে অপরিচয়ের অন্ধকারে আবৃত, কিন্তু চরাচরের অনির্বাণ কামনাবহ্নি তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে আমাদের বোধগম্য করিয়াছে। এই উর্বশী মানবের হৃদয়সমুদ্র-মন্থনজাত রূপলক্ষ্মী, তাহার এক হাতে তৃপ্তির অমৃত, অপর হাতে অতৃপ্তির বিষ। তাহার উদ্ভবমুহূর্তে চির-অশান্ত সমুদ্র তাহার নিকট মাথা নত করিয়া মানুষকেও তাহার নতি-স্বীকারের শিক্ষা দিয়াছে।... জগতের আদিম যুগে উর্বশীকে লইয়া যে বাসনা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, মোহভঙ্গে বিস্বাদ এই আধুনিক যুগে তাহা একটি বিষণ্ণ, নৈরাশ্যক্ষীণ, স্তিমিত প্রত্যয়ে অবসিত হইয়াছে।...কেবল আছে উদাস স্মৃতি, আনন্দের সহিত অবিচ্ছেদ্য অব্যক্ত বেদনা, আর অতিক্ষীণ, সুদূর আশার দীপ্তি।" [তদেব]

চিত্রা কাব্যে 'উর্বশী' কবিতার স্থান কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত আমাদের মনোযোগ দাবি করে।

"মানসসুন্দরীর যৌগিক সত্তার একটি অংশ উর্বশীতে মূর্ত হইয়াছে। আদর্শ প্রেয়সীর কল্যাণস্পর্শবর্জিত, প্রগাঢ়প্রণয়াবেশহীন অলভ্যতা ও উহার বিশ্বব্যাপ্ত, চকিত আবির্ভাবই এই দুই নারীকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র। কে জানে হয়ত মানসীর বঞ্চনা-প্রবণতা, তাহার মরীচিকাবিভ্রান্তিই কবিকে উর্বশী-কল্পনায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে।...'চিত্রা'য় কবিচেতনার এক স্তরে মানসী উর্বশীরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকিবে।" [তদেব]

কল্যাণ-অকল্যাণ শুভ-অশুভের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্য প্রকৃতির মতোই মানব-নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী, 'উর্বশী' কবিতায় এই তত্ত্ব অপরূপ রসপরিণামে ও রূপসৃষ্টিতে ব্যক্ত। আদর্শ অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের এই মহিমা ঘোষণা চিত্রা কাব্যের মূল সুর।

২০

পুনশ্চ : বিচিত্রের রূপায়ণ

এক

পুনশ্চ কাব্যের (১৯৩২ খ্রী.) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ২ আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ তারিখে লিখেছিলেন, প্রথম বিশ্বসমরকালে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। প্রশ্নটা উঠেছিল গীতাঞ্জলির ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ প্রসঙ্গে, যে অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। এই কাজটি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রসর হন নি। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই চেষ্টা করেছিলেন; 'লিপিকা'র (১৯২২) অল্প কয়েকটি লেখায় তা আছে। "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" তার দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যে সে ভীরুতা কাটিয়ে উঠেছেন, একথা বলেছেন পুনশ্চ-এর ভূমিকায়।

আমরা আর একটু পিছিয়ে এই ইতিহাসটা ধরতে চাই। ক্ষণিকা কাব্য (১৯০০ খ্রী.) থেকে রবীন্দ্রনাথের পদ্যচর্চায় গদ্য-পদ্যের অদ্বৈত উপলব্ধি সন্ধান করা যেতে পারে।

গদ্য-পদ্যের আত্মীয়-সম্পর্ক শিল্পী-মুখাপেক্ষী এবং গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধের মধ্য দিয়েই যে শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ—এ কথার প্রথম উপলব্ধি রবীন্দ্র-রচনায়। গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি পুনশ্চ-এ স্পষ্টতর হ'ল, কিন্তু লিপিকায় তার সূচনা, পলাতকা ও পরিশেষ কাব্যে তার যোগ্য ভূমিকা। এটি প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (১৯৩৩, 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে, ১৯৫৭, সংকলিত)।

রবীন্দ্র-রচনায় গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধিতে ক্ষণিকা (১৯০০) ও পলাতকার (১৯১৮) শিল্পসাফল্য ও পরবর্তী পরাগতি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি যে বেশ সুখে আছি
অন্তত নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।

সেই কারণে গভীরভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর
এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।
মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে।
জানে না সেই খবর কেহ! [কবি, ক্ষণিকা]

এই কবিতার ভঙ্গিটি গদ্যপ্রতিম। গদ্যের উপাদান—সংযোজক অব্যয়, প্রাত্যহিক ইডিয়ম—এখানে পাঠক-শ্রুতি এড়িয়ে যায় না। বক্তব্য উপস্থাপনায় গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনের অঙ্গীকার এখানে লক্ষণীয়।

এই শিল্পপ্রয়াসের সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল পলাতকা কাব্যের কাহিনীগুলিতে। প্রাত্যহিক সংলাপের তুচ্ছতা ও রূঢ়তা থেকে কতো অনায়াসে গভীর আবেগের স্তরে শিল্প-উত্তরণ ঘটতে পারে, তার প্রমাণ এইসব কাহিনীমূলক কবিতা।

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন।

গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিঝিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।
[নিষ্কৃতি, পলাতকা]

এই কবিতাংশে গদ্য-উপাদানের অভাব নেই। প্রাত্যহিক ইডিয়ম, রূঢ় ক্রিয়াপদিক শব্দবন্ধ, কথ্যরীতির ক্রিয়াপদের প্রাধান্য সহজেই শ্রুতিতে ধরা পড়ে। 'সনে' ছাড়া একটিও পদ্য-উপাদান নেই, তথাপি এ প্রাত্যহিক গদ্য নয়, সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ তার আপাত-তুচ্ছতার অন্তরালে একটা অসাধারণ আবেগের ফল্গুকে বহন করে। এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, উন্নীত চৈতন্যের ভাষা। এই ভাষারূপ ধরা পড়েছে শেষ সাত চরণে।

আক্ষেপের বিষয়, পলাতকা-র এই শিল্পসম্ভাবনা অব্যবহিত পরবর্তী পর্বের কবিতায় (পূরবী ১৯২৪, মহুয়া ১৯২৯) উপেক্ষিত। কিন্তু তার স্থানে দেখা দিয়েছে লিপিকা (১৯২২) যার শিল্পসম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যেখানে কবির আত্মস্বীকৃত 'ভীরুতা' গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে বাধা হয়েছে। লিপিকা-র দ্বিধা ঘুচেছে দশ বছর পরে পরিশেষ (১৯৩২) ও পুনশ্চ কাব্যে (১৯৩২)।

'আজ দেখি, সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।' ['বাণী', লিপিকা]

এই অংশটি গদ্য না পদ্য ?

গদ্যের শাসন ও পদ্যের অবরোধ—দুই-ই এখানে অস্বীকৃত। এই অংশ প্রাত্যহিক জীবনের গদ্য নয়। একে কবিতার রূপ দিলে দোষ ঘটত না। 'পুনশ্চ'-এর ভূমিকায় এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবুল করেছেন, সেদিন তিনি সাহস পান নি। আবার পদ্যের অবরোধকেও এ অংশ অস্বীকার করেছে পদে পদে, তাও স্বীকার্য।

মুক্তচ্ছন্দের প্রতিষ্ঠায় গদ্য-পদ্যের সঙ্গম শিল্পসার্থকতা পায়, এ সত্য মনে রেখে এই অংশকে পুনর্বিন্যস্ত করা যায় :

আজ দেখি
সেই দুরন্ত মেয়েটি
বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে,
বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়।
তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ
আজ অচঞ্চল,
তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে
ডানাভেজা পাখির মতো।
ওকে এমন স্তব্ধ
কখনো দেখি নি।
মনে হল
নদী যেন চলতে চলতে
এক জায়গায় এসে
থমকে সরোবর হয়েছে।

সন্দেহ নেই যে এই অংশের ভাষা উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

আরো দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে সাহসী ও যত্নবান হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পরিশেষ ও পুনশ্চ। পরিশেষ-এ এই সাধনা ততটা অগ্রসর নয়, যতটা পুনশ্চ-এ।

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে
গোধূলিবেলায়
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
সাদা কালো দাগগুলো
দেখা দিত ভয়ংকর মূর্তি ধরে।
ওইখানে দৈত্যপুরী,
অদৃশ্য কুঠরী থেকে তার
মনে মনে শোনা যেত হাউমাউখাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজো পিঠ
খিলিখিলি হাসত ডাইনী বুড়ী।

কাশিরাম দাস
পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
ইট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেই সঙ্গে নাক-কাটা স্থর্পনখা
কালো কালো দাগে।
করেছিল কুটুম্বিতা।

['আতঙ্ক', পরিশেষ, রচনা ২৩ জুলাই ১৯৩২]

পরিশেষ থেকে পুনশ্চ-এর ব্যবধান সময়ের দিকে স্বল্প, শিল্পভাবনার দিক থেকে গুরুতর। পুনশ্চ-এর গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ভীরুতা ও দ্বিধা বর্জন করে দেখা দিয়েছেন। 'পদ্যছন্দের স্থস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস' দেওয়ার প্রথম পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন লিপিকায়। 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি।—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।' পুনঃপ্রয়াসের ফল পুনশ্চ কাব্য। 'গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।'

[ভূমিকা, ২ আশ্বিন ১৩৩৯/১৯৩২]।

গদ্যকবিতা আসলে কী? গদ্যছন্দ বা prose-verse-এর সঙ্গে পদ্যচ্ছন্দের পার্থক্য কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়—prose-verse-এ পদ্যচ্ছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব নেই। এক একটি phrase বা অর্থস্থচক শব্দসমষ্টি prose-verse-এর উপাদান। স্থতরাং prose-verse-এ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠতে পারে না। prose-verse-এর এক-একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্য কোনোরূপ ধ্বনিগত লক্ষণের দিক দিয়ে নয়, কিন্তু পদ্যচ্ছন্দের আদর্শ বা pattern আছে।

[শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' দ্রষ্টব্য]

(পুনশ্চ কাব্যের চারটি কবিতায় কবি গদ্যকবিতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন; সেগুলি হ'ল—'কোপাই', 'নাটক', 'নূতনকাল', 'পত্র'।)

পুনশ্চ কাব্য থেকে দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

১. মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।

আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি,—
একদিন আমি দেখেছিলাম এই সব-কিছু। [দেখা]

২. সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এল, 'বাবু, ডেকেছিস কেনে।'
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'
আমি বললেম, 'এই জন্যেই।'
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়। [ক্যামেলিয়া]

এই দুটি কবিতাংশের ভাষা উন্নীত চৈতন্যের ভাষা, সাংসারিক গদ্য থেকে তা ভিন্নতর, কিন্তু একান্তভাবে পদ্যের ভাষা নয়।

পুনশ্চ ও পরবর্তী তিন গদ্যকবিতা-গ্রন্থে (শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী) ও নৃত্যনাট্যে (চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা) রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে যত্নপর হয়েছিলেন। গদ্য-পদ্যের আত্মীয়-সম্পর্ক শিল্পীমন্য দায়িত্বের মুখাপেক্ষী এবং গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধের মধ্য দিয়েই শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ—একথার প্রথম উপলব্ধি রবীন্দ্র-রচনায়। পুনশ্চ কাব্য এই উপলব্ধির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। (গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের নিবন্ধ "গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধন ও বাঙালি লেখক", সাহিত্য-সন্ধান, জানুআরি ১৯৭১, কলকাতা)। এখানে স্বীকার্য, গদ্য-পদ্যের আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে

দিতে চেয়েছিলেন। কবির সে আশা পূরণ হয় নি। সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

গদ্যকবিতা কেন, সাধারণভাবে কবিতার পক্ষে, যে প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে জরুরি, তা হ'ল—ছন্দ বা মিল, কোনোটিই কবিতার পক্ষে বন্ধন নয়, উপায়মাত্র। এ বিষয়ে জনৈক তরুণ কবির গদ্য পদ্য ও গদ্যকবিতা সম্পর্কিত আলোচনা শোনা যেতে পারে।

ছন্দ বা মিল—কবিতার পক্ষে বন্ধন নয়, উপায় মাত্র। "কিন্তু কিসের উপায়? প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই কবির আবেগ বা আত্মপ্রকাশের উপায়, কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্যটিও অবহেলাযোগ্য নয়। এই দ্বিতীয় লক্ষ্যের একটি মৌলিক ব্যাখ্যা আমরা পাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর প্রসিদ্ধ ভূমিকায় যেখানে তিনি লিখেছিলেন ছন্দ-মিল বাধাবন্ধহারা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভাষার অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টির ক্ষমতাকে খর্ব করে কয়েকটি বহিরারোপিত নিয়ম-কানুনের দ্বারা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কথিত এই দ্বিতীয় লক্ষ্য অনুসারে ছন্দ-মিল যে সদর্থে কবিতার পক্ষে বন্ধন তা স্বীকার করে নিতে হয়। এবং এই বন্ধন-দুটি আছে বলেই কবিতার পক্ষে আনন্দদান গদ্য অপেক্ষা সহজতর। কিন্তু ছন্দ-মিল থেকে যে আনন্দের উদ্ভব তা সম্পূর্ণ একটি কবিতা থেকে উৎসারিত আনন্দের ন্যূনতম অংশ। একবার যদি আমরা কোনো কবিতা থেকে ছন্দ-মিল তুলে নিই, তৎক্ষণাৎ সঙ্গত কারণেই, সেই কবিতাটির ভাষা গদ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ও তার আদর্শের দ্বারা বিচার্য হয়ে ওঠে।

বহুকাল যাবৎ বাঙালী কবিরা গদ্যের বাক্‌ভঙ্গী ও ধর্মের সঙ্গে কবিতার ভাষার একটি চলাচলযোগ্য সেতু গড়ে তোলার সাধনায় নিয়োজিত আছেন। এপথে আমাদের আদিগুরু মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেল কবিতায় মিল বর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু ছন্দ বর্জন করেন নি। তৎসত্ত্বেও চোদ্দমাত্রার পয়ারে তিনি গদ্যসুলভ চলৎশক্তি এনেছিলেন তার পঙক্তিতে, অথচ এই চলৎশক্তি বাক্‌ভঙ্গীর তাগিদে আসে নি তাঁর কবিতায়, এসেছিল কঠিন অচলিত তৎসম শব্দগুলির বোঝাকে সচল করে তুলবার জন্য। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ এইখানে যে, তিনিই প্রথম চোদ্দমাত্রার পয়ারকে পঙক্তিসীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। এই বন্ধনমুক্তি ছাড়া সম্ভবই হতো না পরবর্তীকালে গদ্যকবিতার জন্ম। তাই ভুল হবে না যদি বলি গদ্য ও কবিতার মধ্যবর্তী সেতুটির শিলান্যাস করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন, যদিও ভবিষ্যৎকালে সে সেতু নির্মাণের দায়িত্ব বর্তায় রবীন্দ্রনাথে।" [ডঃ দেবতোষ বসু, 'গদ্য পদ্য এবং গদ্য-কবিতা', 'সিদ্ধার্থ', ২য় বর্ষ ৭ম সংকলন, বৈশাখ ১৩৮৪]

গদ্য ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে এই লেখক জানিয়েছেন, ন্যূনতম অর্থে গদ্য প্রকাশের মাধ্যম, কিন্তু কবিতা কখনোই মাধ্যম নয়, সে একটি

স্ব-সম্পূর্ণ লক্ষ্য। তার লক্ষ্য পাঠক-মনে অভিঘাত সৃষ্টি। আর গদ্যকবিতা? তা কি সাদা-মাটা গদ্যে লেখা কবিতা? না আরো কিছু? না কি এমন গদ্যে লেখা কবিতা, যা কথ্যভঙ্গীতে দীক্ষিত এবং গদ্যের সীমান্ত-লঙ্ঘনে তৎপর? গদ্যভাষার এই সীমান্ত পেরুলেই পাই কবিতার নিশ্চিহ্ন সাম্রাজ্য। সেখানেই কি গদ্যকবিতা আমাদের নিয়ে যেতে পারে? হাঁ, পারে। বিষয়সীমা ও অর্থসীমা পেরিয়ে, "স্পষ্ট ও অস্পষ্টের দ্বন্দ্ব থেকেই গড়ে ওঠে গদ্যকবিতা—সেখানে ভাষার প্রকাশক্ষমতার সঙ্গে গোপন করার ক্ষমতার এক শৈল্পিক নিষ্পত্তি হয়ে যায়।" [তদেব]

গদ্যকবিতার বিচার হবে কোন্ পথে? রবীন্দ্রনাথের কাছে তার কোনো নির্দেশ আমরা পেয়েছি কি?

"একটি গদ্যকবিতার বিচারে নেমে প্রথমেই আমাদের বুঝে নিতে হয়, ঐ কবিতায় ব্যবহৃত গদ্যভাষা কতখানি উত্তীর্ণ। যদি দেখি গদ্যের আদর্শ ও ধর্ম সেখানে উপেক্ষিত, তা হলে রচনাটি বড়জোর কাব্যিক হয়ে ওঠে, শ্রেয়তর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপেক্ষার অকাব্যিক চেহারাটা আংশিক দেখে নিয়ে পালাবদলের সূচনাতেই 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—'এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করার চেষ্টা করেছি। যেমন—তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না, সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিই নি।' এটা বর্জনের তালিকা, গ্রহণের নয়—পদ্যের বিশেষ ভাষারীতিকে বিদায়, গদ্যের বিশিষ্ট ধর্ম ও ভঙ্গীকে অভ্যর্থনা নয়। গ্রহণ করা হলো শুধু পদ্যশোভন মিল নয়, পদ্যের ভাষারীতি নয়, পদ্যের ছন্দ। এখানে গদ্যের ভাষারীতি আছে কি নেই সে সম্পর্কে কিন্তু অনবহিত-ই থেকে গেলাম। এ ধরনের কবিতা পদ্যের দুটো গিঁট খুলে ফেলেছে বটে, কিন্তু গদ্যের সঙ্গে সহবাসের জন্য প্রস্তুত হয় নি এখনো। অর্থাৎ গদ্য-পদ্যের মধ্যে আদানপ্রদানের ব্যবস্থাটি এই ভূমিকায় আমল পেল না। অথচ ঐ আদানপ্রদানের মধ্যে যে নিহিত কোনো বিরোধ নেই তা তো রবীন্দ্রনাথ-ই দেখিয়েছেন 'ক্ষণিকে'র দ্যুতিময় পঙক্তিসমূহে, 'পলাতকা'র বিষাদ-মধুর কথকতায়।" [তদেব]

রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা গদ্যকবিতাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন এই অর্থে যে গদ্যছন্দ ও গদ্যকবিতার ছন্দের বিচিত্র কলাকৌশল বা ছন্দোরূপের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্র-পরবর্তীরা করেছেন। এবং স্বীকার্য, বাংলা কবিতায় সচেতনভাবে প্রথম সুধীন্দ্রনাথ-ই চেয়েছিলেন গদ্য ও নির্বিরোধ, অর্থাৎ পদ্যের মাত্রাবিন্যাস বজায় রেখেছেন, কিন্তু গদ্যের স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি (উদাহরণ, সংবর্ত কাব্যের 'জেসন' কবিতাটি)। আর এক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির পূর্বসূরী 'পুনশ্চ'র রবীন্দ্রনাথ

নন, 'ক্ষণিকা'র রবীন্দ্রনাথ, যিনি লিখেছিলেন—'আমি যে বেশ সুখে আছি/অন্তত নই দুঃখে কৃশ/সে কথাটা পদ্যে লিখতে লাগে একটু বিসদৃশ।...সহজ লোকের মতোই যেন/সরল গদ্য কয় গো।' (কবি, ক্ষণিকা)। এই কাব্যরীতি ও ছন্দোরীতি সুধীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন দুটি পরিবর্তন সহ; ক্ষণিকা-র হালকা চাল বর্জন করে নিলেন গাম্ভীর্য আর রাবীন্দ্রিক ছড়ার ছন্দের এলাকা ছেড়ে নিজের আবেগকে সংহত করলেন মূলত পয়ারে। সে আলোচনা এখানে দরকারের বাইরে। স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথ-ই বাংলা গদ্যকবিতার সূত্রপাত ঘটালেন 'পুনশ্চ'এ।

(রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন নানা চিঠিপত্রে এবং পুনশ্চ কাব্যের চারটি কবিতায়—'কোপাই', 'নাটক', 'নূতনকাল', 'পত্র'এ। গদ্য ও পদ্যের এক্তিয়ার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে, তার পরিচয়স্থল 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধ (১৩০৪ বঙ্গাব্দ, পঞ্চভূত ১৮৯৭ খ্রীঃ)। গদ্যকবিতার রীতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন তিনটি প্রবন্ধে—'কাব্যে গদ্যরীতি', 'কাব্য ও ছন্দ', 'গদ্যকাব্য'—এগুলি 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সংকলিত—১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এসব প্রবন্ধ রচিত হয়। 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গের আলোচনা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাকাব্য পরিচয়' (১৩৪৫/১৯৩৮)-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন—"সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ বলে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্যে ও কলাসৃষ্টিতে টিকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়—পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়। অমিতাক্ষর ছন্দ যেমন তার যতিবিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পঙক্তিতে চলে গেছে, গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষররীতির বহুদূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চিরনিষেধ, অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজর দেখলে বোঝা যায়, একথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈব চ বলবার শেষ অধিকার আজ তাঁদের নেই, হয়তো আছে কালকের লোকের।"

(রবীন্দ্রনাথ এখানে মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। সে পরিচয় পাই পুনশ্চ-এর কবিতায়। গদ্যকবিতার অধিকার তিনি মেনে নিয়েছেন। তার প্রমাণ:

১. কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে—
যেখানে ভাষার গান তার যেখানে ভাষার গৃহস্থালি। [কোপাই])

২. (একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।) [নাটক]

৩. আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে ;
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারই কথা মনে করে। [নূতনকাল]

৪. হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল।···
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অগ্নিবাসে চড়ে। [পত্র]

দুই

('পুনশ্চ' কাব্যে যে পালা-বদল হয়েছে তার সূচনা পাই 'পরিশেষ' কাব্যে ও সমকালীন গদ্যরচনায়।) 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থের সূচনা হয়েছিল 'রিলিজন অভ্‌ ম্যান' (১৯৩০) নামক ইংরেজি-গ্রন্থে। আসলে এই সময়টা (১৯৩০-৩৩) রবীন্দ্র-জীবনে ও রবীন্দ্র-চিন্তায় মোড় ফেরার সময়। গীতাঞ্জলি পর্বের ঐশী সাধনাকে তিনি কবেই পিছনে ফেলে এসেছেন। (পঞ্চান্ন থেকে আশি বছর বয়স (১৯১৬-১৯৪১) পর্যন্ত প্রসারিত যে পঁচিশ বছরের পর্ব, তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে, মননে ও চিন্তায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তমান দুনিয়ায় পুরানো মূল্যবোধের অবসান ও নব নব মূল্যবোধের সন্ধান এ-পর্বের রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। রবীন্দ্র-কাব্য-জীবনেও এ পর্বে বারবার বন্দরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অজানা সমুদ্র-পানে পাড়ি দেবার ঘটনা ঘটেছে।)

আত্মপরিচয় গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধে (পৌষ ১৩৩৮/১৯৩১ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য

এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে—আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে—আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।'

এই বক্তব্য উপস্থাপনার পাঁচ বছর পূর্বে কবি লিখেছিলেন,

এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,—
কত ভালোবেসেছিনু আমি।······
লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা সে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।······
যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

[বর্ষশেষ, পরিশেষ/৩০ চৈত্র ১৩৩৩/১৯২৭]

দুটি উদ্ধৃতিতে কয়েকটি সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: (১) মর্তজগতের প্রতি ভালোবাসা, (২) মানবজন্মের প্রতি ভালোবাসা, (৩) মহতের প্রতি প্রণাম, (৪) নরদেবতার প্রতি প্রণাম। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত দুটি গদ্যাংশ ও কবিতাংশে এই মূল বক্তব্য সংহত রূপ লাভ করেছে।

পরিশেষ কাব্যের সূচনা-কবিতায় :

হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

[প্রণাম, ৬ এপ্রিল ১৯৩১]

পুনশ্চ-কাব্যের এই হ'ল যথার্থ মানস-পটভূমি। (জীবনের বহুবিচিত্র প্রসারিত অভিজ্ঞতালোক থেকে কবি তাঁর কাব্য-শস্য সংগ্রহ করেছেন। এই পটভূমিতে বড় হয়ে উঠেছে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য : বাস্তব-জিজ্ঞাসা, মহামানব-চেতনা, মানবহৃদয়ের প্রেম ও প্রসার-প্রবণতা, বাস্তবের বৈচিত্র্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, জীবন-মরণের মধ্যে একটি অলক্ষ্য সংযোগ-সূত্র-সন্ধান এবং ঐশী প্রেরণাবর্জিত মানবমুখিতা। পুনশ্চ কাব্যের কবি বাস্তব-সত্যের দার্শনিক। জীবন-সত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ এখানে ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

পুনশ্চ কাব্য বাস্তব-জীবনের কাব্য, বিচিত্রের কাব্য, বস্তু-সত্যের কাব্য। "এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে, আর চলিত কালের চাঞ্চল্য" ('নাটক')। দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে পুনশ্চ কাব্যের বিচিত্র রূপলোক।)

এ কাব্যে চলতিকালের রূপে চিরন্তনের ছবি যেমন আছে (পুকুরধারে, ফাঁক, দেখা, সুন্দর, শেষদান, কোমল গান্ধার), তেমনি আছে বাস্তবচিত্রে সর্বজনীন চিরকালীন চরিত্র (বাঁশি, অপরাধী, ছেলেটা, সহযাত্রী, শেষ চিঠি, বালক, একজন লোক, কীটের সংশয়)। এখানে যেমন আছে কল্পচিত্রের সৌন্দর্য (বাসা, খেলনার মুক্তি), তেমনি আছে নিছক চিত্ররসের কবিতা (স্মৃতি, খোয়াই)। পুনশ্চ-কাব্যের বৈচিত্র্য কম নয়। এ-কাব্যে যেমন আছে প্রাচীন কাহিনীর মাধ্যমে শাশ্বত তত্ত্বের প্রকাশ (মানবপুত্র, শাপমোচন, প্রথম পূজা, শুচি, রঙরেজিনি, মুক্তি, প্রেমের সোনা, স্নান সমাপন), তেমনি আছে আধুনিক কাহিনীর মাধ্যমে শাশ্বত তত্ত্বের প্রকাশ (ঘরছাড়া, অস্থানে)। পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, কয়েকটি কবিতায় গদ্যছন্দের প্রকৃতি বিচারিত হয়েছে (কোপাই, নাটক, নূতনকাল, পত্র)। আধুনিক প্রেমজীবনের জটিলতা যেমন পেয়েছে কাব্যরূপ (ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, পত্রলেখা, সাধারণ মেয়ে), তেমনি পেয়েছে উপেক্ষিত প্রকৃতি-প্রীতি (ছুটি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন)। আর-কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্র-দর্শনের তত্ত্ব (বিচ্ছেদ, বিশ্বশোক, মৃত্যু, শিশুতীর্থ, চিররূপের বাণী, তীর্থযাত্রী)।)

তিন

জীবন-মরণের মধ্যে একটি অলক্ষ্য সংযোগ-সূত্র কবি সন্ধান করেছেন 'বিচ্ছেদ', 'বিশ্বশোক', 'মৃত্যু' কবিতায়।

জীবনকে কবি দেখেছেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে। তারই ফলশ্রুতি :

১. 'অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে/তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে/আনন্দের নব নব পর্যায়। /পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে—/নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক ;/ নিত্যই সে একা,/সেই তো একান্ত বিরহী।' [বিচ্ছেদ]

২. 'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি,/লজ্জা দিয়ো না!/সকলের নয় যে আঘাত/ ধোরো না সবার চোখে।' [বিশ্বশোক]

৩. 'অসীমের অসংখ্য যা-কিছু/সত্তায় সত্তায় গাঁথা/প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।/ নিবিড় সে সমস্তের মাঝে/অকস্মাৎ আমি নেই।/এ কি সত্য হতে পারে!/ উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান/এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে!' [মৃত্যু]

বিচ্ছেদ ও মৃত্যু জীবনকে পূর্ণতা দান করে : এই তত্ত্বের এখানে প্রাধান্য।

'চিররূপের বাণী' কবিতায় (প্রথম প্রকাশ : 'পরিচয়' মাঘ ১৩৩৯/'রূপবাণী' নামে প্রকাশিত) দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে দেহমুক্ত বাণীর যুগলমিলনের কথা বলা হয়েছে। জড়ের সীমা ও অপূর্ণতাকে লঙ্ঘন করে যেতে পারে প্রাণ ও মন। তাদের অভিযানের কথাই বাণীরূপ পেয়েছে এখানে। জড়মাটির অহংকার কি জয়ী হবে প্রাণ ও মনের উপরে? না। অন্ধ মূক জড়শক্তি বাণীকে চাপা দিতে পারে না : এই চিরন্তন সত্য এ কবিতায় আভাসিত। 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি এলিঅটের The Journey of the Magi কবিতার অনুবাদ। পুনশ্চ কাব্যের কবি আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যভাবনার সঙ্গে যোগ রেখে চলেছেন, তার প্রমাণ এ কবিতা। পুরনো বিধিবিধানকে পিছনে ফেলে নোতুনকে গ্রহণের পথে যে-সব শারীরিক মানসিক বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, এখানে তাদের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে মনের দিক থেকে নবজন্মলাভের বেদনার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের কবিতায় রূপায়িত এই বেদনাকে ছুঁয়েছেন।

আর 'শিশুতীর্থ' কবিতায় বড়ো করে তুলে ধরেছেন তাঁর নব মানবধর্মকে। পুনশ্চ কাব্যের মহামানবচেতনা এখানেই রূপায়িত হয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা মৌলিক কবিতা The Child-এর রূপান্তর। মূল ইংরেজি রচনার সময়, জুলাই ১৯৩০, স্থান, জর্মানির মিউনিক শহর, বাংলা অনুবাদ শ্রাবণ ১৩৩৮, অগস্ট ১৯৩১ খ্রীঃ। এ কবিতার বিশেষ প্রেরণা—জর্মানিতে খ্রীষ্ট-জীবনের অপরূপ নাট্যরূপ দর্শন। The Child বিলাতে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৩১)। কলকাতায়

এর নৃত্যাভিনয় হয় একই বছরে। 'শিশুতীর্থ' প্রথম প্রকাশিত হয় বিচিত্রা ১৩৩৮ ভাদ্র সংখ্যায় আর আশ্বিন সংখ্যায় বেরোয় 'তীর্থযাত্রী' প্রবন্ধ। দুয়ে মিলিয়ে পাঠ করলে 'শিশুতীর্থ'-এর বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কবিতার শিরোদেশে পূর্বে উৎকীর্ণ ছিল অথর্ববেদের একটি শ্লোক—'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ'।—ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্ণব। এই শ্লোকাংশে শিশুতীর্থ কবিতার মূল বক্তব্য দ্যোতিত। (স্মর্তব্য, 'লিপিকা'র প্রচ্ছন্ন গদ্যছন্দের রচনাগুলি বাদ দিলে এখানেই কবি গদ্যছন্দে প্রথম হাত দেন। মূল ইংরেজি রচনা থেকে এই বাংলা রূপান্তরণ প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য, ইংরেজি গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকবিতা। ইংরেজি গদ্যকবিতা থেকে কবি বাংলা গদ্যকবিতাক্ষেত্রে এসেছিলেন, এই সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না।)

মানুষ চলেছে প্রেমের তীর্থে। পথে আছে রাতের অন্ধকার, মনের মধ্যে আছে অবিশ্বাস-সন্দেহ-ঈর্ষার অন্ধকার। এ আঁধার পেরিয়ে দলে দলে মানুষ চলেছে প্রেমের দুর্গম তীর্থে। শত শত তীর্থযাত্রী অন্ধকারে শোনে বিশ্বাসী ভক্তের কণ্ঠস্বর, কিন্তু তাকে দেখতে পায় না। আর সে কারণেই তার কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করে, তাকে ভয় করে। বিশ্বাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—'ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।' অবিশ্বাসী শ্রান্ত ত্রস্ত তীর্থযাত্রীরা বলে—পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি। যখন ভয় পায় তারা বলে—'ভাই, তুমি কোথায়?' তখন শোনে কণ্ঠস্বর—'আমি তোমার পাশেই।' তবু তাদের ভয় যায় না, অবিশ্বাস যায় না। দয়াহীন দুর্গম পথে তবু তারা চলতে থাকে। রাতের পর প্রভাত, দেশের পর দেশ, পেরিয়ে চলেছে কতো পঙ্গু খঞ্জ অন্ধ আতুর চোর প্রতারক—কতো মাতা কুমারী শিশু বৃদ্ধ যুবক জরতী। অবিশ্বাস আর ভয় এসে তাদের গ্রাস করে, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে, মারে আপন নেতাকে। কে তাদের পথ দেখাবে? পূবদেশের বৃদ্ধ বললে—"আমরা যাকে মেরেছি/সেই আমাদের পথ দেখাবে।/সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি/ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি/প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—/কেননা মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত/সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।" তারা আবার যাত্রা শুরু করল প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে। আজ "মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;/সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে/এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।" মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোক অভিমুখে তাদের যাত্রা। তারা চলেছে রৌদ্রদগ্ধ পথে, চলেছে তমিস্র রাত্রির পথে, চলেছে প্রতিদিনের লোকযাত্রার মধ্য দিয়ে। অবশেষে তারা পৌছল এক রুদ্ধ দ্বারের সামনে, উচ্চারণ করল সৃষ্টির প্রথম পরমবাণী : মাতা, দ্বার খোলো। দ্বার খুলে গেল। তীর্থযাত্রীরা দেখলে,

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু। তখন সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল—আকাশে উঠল গান—সে গান ভাষা পেল তাদের কণ্ঠে—'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।'

পুনশ্চ-কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর—মানুষের জয়—মানবতার মহিমা-ঘোষণা এভাবেই 'শিশুতীর্থ' কবিতায় বাণীরূপ পেয়েছে। ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্ণব : অথর্ব-বেদের এই মন্ত্র খ্রীষ্ট-জীবনের নাট্যরূপের মাধ্যমে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে সাকার হয়ে উঠেছে। কবি-দৃষ্টিতে ধর্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানবতার পটভূমিতে রূপ লাভ করেছে সত্য—'প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—কেননা মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত।' খ্রীষ্টজন্মের যে-কাহিনী পুরনো বাইবেলে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে সর্বজনীন চিরকালীন রূপ দিয়েছেন। মানব-মন্দিরে কবি এভাবেই রেখেছেন একের চরণে তাঁর প্রণাম।

চার

কেবল চিরকালের শুদ্ধতা নয়, চলতিকালের চাঞ্চল্যও বাণীরূপ পেয়েছে পুনশ্চ-কাব্যে। প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ-ভাঙা অসংগতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন পরম-একের সংগতি। পুনশ্চ-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বারবার নোতুন কালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। 'নূতন কাল' কবিতাটি তার প্রমাণ। পুনশ্চর আগে-পরে কবি বারেবারেই নোতুন কালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। যেমন, সেঁজুতি কাব্যের 'নূতন কাল', 'চলতি ছবি', 'চলাচল' ও 'পরিচয়' কবিতায়, পত্রপুট কাব্যের 'তোমার অন্য যুগের সখা' কবিতায়, পরিশেষ কাব্যের 'নূতন শ্রোতা' কবিতায়। শেষ পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যে যে বিদায়ের সুর শোনা গেছে, তার সূচনা হয়েছে পরিশেষ ও পুনশ্চ-কাব্যে। সেই সঙ্গে এসেছে নির্মোহ জীবন-পর্যালোচনা ; শান্ত চিত্তে ফেলে-আসা জীবনকে অবলোকন ; বিদায়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি। নোতুন কালের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন কবি 'নূতন কাল' কবিতায়।

চলতিকালের চাঞ্চল্য রূপ পেয়েছে দু' ধরনের কবিতায়। চলতিকালের রূপে চিরন্তনের ছবি আঁকায় কবির আগ্রহ আছে। সে আগ্রহের পরিচয় সাধারণত কাব্যে অবহেলিত দৃশ্য ও জীবনের অনুপুঙ্খ ছবিতে। যেমন, 'পুকুর-ধারে' কবিতায় দেখা ছবিটি। দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়া ভাদ্রমাসের কানায় কানায় জলে ভরা পুকুর, ঢালু পাড় ও বাগানের ছবি। শেষের কবির উপলব্ধি : 'চেয়ে দেখি আর মনে হয়,/এ যেন আর-কোনো-একটা দিনের আবছায়া ;/আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে/

সুদূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।' 'ফাঁক' কবিতায় কবি মনে মনে পিছিয়ে চলে যান সেইদিনে 'বয়স যখন অল্প ছিল'। সেদিনের দুএকটি নির্বাচিত ছবি—ইস্কুল-পালানো ছেলের হাঁস নিয়ে খেলা, নববধূর পত্ররচনা—কবিকে উন্মনা করে। মনশ্চক্ষুতে এসব ছবি দেখে 'একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,/আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে।' চলতিকালের চাঞ্চল্য-ভরা নানা ছবি দেখে—শ্রাবণ-ভাদ্রের প্রকৃতির খেপামি দেখে—কবির 'মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো/চাই নে হারাতে। / আমার সত্তর বছরের খেয়ায় কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল/তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।/তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে/পিছনে রেখে যাব/ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে;/তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—/একদিন আমি দেখেছিলেম এইসব কিছু।' (দেখা)। পুনশ্চ-কাব্যধৃত চলতিকালের ছবি অংকন ও সংকলনের পিছনে কবির এই মনোভাব সক্রিয়। বর্তমান মুহূর্তের চলচ্ছবি—কোনো প্রকৃতি-দৃশ্য কবিকে বারবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় ফেলে-আসা দিনে; মনে পড়ে যায় অনেকদিনের পুরানো কথা। সেই স্মৃতি-জাগানো ভালো-লাগার ক্ষণের ছবি আছে 'সুন্দর' কবিতায়, যেমন আছে 'দেখা' কবিতায়। তেমনি আছে 'শেষ দান' ও 'কোমল গান্ধার'এ। শেষোক্ত কবিতায় ভালো লাগার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভালোবাসার ছোঁয়া।

(চোখের সামনে দেখা বাস্তবচিত্রে কবি চিরকালীন স্তব্ধতাকে পেতে চেয়েছেন কয়েকটি কবিতায়। কয়েকটি মানুষ কবির লেখনীমুখে প্রাণ পেয়ে উঠে এসেছে আমাদের সামনে। তাদের আমরা চিনি। যেমন, দুষ্টু তিনু ('অপরাধী'), দুরন্ত ছেলেটা ('ছেলেটা'), কুরূপ ডেকের যাত্রী ('সহযাত্রী'), পিতৃহৃদয় খালি-করে-চলে-যাওয়া-মেয়ে অমলা ('শেষ চিঠি'), হিরণমাসির মন-মরা বোনপো ('বালক'), রোগা লম্বা আধবুড়ো হিন্দুস্থানি ('একজন লোক'), পিঁপড়ে-সমাজ ('কীটের সংসার')। এইসব অতিসাধারণ চরিত্রকে দেখার মধ্যেই বেজে ওঠে অপরিচয়ের সুর, অনাদিকালের বিরহ-বেদনা। এই সুর ও গান চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে 'বাঁশি' কবিতায় যেখানে কিনু গোয়ালার গলির কদর্য পরিবেশে, বীভৎস বাতাসে মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে। 'হঠাৎ সন্ধ্যায়/সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,/সমস্ত আকাশে বাজে/অনাদি-কালের বিরহ-বেদনা।' কর্নেট-বাজিয়ে কান্তবাবুর কর্নেটের সুরে বদলে যায় বাস্তব পরিবেশটা, 'তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে—/এ গলিটার ঘোর মিছে/দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো। /হঠাৎ খবর পাই মনে,/আকবর বাদশার সঙ্গে/হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই,/বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে/ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে/বৈকুণ্ঠের দিকে।')

পুনশ্চ-কাব্যে কেবল বাস্তবরসের কবিতা নেই, সেইসঙ্গে আছে কল্পরসের কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যে রিয়ালিজম্ কখনই ইমাজিনেশ্যন ও ফ্যাণ্টাসিকে পুরোপুরি চাপা দিতে পারেনি। তাই বাস্তব-সত্যের দার্শনিক কল্পচিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। তাই আমরা পেয়েছি কবির মনে মনে তৈরি ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে পছন্দসই বাসা। শেষে কবির স্বীকৃতি—'এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।' তবু কবির মনে হয়, 'আমার মন বসবে না আর-কোথাও,/সব-কিছু থেকে ছুটি নিয়ে/চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ/ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।' (বাসা)। ফ্যাণ্টাসির জগৎ কবি গড়ে তোলেন 'খেলনার মুক্তি' কবিতায়।

আর চিত্ররস প্রাধান্য পেয়েছে দুটি কবিতায়। একটির পটভূমি গাজিপুর ('স্মৃতি'), অপরটির শান্তিনিকেতন অদূরবর্তী খোয়াই ('খোয়াই')। দুটিই কবিজীবনের সঙ্গে জড়িত। কবির আপন জীবনপর্যালোচনাব সঙ্গে জড়িত এই ছবিদুটির ঐশ্বর্য কেবল বহিরঙ্গে নয়, অন্তরে।

পাঁচ

পুনশ্চ-কাব্যে কবি প্রবেশ করেছেন আধুনিক কালে। এ কাল এসেছে তার সমস্ত বিক্ষোভ, জটিলতা, সংঘর্ষ নিয়ে। তারই মধ্যে—প্রাচীন ও আধুনিক কাহিনীর মধ্যে—কবি খুঁজেছেন শাশ্বত তত্ত্বকে। 'রিলিজন অভ ম্যান' আর 'মানুষের ধর্ম'-লেখক রবীন্দ্রনাথকে আমরা পুবোপুরি পাই পরপর গ্রথিত ছ'টি কবিতায়—শুচি, রঙরেজিনি, মুক্তি, প্রেমের সোনা, স্নান-সমাপন, প্রথম পূজা (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ/১৯৩২ খ্রীঃ)। সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন যে নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে এখানে কবি তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন। গুরু রামানন্দ ও জোলা কবির, পণ্ডিত শংকরলাল ও জসীম রঙরেজিনির মেয়ে আমিনা, অনামী বিদেশী কীর্তনিয়া ও বাজিরাও পেশোয়া, চামার রবিদাস ও রানী ঝাঁলি, গুরু রামানন্দ ও ভাজন মুচি, কিরাত মাধব ও নৃপতি নৃসিংহরায়—এদের কাহিনীর মাধ্যমে কবি নরদেবতাকে প্রণাম জানিয়েছেন। অন্ত্যজ ব্রাত্যদের মাঝেই ঈশ্বরের আসন পাতা আছে, ব্রাহ্মণ্য-দুর্গ মন্দিরে নয়,—এ সত্য এখানে উচ্চারিত। ঐশী প্রেরণাবর্জিত মানবমুখিতা কবিকে কতোটা অধিকার করেছে তার প্রমাণ এসব কবিতা। তার প্রমাণস্থল, 'মানবপুত্র' ও 'শাপমোচন'। সমকালীন ঘটনার স্পর্শ আছে 'মানবপুত্র'-এ। কিন্তু তা আছে পটভূমি হয়ে—য়োরোপের সমরায়োজন এ কবিতার পটভূমি। যেমন, 'শুচি' ও 'প্রেমের সোনা' কবিতার পটভূমি সমকালীন ভারতের অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন। স্মর্তব্য 'প্রেমের সোনা' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ কবি পাঠিয়েছিলেন

যারবাদা জেলে অনশনরত গান্ধিজীকে ১৯৩৩-এর মে মাসে। সমরায়োজনে মত্ত য়োরোপ আজ নোতুন করে খ্রীষ্টকে অপমান করছে, মানবধর্মকে লাঞ্ছিত করছে। 'শাপমোচন' কবিতার বিষয় বাইরের রূপ বনাম অন্তরের রূপ, রূপমোহজ ভ্রান্তি ও সংশয়, এবং সংশয়মোচনের বেদনাবিদ্ধ কাহিনী। রানী কমলিকা বলে—'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে'। আসলে সে রূপবিকৃতিকে মিলনের পথে বড় বাধা বলে জেনেছিল। গান্ধাররাজ বলে—'একদিন সইতে পারবে/আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে।/কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।' বহির্লোক থেকে অন্তর্লোকে রানী যেদিন প্রবেশ করল পরমবেদনার মূল্যে সেদিন সুন্দরকে সে চিনতে পারল, এই সত্য 'শাপমোচন' কবিতায় ব্যঞ্জিত।

আধুনিক কাহিনীর মাধ্যমে শাশ্বত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে 'ঘরছাড়া' আর 'অস্থানে' কবিতায়। বর্ণনার সংক্ষিপ্তি, নিরাভরণতা ও দ্রুততায় আধুনিক এখানে রূপ পেয়েছে। 'শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজন' সবটা নয়, তাকে ছাপিয়ে যায় 'নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন' : এই সত্য আভাসিত চামেলি ও বিজলিবাতির তারগুলির কাহিনীতে ('অস্থানে') এবং জর্মানি থেকে আগত এক ভবঘুরে সহজ মানুষ আর দেশি ছবি-আঁকিয়ের মিলন-কাহিনীতে ('ঘরছাড়া')। 'ওরা মানুষ'—এটাই তাদের বড়ো পরিচয়। মানব-পরিচয়ের উপরে আর কোনো পরিচয় নেই, এই শাশ্বত তত্ত্ব এখানে উচ্চারিত। 'রিলিজন অভ ম্যান' ও 'মানুষের ধর্ম'-এর বক্তব্যের এর মিল গভীরে।

পুনশ্চ-কাব্যে আধুনিক জীবনের আর একটি দিক্ আভাসিত। এই জটিল সংগতিহীন স্বতোবিরোধী জীবনে ব্যক্তিপ্রেম ও নিসর্গপ্রেম হয় বাধাপ্রাপ্ত, নয় উপেক্ষিত। সেই বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিপ্রেমের জটিলতা রূপ পেয়েছে চারটি কবিতায় (ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, পত্রলেখা, সাধারণ মেয়ে) আর উপেক্ষিত নিসর্গ-প্রীতি রূপ পেয়েছে তিনটি কবিতায় (ছুটি, গানের পালা, পয়লা আশ্বিন)। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, করুণা, উপেক্ষার বাধা পেরিয়ে কীভাবে আধুনিক জীবনে প্রেমের তির্যকরূপ প্রকাশ পায়, তা চারটি কাহিনীধর্মী কবিতায় লক্ষণীয়। কাব্যের শেষ তিনটি কবিতায় প্রকৃতির কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত পদক্ষেপ। নিসর্গের পটে সুন্দরের ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাব সূচিত করে আধুনিক জীবন থেকে প্রকৃতির নির্বাসন। নির্মল শরৎ রৌদ্রালোকে আশ্বিনের প্রথম দিনে কবির আত্মসম্বোধন—'জাগো আমার মন'—তা হার মানতে চায় না, যেমন হার মানেনি কিনু গোয়ালার গলির বীভৎসতার কাছে কান্তবাবুর কর্নেটে বেজে-ওঠা সিন্ধু বারোয়াঁর তান।

স্বীকার্য, ঐশীপ্রেরণাবর্জিত মানবমুখিতা পুনশ্চ-কাব্যকে এক বিরল মর্যাদা।

২৯

শেষ সপ্তক: কবির আত্মান্বেষণ

এক

কবির চুয়াত্তর বছর বয়সে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শেষ সপ্তক কাব্য (২৫ বৈশাখ ১৩৪২/এপ্রিল ১৯৩৫)। এর ছ'বছর পরে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। মনে হয়, মৃত্যুর ছ'সাত বছর পূর্ব থেকেই কবি শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কাব্যগত জীবনেও ধরা পড়েছিল। কি ব্যক্তিগত কি শিল্পগত জীবনে কবি বন্ধনমোচনের, আসক্তিমোচনের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ছন্দ-মিলের বন্ধন, নামরূপের বন্ধন থেকে যেমন কবিতাকে মুক্তি দিচ্ছিলেন, তেমনি মর্তের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রস্তুতিও এসময় চলছিল। আসক্তিমোচন ও মৃত্যুর জন্য শান্ত প্রস্তুতি যুগপৎ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে ধরা পড়ে। শেষ সপ্তক তার অন্যতম উদাহরণ। একাব্যে মৃত্যুভাবনা রোমান্স-বর্জিত। এখানে কবির বৈরাগ্য প্রশান্ত গম্ভীর। কবির মনোভাব নিরাসক্ত উদাসীন। জীবনান্তে উপনীত হয়ে হিসাব-নিকাশ, জীবনদর্শনচিন্তা ও মৃত্যুচিন্তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ একাব্যে। সেই সঙ্গে এসেছে আর এক চিন্তা—দুরধিগম্য মানবসত্তা নিয়ে চিন্তা। অবশ্যস্বীকার্য, শেষ সপ্তক মননপ্রধান কাব্য। প্রখর মননের ছাপ পড়েছে অধিকাংশ কবিতায়। মানবসত্তা-জিজ্ঞাসামূলক কবিতার মননঋদ্ধ রূপ শেষ সপ্তক কাব্যে অবিরল।

সবরকম বন্ধন থেকে মুক্তি, ছুটি এসময়ে কবির কাছে প্রার্থিত হয়ে উঠেছিল। এসময়ে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে একটি চিঠিতে—"আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকি নে। আমার চোখের সামনে যেন সেই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা interned। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাই নে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাই নে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই—'আমি সুদূরের পিয়াসী'। বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব একথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে

মুক্তি পাই নে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি—৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।"
(শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্র, ১৯২৮)

এ বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেন কবিতায় এইভাবে—

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম,
জানলা বন্ধ, দেখতে পাই নে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর—
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।
আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা,
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।
কিছু কাজ করি—তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতি মুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ, নিঃশব্দ, সুদূর—
জীবনের চার দিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

[শেষ সপ্তক, ১৫ সংখ্যক কবিতা]

রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ দশকের (১৯৩২-৪২ : পরিশেষ-পুনশ্চ থেকে শেষলেখা) রচনা মূলত আবেগাত্মক কাব্য নয়, তা রূপাত্মক (aesthetic) কাব্য। এর ভিত্তিতে আছে মনন, এর রূপে আছে মনন। তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে ঋতু-বদলের কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।" [নবজাতক কাব্যের 'সূচনা', ৪ এপ্রিল ১৯৪০]

শেষ পর্যায়ের কবিতার বিষয়বস্তু, বক্তব্য, চিন্তাবীজকে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করা যেতে পারে এইভাবে :

১. নির্মোহ পৃথিবী-চিন্তা : 'পৃথিবী' (পত্রপুট), ৭ সংখ্যক কবিতা, (শেষ সপ্তক)।

২. প্রশ্নকণ্টকিত মৌল জীবন-ভাবনা : 'কেন', 'প্রশ্ন' (নবজাতক), 'দুর্ভাগিনী' (বীথিকা), ৫ সংখ্যক কবিতা (রোগশয্যায়), ৪৫, ৪৬ সংখ্যক কবিতা (শেষ সপ্তক), ১৩ সংখ্যক কবিতা (শেষ লেখা)।

৩. অশুভের স্বীকৃতি—মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে অপরিসীম যন্ত্রণার স্বীকৃতি : 'ছোটোপ্রাণ', 'চিরন্তন', 'সান্ত্বনা' ১, ২, 'প্রশ্ন' (পরিশেষ), ১০ সংখ্যক কবিতা (প্রান্তিক)।

৪. বিবর্তিত ঈশ্বর-ভাবনা,—ভগবৎবিশ্বাস থেকে মানবব্রহ্মবাদে উত্তরণ , গীতাঞ্জলি থেকে পুনশ্চ-এ উত্তরণ : পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, আরোগ্য।

৫. ভেদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব : পুনশ্চ, নবজাতক, সেঁজুতি, প্রান্তিক।

৬. মৃত্যু-ভাবনা,—আলোকের স্বীকৃতি, অস্তিত্বের রহস্য-জিজ্ঞাসা ; রোমান্স-বর্জিত, নিরাসক্ত, বিষণ্ণ উদাসীন মোহমুক্ত প্রশান্ত গম্ভীর বৈরাগ্য : শেষ সপ্তক, প্রান্তিক, 'পঞ্চমী' (আকাশপ্রদীপ), ৭, ৮ সংখ্যক কবিতা (রোগশয্যায়), ৯ সংখ্যক কবিতা (আরোগ্য)।

শেষ পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই পর্যায়ের কবিতা মননজাত অভিজ্ঞতার ফসল। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা প্রশ্ন ও সমস্যা কবিকে এখানে পেয়ে বসেছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বপ্রকার বন্ধনমোচনের অভিলাষ। দুয়ে মিলে এ পর্যায়ের কবিতা রুক্ষ, দুরূহ, জটিল, প্রশ্নকণ্টকিত। অথচ অন্তরে খুব খাঁটি। শেষ সপ্তক কাব্য সম্পর্কে একথা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায়।

শেষ সপ্তক কাব্যের ছেচল্লিশটি কবিতার অধিকাংশই মননঋদ্ধ কবিতা। জগৎ ও জীবন, মৃত্যু ও অধ্যাত্মচিন্তা কবিকে কীভাবে ব্যাপৃত করেছিল, তার পরিচয় আছে এসব কবিতায়। আর কিছু কবিতা আছে যাতে ঠাঁই পেয়েছে অন্যান্য প্রসঙ্গ, যেমন ছবি-আঁকা (১৫, ১৬), সংগীত (১৭), গদ্যকবিতার রূপ (২০, ২৪, ২৫) ; আছে দুটি আখ্যান (৩২, ৩৩) ; আছে হাল্‌কাচালের কবিতা (২৮, ২৯, ৪১, ৪২) যেখানে জীবনের সহজ সাদামাটা রূপ চিত্রিত। এইসব গৌণ কবিতা বাদ দিলে যেসব প্রধান কবিতা, সেগুলিকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (১) প্রেমচিন্তা (১, ২, ৩, ১৩, ১৪, ৩০, ৩১), (২) প্রকৃতি-চিন্তা (৫, ১১, ২৭, ৩৭, ৩৮), (৩) মৃত্যুচিন্তা (৩৯, ৪০), (৪) মহাকাল-চেতনা (৭, ৮, ১০, ২১, ৩৪), (৫) কবির জীবনদর্শন (৪, ১৮, ২২, ২৩, ২৬, ৩৫, ৩৬, ৪৪), (৬) জীবনপ্রান্তে হিসাবনিকাশ (৬, ৪৩, ৪৫, ৪৬), (৭) দুরধিগম্য মানবসত্তা (৯, ১২, ১৯)।

দুই

শেষ সপ্তক কাব্যের প্রেম-কবিতার পটভূমি নিরাসক্ত বিদায়ভূমি। এ প্রেম বাউল-প্রেম। এখানে যে গান বেজেছে তা বাউল-বীণার গান। প্রেমের দৃষ্টি এখানে নব তাৎপর্য-অন্বিত। প্রেমের স্মৃতি কবিকে দিয়েছে জীবনের নবচেতনা। এখানে অন্ধ আসক্তি নেই, ছেড়ে দিয়ে পাবার কথা আছে।

কবি অনুভব করেছেন, দূরে দাঁড়ালেই সুরের মধ্যে পাই। নেবার হাতখানা বাড়াই যখন, তখন, কবির মনে হয়েছে, দূরের আকাশ সরিয়ে দিই। ভোগের হাতে পাওয়া যায় না, বাউল-বৈরাগ্যের হাতে পাওয়া যায়। একদিন নেবার খেলা শেষ হয়, ভোগের পালা শেষ হয়। তখন দেখি, না চাইতে যা পেয়েছি তার চেয়ে দুর্লভ আর কিছু নেই। তখন নেবার আসন থেকে নেমে আসি দেবার ভূমিতে, বাসনা থেকে উঠে আসি প্রেমে, তখন সুরের পাওয়া শুরু হয়। অন্তরে তখন বাউল-মন জাগে। ভোগের হাতে যা নিয়েছি, তার নোতুন মূল্য আবিষ্কার করি, বলি—

'তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারায়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।' (১)

প্রেমিকার অভাবনীয় স্মিত হাসির দোলা কবিকে উত্তীর্ণ করে দেয় প্রেমের নব উপলব্ধিতে—'হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে একটি অমৃতরেখা'—কোন্ দুর্লভ মুহূর্তে পাওয়া অনির্বচনীয়ের প্রকাশ কবির অধিচেতন স্মৃতিকে অধিকার করে রাখে। সংসারের তুচ্ছতায় তা হারিয়ে যায়। কিন্তু কবি এই রসাবেশের মুহূর্তটিকে নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। কবির মনে হয়েছে, বিশ্বপ্রকৃতিতে সুন্দরের প্রকাশগুলির সঙ্গে তার সুরসঙ্গতি। সেই-সব প্রকাশের রসমাধুরীর ইঙ্গিত দিয়ে কবি প্রাক্তন অমৃত-অনুভবের কথাটি বললেন, যা কবির সমস্ত জীবনকে সুরে ভরিয়ে তুলে চিরকালের সত্য হয়ে বিরাজ করছে—

অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ। (২)

আবার, কৈশোরের ক্ষণসঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে স্মৃতিচর্চায় নিরত হন কবি। তাঁর বিরহ স্নিগ্ধ বেদনায় রূপায়িত। তিনি স্বীকার করেছেন, অনেকদিনের নিঃশব্দ

অবহেলায় সেই প্রেম উপেক্ষিত হয়ে ছিল। কবির সহজ চেতনা ছিল আচ্ছন্ন। প্রতিদিনের নানা অন্তরালে প্রবাহিত প্রেম মৌনের মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন, স্বভাবের তীব্রতা তাকে রিক্ত জেনেই উপেক্ষা করে, তার মর্মলীন অমৃতকে খুঁজে পায় না। সহজের উন্মেষ না হলে তাকে বোঝা যায় না। তারপর—

ঘণ্টা গেল বেজে,

সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে। (৩)

তখন মৃত্যুর দূরত্বে দাঁড়িয়ে সহজ-চেতনায় কবি তার গৌরব অনুভব করলেন। তখন চলে-যাওয়ার বেদনা বাউল-বীণায় ঝঙ্কৃত হতে লাগল। (এই 'বাউল-প্রেম' অভিধাটি পেয়েছি আমার অন্যতম গুরু অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ও বন্ধু অধ্যাপক শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে।)

এই নিরাসক্ত বাউল-প্রেম বারবার ঝঙ্কৃত হয়েছে এ কাব্যে। পথ-চলতি বাউল এসে গায়, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়'। সকালের এই ছবিতে কবির মন পেল সুন্দরের ছোঁয়া, গেয়ে উঠল বাউল-সুরে—'অধরাকে ধরেছি।' কবি দেখছেন প্রভাতের আর একটি ছবি—সদ্যস্নাতা প্রেমিকা জানালায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে কবির মনে হল, অধরা ছিল তার দূরে-চাওয়া চোখের পল্লবে আর কাঁকন-পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়। বাউলের অচিন পাখির গানে তারই কথা। তখন কবি প্রেমিকার উদ্দেশে বলেন—

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও

একতারার তারে তারে।

সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,

দোলে বসন্তের বাতাসে।

তাকে বেড়াই বুকে করে ;— (১৩)

প্রেমমাধুরীর আনন্দ-লহরী তখন কবিকে ভাসিয়ে নেয়, ঢেউ তুলে তাঁর সহজ-চৈতন্যকে ছুঁয়ে যায়। যে-দেহের তন্ত্রীতে কাঁপন লাগে, সে-দেহকে তা অতিক্রম করে যায়, যেমন বীণার তারকে অতিক্রম করে যায় বীণার গান। রূপ তখন সুর জাগিয়ে আড়ালে সরে যায়, হারিয়ে যায় সুরের গম্ভীরে।

'অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে'।

বাউল-প্রেম নানাভাবে মানব-জীবনকে স্পর্শ করে যায়, দিয়ে যায় সমৃদ্ধি, নবীনতা, চিরন্তনতা। মানুষের জীবনে প্রেম যতই আকস্মিকভাবে আসুক না, তা যদি নিবিড় হয়, আত্মসমর্পণ যদি ঐকান্তিক হয়, তবে তা শাশ্বত হয়ে ওঠে। প্রেমের এক গভীর প্রকাশের রহস্যঘন মুহূর্ত দেখা দেয় অন্তরতম আবেদনের আকুলতায়—যখন প্রেমিকা

প্রেমিকের হাত চেপে ধরে বললে—'তোমাকে ভুলব না কোনদিনই'। এই কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে সমগ্র সৃষ্টিই যে অনুভব করে আপন অস্তিত্বের মর্মভূত রসসমুদ্রের উদ্বেলতা। সেই ঝিল্লিঝংকৃত রাত্রির স্পন্দনে কবিচেতনাও স্পন্দিত হয়, কবি পান আপন প্রাণের অমৃতের আস্বাদ, লাভ করেন সার্থকতা। এই সার্থকতা, এই অমৃত-পরিচয় স্থির বিশ্বাস নিয়ে কবি প্রকাশ করেন উদাসীন সংসারের সর্ববিধ জড়ধর্মী, মৃত্যুধর্মী আয়োজনের কাছে—

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ—

কবির সত্য-উপলব্ধি—

তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত করে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে। (১৪)

এই বাউল-প্রেম আবারো প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের সার্থকতা সম্বন্ধে কবির চিন্তায়। কবির বিচার—বিরহ-ভাবুকতার মধ্যে প্রেমের গাঢ়তা, মিলন তার লক্ষ্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দস্যুতায় প্রেমের সর্বস্বকে কখনই লুণ্ঠিত হতে দেওয়া উচিত নয়। কবি যেন এক বাউল-সুরদাস। সে বীণার তার বেঁধেছে আকাশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, দূরের পাওনার আশায়। চেনার মধ্যে অচেনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এই বাউল তার একতারাটি হাতে নিয়ে—আর বলে—

আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা,
ও কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি

আমার গোপন মিল আছে তারই ভিতর। (৩০)

মৃতপত্নীকের চিরবেদনায় ভারাতুর হৃদয়ের স্মৃতিচারণে এই বাউল-প্রেমে পেয়ে হারানোর আর হারিয়ে পাবার আনন্দ-বেদনা-ই প্রকাশিত (৩১)।

শেষ সপ্তক কাব্যের প্রকৃতি-চিন্তা দু' ভাবে, মননঋদ্ধ রূপে এবং নিছক ভালো

লাগার আনন্দে প্রকাশিত। ১১, ২৭ সংখ্যক কবিতায় প্রয়োজনবিহীন প্রকৃতি-প্রীতির আনন্দ, ৩৭ সংখ্যক কবিতায় প্রকৃতির শক্তির বন্দনা, ৩৮ সংখ্যক-এ বিরহী যক্ষের প্রেমের প্রাকৃতিক রূপের চিত্রণ। ৫ সংখ্যক কবিতাটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখ্য। অনিমন্ত্রণে বর্ষাঋতুর আগমনে কবি অনুভব করেছেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করে দেবার ব্যাকুলতা; উপলব্ধি করেছেন সুন্দরের স্পর্শে হয়ে-ওঠার ছবি; উপনীত হয়েছেন আপন সত্তার প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়।

কবিতাটি মননের ফসল। সুন্দরের ধ্যানে হয়ে-ওঠা নিবিড় নিমেষগুলি কবির অন্তর-ফলকে রেখে যায় সুন্দরের স্বাক্ষর। এর প্রতিরূপ কবি খুঁজে পেলেন আধুনিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের এক সত্যের মধ্যে, —কবি জেনেছেন সজল মেঘ-শ্যামলের ভূমিকা,—

বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ঐ তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে;
তার কাষ্ঠফলক চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।
তেমনি করে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে। (৫)

কবির আপন সত্তায় রয়েছে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা,—

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে।
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা—
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস,—
এসো প্রকাশ, এসো। (৫)

প্রেম-চিন্তা ও প্রকৃতি-চিন্তার হাত ধরে এসেছে মৃত্যু-চিন্তা। শেষ সপ্তক কাব্যের মৃত্যু-চিন্তা পূর্বেকার রোমান্টিক মৃত্যু-চিন্তা থেকে ভিন্নতর। ভানুসিংহের পদাবলী, মানসী, সোনার তরী-র মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে এর মিল নেই। যেমন মিল নেই মানসী, সোনার তরী, কল্পনার প্রকৃতি-চিন্তার সঙ্গে শেষ সপ্তকের প্রকৃতি-চিন্তার। শেষ সপ্তক কাব্যের মৃত্যু-চিন্তা আসলে অমৃত-চিন্তা। তা মনন-অভিজ্ঞতার ফসল। দুটি কবিতায় সে ফসল সংগৃহীত।

মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, জীবন থেকে জীবনান্তরে যাত্রা। কবি অনুভব করেন, মৃত্যু তাঁর অন্তরঙ্গ, জড়িয়ে আছে তাঁর দেহের সকল তন্তু। জীবন-উপান্তে উপনীত কবির এই উপলব্ধির পটভূমি বিশ্বরহস্যভেদকারী কল্পনা, কসমিক ইমাজিনেশন্। কবিতায় দেখা দিয়েছে তার রূপ—কবি মৃত্যুর মুখে শুনেছেন চরৈবেতি-বাণী—

বলছে, 'থেমো না, থেমো না,
পিছন ফিরে তাকিয়ো না,
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে, জীর্ণকে, ক্লান্তকে, অচলকে।

'আমি মৃত্যুরাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।' (৩৯)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে সৃষ্টির বিরামবিহীন ধারা। যে আবির্ভাবকে অথর্ববেদের ঋষি 'প্রথমজ অমৃত' বলে বরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই 'নবীন' বলে প্রণাম জানিয়েছেন। 'প্রথমজাত অমৃত' কে ?—মানবসত্তা, যে চিরনবীন, কত জরা, কত মৃত্যু, কত অনিত্যতার মধ্য দিয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। বিশ্ব-দেউলের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আজকের বাউল-কবি তাকেই বন্দনা করলেন ; সে-ই নবীন, সে-ই সহজ, সে-ই প্রথমজ। বিশ্বব্যাপী কসমিক কবি-কল্পনা তাকেই দেখেছে সময়াতিক্রমী পটভূমিতে—

বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চলে,
নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়—
তিমিরধারায় স্খলিত করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা,
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে
পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত। (৪০)

এই পটভূমিতে কবি আজ আপন সত্তাকে নিত্য নবীন, আনন্দময় বলে উপলব্ধি করেছেন—

আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে। (৪০)

এর থেকেই আমরা চলে যাই শেষ সপ্তক কাব্যের মহাকাশ-চেতনা সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে। একই কসমিক কবিকল্পনা এখানে সক্রিয়। মহাবিশ্ব সম্পর্কে কবির ভাবনা এসব কবিতায় এসেছে অনায়াসে। মহাকালকে কবি বিশ্বচিত্রের রূপকার বলে জেনেছেন, অনুভব করেছেন মহাকালের শিল্পসৃষ্টির ছন্দটি বৈরাগ্যের ছন্দ। কল্পনার মহান্ সমুন্নতি ও গাম্ভীর্যের (সাব্‌লিমেশন, গ্র্যাঞ্জার) ফ্রেমে বাঁধা হয়েছে এই কবিতাগুলি।

আগেই বলেছি, শেষ সপ্তকের কবিতা মনন-অভিজ্ঞতার ফসল। আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তার তা পরিপন্থী নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিলয় সম্পর্কে কবির ধারণা আধুনিক পদার্থবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা ও সৌরবিদ্যার বিরোধী নয়।

রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীরূপী নির্মম উদাসীন মহাকালের কাছে আসক্তি-শূন্যতার দীক্ষা চেয়েছেন। বিশ্বচিত্রের রূপকার মহাকাল নামের অতীত। নির্মল আনন্দ-রূপের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ ঘটে বলে কবির উপলব্ধি। সেই আনন্দের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য-চেতনাকে কবি বলেছেন 'অন্ধকার'—'নূতন নূতন বিশ্ব/অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে/জন্ম নিয়েছে আলোকে'। সন্ন্যাসী মহাকালের কাছে কবির প্রার্থনা :

তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারই নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা। (৭)

বিশ্বভাবনা-সম্পর্কিত এই দার্শনিক বোধ পরবর্তী কবিতায় নবরূপে প্রকাশিত। কবি আলোর প্রেমিক, বন্ধনমোচনে ও বৈরাগ্য-বরণে তাঁর আগ্রহ। একদিন প্রাণের রঙ্গভূমিতে যে বাঁশি বাজিয়েছিলেন সে বাঁশিতে এবার নৈঃশব্দ্যের নবতর আলাপের তাগিদ এলো। ইতিহাসের পরিবর্তনশীল রঙ্গমঞ্চে সেই সুরের আলাপ কবি শুনতে পেলেন। অজন্তার গুহা-শিল্পীদের শিল্পসাধনায় সেই সুরের খেলা কবি আস্বাদন করলেন। কল্পনা-দৃষ্টিতে কবি গুহাচিত্র দেখে অজানা শিল্পীদের প্রণাম জানিয়ে বলেছেন,

নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।
নামক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি। (৮)

তাই কবির প্রার্থনা,

বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।
সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, তিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে। (৮)

সৃষ্টির নির্মল আনন্দের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য-চেতনাকেই কবি বলেছেন 'অন্ধকার'। এই অন্ধকার কবিকে পৌঁছে দেয় সৃষ্টির আনন্দের উৎসে। মনের প্রান্তসীমার ওপারে পা দিলেই চেতনায় সেই ছন্দের দোলা লাগে, অনুভব হয় চরম প্রকাশের মর্মভূত পরম বৈরাগ্য। কবি পৌঁছে যান এক অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে—

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মল্‌ করছে
কৃষ্ণচূড়ায় পাতার মতো। (৮)

অবিরামগতি মহাকাল, নিঃসীম আকাশ ও বিপুল নক্ষত্রলোক কবির উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠেছে।

তিন

শেষ সপ্তক কাব্য কবির আত্মানুসন্ধানের কবিতা। কবি কেবল ব্যক্তি-পরিচয়ের স্বরূপ সন্ধান করেন নি, সেই সঙ্গে সত্তার রহস্যও জানতে চেয়েছেন। চুয়াত্তরে উপনীত কবির জীবনদর্শন কাব্যরূপ পেয়েছে আটটি কবিতায়। আপাত-রুক্ষ, কঠিন, গম্ভীর রূপবিশিষ্ট এই কবিতাগুলির তলায় তলায় মনন ফল্গুর মতো প্রবাহিত।

বিশ্বজগতে আপনাকে নির্লিপ্তভাবে বিকীর্ণ করে দেবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। কবি অনুভব করেছেন, বহির্জগতে, নিসর্গরাজ্যে সর্বদা অস্তিত্ব বা প্রাণপ্রবাহের ধারা বইছে নানা শাখায়। মানব-ইতিহাসের নব নব ভাঙা-গড়ার উপর দিয়ে তার নিত্য আসা-যাওয়া। কবি এই বিশ্বধারার নিসর্গপ্রবাহে নিজের প্রাণ-প্রবাহকে মিলিয়ে দিয়ে সেই অস্তিত্বধারার গভীরতায় ডুব দিবেন। কবির বিশ্বাস, তখন তাঁর চেতনা ভাসতে ভাসতে 'মৃত্যু-মহাসাগর-সঙ্গমে' চলে যাবে। জীবন ও মৃত্যু এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, এই বোধ এখানে ক্রিয়াশীল। কতো সহজভঙ্গিতে কবি অনুভব করেছেন—

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।

আর কত সহজেই না তিনি এই ধারায় ডুব দিতে চেয়েছেন—

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে। (৪)

কবির জীবনদর্শনের আর এক পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে যেখানে তিনি সুহৃদ্বর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে তাঁর ব্যক্তিগত শোকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মানুষের অহংকারকে বিশ্লেষণ করেছেন। দেখিয়েছেন, আমরা সত্যই চাই না শোকের অবসান, কারণ আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও। আমাদের প্রিয়তমের একটিমাত্র দাবি আমাদের কাছে—মনে রেখো। কিন্তু এজগতে প্রাণের দাবি সংখ্যার অতীত। তার আহ্বান চারদিক থেকেই আসে মনের কাছে। তাই একটিমাত্র আবেদন টিকে থাকে না, থাকতে পারে না।. জীবনপ্রবাহের এই শাশ্বত সত্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন—

সকল অহংকারই বন্ধন;'
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকারে।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে। (১৮)

প্রাণের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কতটা? কবি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তার উত্তর দিয়েছেন। 'শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে'—জন্ম থেকেই দেহ প্রাণের সঙ্গ ধরেছে। দেহ জরাগ্রস্ত, আসক্তি-ভরা, দুর্গতিতে ভরা। আর প্রাণ জরাহীন, মৃত্যু-হীন, আসক্তিবিহীন। তাই এ দুয়ের সঙ্গ স্থায়ী হতে পারে না। আয়ুর প্রান্তে উপনীত কবির কাছে মহা-যৌবনের সমুদ্র-বিস্তার অনুভবে এলো। তখন দেহ-যৌবনের অন্তরায়গুলি অতিক্রম করার জন্য ব্যাকুল হলেন। প্রাণের অভিলাষ—দূর থেকে আসক্তিবিহীন হয়ে ওকে দেখব। দেখব জানালায় বসে পথিককে, দেখব উপর-তলায় বসে পুতুলনাচ; আর হাসব মনে মনে। যা মৃত্যুধর্মী তার তুচ্ছতা কবির কাছে ধরা পড়ে যখন তিনি দেহের আবরণ সরিয়ে দেন। তখন কবি হয়ে ওঠেন প্রথম আবির্ভাবের শুচিতায় আলোক-সুন্দর। সে রূপের আস্বাদন করে কবি আনন্দের সঙ্গে বলেন—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি—
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা। (২২)

কবির জীবনদর্শনের আরো গভীর পরিচয় আছে অন্যান্য কবিতায়। জগৎকে অভ্যস্ত চোখে আর নোতুন চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। কবি জগৎকে নোতুন চোখে দেখতে চেয়েছেন, নোতুন করে নিজেকে ও প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কবির অধ্যাত্ম-চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন—

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি,
মনে হয়, এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতি দিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে। (২৩)

কবির বক্তব্য : আমার মধ্যে যে সহজাত আনন্দ-চরিত্র আছে, তা প্রতি মুহূর্তেই বাইরের জগতের সঙ্গে মিলতে চাইছে। যেখানেই এই মিল ব্যাহত হচ্ছে, সেখানেই সে পীড়িত হচ্ছে। এই মিলের তাগিদে প্রতিদিনই সে হয়ে উঠছে, ততই সে আত্মার আবরণ কাটিয়ে উঠছে, ততই এই প্রতিদিনের চেনা জগৎকেই নোতুন করে দেখছে। এই হয়ে-ওঠার রসে সবই সুন্দর। তখন—

যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। (২৩)

মনোভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষায় কবি ঘোষণা করেছেন—'ভালোবাসি'। পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, মানবসংসারকে কবি প্রাণভরে ভালোবেসেছেন। এই ভালোবাসার মন্ত্র কবি পেয়েছেন বিশ্বহৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে। কবি নিজের মধ্যে অনুভব করেন—নিকটকে উত্তীর্ণ হবার ও বাণীকে গভীর করার সাধনা, নিত্য হয়ে ওঠার সাধনা। এই হয়ে-ওঠার পরিণামটি কবি বনস্পতির শ্যামল সমারোহের মধ্যে মূর্ত দেখলেন। এই পরিণামই হল সৃষ্টির চরম লক্ষ্য ; 'ভালোবাসি', এই বাণীই সৃষ্টির শাশ্বত বাণী। সংসারের কোলাহলে যখন আচ্ছন্ন হয় চেতনা, তখন কবির ধ্যানে এই বাণীর চিত্ররূপ উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এ জন্মের যত ভাবনা, যত বেদনা,
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলায় একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হোক উদ্ভাসিত—
'ভালোবাসি'। (২৬)

কবির জীবনদর্শন কতো গভীরশায়ী দূরবিস্তারী হতে পারে তার পরিচয় পাই দুটি কবিতায় যেখানে কবি মানুষের অন্তর্নিহিত গূঢ় গোপন সত্তার সক্রিয়তার কথা বলেছেন। দার্শনিক মনন-ঋদ্ধ এ-দুটি কবিতায় (৩৫, ৩৬ সংখ্যক) বলা হয়েছে, বাইরের প্রকাশ মানুষের অন্তরতম পরিচয় নয়। দেহাতীত প্রাণ আভাসে ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত হবার জন্য আকুলতা বোধ করে। কবি অনুভব করেন, ব্যক্ততার নানা অপরিণত রূপ থেকে অব্যক্তের পূর্ণতর সম্ভাবনার দিকে যাত্রা—অন্ধকারের গুহা থেকে আলোকের প্রাঙ্গণে যাত্রা—

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ।
ঊষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ—
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই। (৩৫)

কবি অনুভব করেন, অপরিস্ফুট প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-শিল্পী তাঁর চরম রূপটিকে কবির জীবনে আভাসিত করছেন।

শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণের ভিতরে কবি নির্মাণ করিয়েছিলেন মাটির ঘর 'শ্যামলী', বাস করেছিলেন সে গৃহে। মাটির প্রতি, বাংলার শ্যামল প্রকৃতির প্রতি নিগূঢ় ভালোবাসার স্পষ্ট প্রকাশ এই 'শ্যামলী' গৃহ এবং শেষ সপ্তকের ৪৪ সংখ্যক কবিতা।

এখানে কবির যে সংকল্প উচ্চারিত, তা বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছিল। শ্যামল প্রাণের, সহজ সুন্দরের নিকেতনে কবি বাসা বাঁধবেন, নাম দেবেন 'শ্যামলী'—যার সম্মুখ দিয়ে বহে যাবে সহজের প্রবাহ। এই সংকল্পের অন্তরালে সক্রিয় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির নিবিড় আত্মীয়তাবোধ, যা কবির জীবনদর্শনের ভিত্তির অন্যতম শিলালেখ।

চার

আয়ুর প্রান্তে এসে কবি জীবনের হিসাব-নিকাশ করেছেন চারটি কবিতায়। এই কবিতাগুলিতে শুনতে পাই শেষ সপ্তকের মূর্ছনা, জীবন-বীণার শেষ সুর। একদিকে অতীতের ধূসর স্মৃতি, অন্যদিকে অজানা ভবিষ্যৎ। একদিকে সংসারের সুর, অন্যদিকে সুদূরের ধ্যান। কবির কাছে এই দুই-ই চিরকালের অচেনা। সংসারকে কি সত্যই কোনোদিন অন্তরঙ্গভাবে চিনেছেন? সুদূরকে কি সত্যি সত্য করে জেনেছেন?

এই দুই অচেনার মিলনভূমিতে দাঁড়িয়ে বাউল-মনের বিচিত্র আলাপ এই কবিতাগুলি (৬, ৪৩, ৪৫, ৪৬ সংখ্যক)।

কবি জীবন-গোধূলির ঘাটে উপনীত হয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ করছেন। তিনি শুধু কবি নন, আলোর প্রেমিক, এই তাঁর নিবেদন। 'মনে রেখো'—এই তাঁর বিনীত প্রার্থনা। নেই কোনো ক্ষোভ, তিক্ততা ; পথের শেষে রইল ভালোবাসার স্মারক। তিনি চলে গেলে যে শূন্যতা ঘটবে, কবির নিবেদন—

সেই শূন্যতার কাছে একটা ফুল রেখো,
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো। (৬)

চতুর্সপ্ততিতম জন্মদিবসে রচিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আয়ুর শেষ প্রান্তে পৌছে আপন জীবনকে শান্ত, স্বচ্ছ, সমাহিত দৃষ্টিতে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন (৪৩ সং)। কবি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্দেশে লেখা এই কবিতায় কবি উপস্থিত করেছেন নির্মোহ বিশ্লেষণ :

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা। (৪৩)

জীবনের প্রাণরঙ্গভূমিতে তিনি একদা এসেছিলেন ঘর-বন্দী বালক হয়ে যে অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকত বাগানের দিকে। তারপর সে হয়ে উঠেছিল তরুণ যৌবনের বাউল, যে সুর বেঁধে নিয়েছিল আপন একতারাতে ; একে একে তাতে চড়িয়ে দিল তারের পর নোতুন তার। সেদিন পঁচিশে বৈশাখ কবিকে ডেকে নিয়েছিল তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে। কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে, সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য, গ্লানিভরে নত হয়েছে মন। বিদ্বেষে অনুরাগে, ঈর্ষায় মৈত্রীতে আলোড়িত তপ্ত বাষ্প নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কবির জগৎ আবর্তিত হয়েছে তার কক্ষপথে। কবি আজ উপনীত পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে। ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণে গঠিত যে মূর্তি, তার প্রতি একালের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ক্ষমার মালা কবি স্বীকার করে নিয়ে বর্জন করে যাচ্ছেন সব অহংকার। বিদায়ের পূর্বে একালের কাছে কবির বিনম্র নিবেদন :

যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের পান্টা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়। (৪৩)

আর এক পর্যালোচনামূলক কবিতা প্রমথনাথ চৌধুরীর উদ্দেশে রচিত। কী শান্ত মোহমুক্ত সমাহিত পর্যালোচনা! নূতনের স্রোতে ভেসে কবি আজ মনের প্রান্তসীমায় উপনীত। পর্যাপ্ত তারুণ্য আর ভরা যৌবনের দিন কবি পেরিয়ে এসেছেন আয়ুর সীমান্তদেশে। তাঁর মনে হয়েছে, এখন যৌবনের বেগ আরও প্রবলতর—দূর সমুদ্রের তরঙ্গ-মন্দ্রিত এক মোহনার মুখ। যৌবন এখানে আনন্দ-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে দুর্বার। দূর-সমুদ্রকে পটভূমি রূপে পিছনে রেখে কবি আজ সংসারের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছেন সংসারকে, শেষবারের মতো সম্বোধন করে যাচ্ছেন জীবনকে—

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা। (৪৫)

মৃত্যুতে জীবনের ছেদ, নব অধ্যায়। জীবনের সমগ্রকে তিনি অনুভব করেছেন। একটি আধখানা ফেলে-আসা জীবন, বাকি আধখানা সামনের অজানা জীবন। কবি উপলব্ধি করেছেন জীবনের সামগ্রিক রূপ, তাই বলতে পেরেছেন শান্তকণ্ঠে,—

দুই দিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা—
তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব,
'দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালো বেসেছি।' (৪৫)

শেষ সপ্তকের শেষ কবিতা একই সুরে জীবনের সামগ্রিক পর্যালোচনা। এটি আত্মোপলব্ধির কবিতা, আত্ম-উদ্ভাসনের কবিতা। কবির গোটা জীবনের মর্মবাণী এখানে ব্যক্ত। তা আত্মোপলব্ধির সুরে ধ্বনিত। প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগ অনায়াসলব্ধ। একদিন কর্মচাপে ছিন্ন হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক। বিদায়ের পূর্বে কবি তাকে ফিরে চান। প্রকৃতির কোলে কবি আপন স্বাতন্ত্র্যকে খোঁজ করতে চান।

শেষ সপ্তক কাব্য বন্ধনমোচনের কাব্য, মুক্তিসাধনার কাব্য। শেষ কবিতায় তা আরো স্পষ্ট। সাংসারিক পরিচয় ও ব্যক্তিপরিচয় থেকে কবি নিয়েছেন মুক্তি। প্রয়োজনের শিকল থেকে মুক্তি। সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি।

কবি জানিয়েছেন, তাঁর আত্মস্বরূপে ও দীর্ঘ জীবনে বারবার আঁবরণ পড়েছে। সেই আবরণ সরাতে সরাতে কবি অনুভব করছেন, পাওয়া হল না, হওয়া হল না— যেতে হবে, আরও দূরে, আরও গভীরে যেতে হবে। এই হয়ে-ওঠার আনন্দগান বাজাতে গিয়ে বীণায় কেবলই সপ্তকের তার বদল হচ্ছে। শেষের সপ্তকে যে শেষ কাঁপন জাগল—যার পরে আর শব্দরাজ্যের অধিকার নেই—যার পরে নৈঃশব্দের স্পর্শে বীণা হয় স্তম্ভিত, সেই কাঁপনে সুর মিলিয়ে কবি বললেন,—

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এপারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকায় মাল নেব না কিছুই,
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে। (৪৬)

পাঁচ

শেষ সপ্তকের অপর এক শ্রেণীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দুরধিগম্য মানবসত্তার স্বরূপ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। কেবল মননঋদ্ধ কবিতা বলে নয়, বিশ্বজীবন-অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ কবিতা বলেও এইসব কবিতা (৯, ১২, ১৯) বিশ্বকাব্যসংসারে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, একথা কোনো অত্যুক্তি না করেই বলা যায়। দুনিয়ার আর কোনো ভাষায় এ ধরনের কবিতা বিরলদৃষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চুয়াত্তরে

উপনীত কবির মননসামর্থ্য ও শিল্পসামর্থ্য জরার অভিশাপকে তুচ্ছ করে আপন জয়-পতাকা উড়িয়েছে, শেষ সপ্তক কাব্য সম্পর্কে একথা বলা যায়। সেই গৌরবের প্রধান অংশীদারদের মধ্যে আছে এই তিনটি কবিতা।

মানুষ কি কখনো তার আপন সত্তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারে, এই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন এই তিন কবিতায় উচ্চারিত। কবির উত্তর, না। মানবসত্তা দুরধিগম্য। তার বেশির ভাগটাই থাকে অজানা।

এই প্রশ্ন নিয়েই আলোড়িত হয়েছে বারো সংখ্যক কবিতা। কবির উপলব্ধি,—মানুষের আসল সত্তা দুরধিগম্য, বাস্তবে তার পরিচয় ধরা পড়ে না। সংসারের ছাপ-মারা কাঠামোর মধ্যে, সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে সাধারণের চিহ্ন ললাটে ধারণ করে বাঁধা-মাইনের কাজ করে মানুষ। হঠাৎই একদিন ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে, সীমার আড়াল উড়ে যায়, বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা। 'কেউ চেনা নয়, / সব মানুষই অজানা। / চলেছে আপনার রহস্যে / আপনি একাকী। / সেখানে তার দোসর নেই।' (১২)

বাইরের আচার-ব্যবহারে চেনা-জানায় মানুষকে আমরা সঠিক জানি না। বাইরের রূপটা ছদ্মবেশ। আড়ালে থাকে আসল মানুষ। 'সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের মালখানা'। (১৯)। যথার্থ প্রেম ঘোচাতে পারে এই ছদ্মবেশ। কিন্তু তাও দুর্লভ।

নয় সংখ্যক কবিতা দুরধিগম্য মানবসত্তার স্বরূপ আবিষ্কার-প্রয়াসী কবিতা। প্রখর মনন ও গভীর চিন্তা এখানে বাণীরূপ পেয়েছে। দার্শনিক চিন্তাশৃঙ্খলা এখানে কোথাও ভঙ্গ হয় নি, তাকে বজায় রেখেই কাব্য-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন কবি। দর্শনচিন্তা কাব্যলাবণ্যের হানি ঘটায় নি। মানুষ সহস্র প্রয়াস করলেও কি তার আপন সত্তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারে? এই মৌল প্রশ্নের দ্বারা প্রাণিত নয় সংখ্যক কবিতাটি। মানবসত্তা দুরধিগম্য। ভাসমান হিমানীর মতো তার বেশির ভাগটাই থাকে অজানা: এই বক্তব্য এ কবিতায় বাণীরূপ পেয়েছে। দর্শনচিন্তা ও কাব্যরূপ, একের খাতিরে অপরকে বিসর্জন না দিয়ে নির্মিত হয়েছে এ কবিতা।

মানবসত্তা দুরধিগম্য: এই বক্তব্য সূচনায় ব্যক্ত। 'সবটার নাগাল পাব কেমন করে? / ও যে একটা মহাদেশ, / সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন। / ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে / নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়। / তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়, / তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।'

কবি এখানে নিজেকে দেখলেন। দেখলেন তার আপন সত্তাকে। প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি (ডিট্যাচ্‌মেণ্ট) রক্ষা করে নিজেকে দেখার ও বিশ্লেষণের দুরূহ সাধনায় প্রৌঢ় কবির মনন-সামর্থ্য আমাদের অবাক করে।

মানবসত্তা দুরধিগম্য : এই সত্যকে কবি সামান্য আয়োজনে—ছয়টি চরণে—তিনটি বাক্‌প্রতিমার মাধ্যমে—উপস্থিত করেন। সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন মহাদেশ, মেঘাবৃত গিরিশৃঙ্গ, আঁধারাবৃত গহ্বর—এই তিনটি বাক্‌প্রতিমা মানবসত্তার নিঃসঙ্গতা ও দুরধিগম্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এখানে কবির 'আমি' সংসারের স্রোত পার-হয়ে-আসা 'আমি'। শিল্প-নিরাসক্তি বজায় রেখে দেখা দিয়েছে এই 'আমি'। মন এ-'আমির' সবটা ধারণা করতে পারে না। কবির গভীর মনন মনের ধারণা-সামর্থ্যকে ছাপিয়ে বহুদূর চলে যায়। এই দুরধিগম্য মানবসত্তার বেশির ভাগটাই যে আজো রয়ে গেছে অজানা, সেই সত্য পর-মুহূর্তে কবি শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : 'যাকে বলতে পারি আমার সবটা, / তার নাম দেওয়া হয় নি, / তার নক্‌শা শেষ হবে কবে ! /····· নামটা রয়েছে যে পরিচয়টুকু নিয়ে / টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ / অনাবিষ্কৃতের-প্রান্ত-থেকে-সংগ্রহ-করা।'

কেবল আমাদের পরিচিত সংসারের স্রোত পেরিয়ে-যাওয়া নয়, মনন-আমির সীমা পেরিয়ে যাওয়া এই দুরধিগম্য মানবসত্তাকে কবি অনুভব করেন মনোলোকের ওপার থেকে। এ এক দুরূহ মনন-সামর্থ্য। এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কবি যখন মানব-সত্তাকে অনুভব করেন, তখন তার সামনে ফুটে উঠল জীবনের একটা ছবি, যাতে নেই কোনো বস্তু-বর্ণনা, নেই কোনো স্পষ্ট আকৃতি। এ হ'ল একান্তভাবে কবির অন্তর্দর্শন, 'ইনার ভিশ্যন'। এখানেই কবির জিত্—এখানেই তাঁর স্বকীয়তা, চিন্তা ও মননের প্রখর মৌলিকতা। জীবনের কোনো বস্তুবর্ণনা নয়, এ এক নব-উপলব্ধির জগৎ। তা বস্তু থেকে সত্যতর—জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে দেখা দিয়েছে এই জগৎ—তা প্রচলিত অর্থে ব্যক্তিজগৎ নয়। বস্তুপুঞ্জ ছেঁকে সারকে নিয়েছেন কবি, বিশেষ থেকে অনায়াসে উত্তীর্ণ নির্বিশেষে। বস্তু থেকে নির্বস্তুতে তাঁর স্বচ্ছন্দ উত্তরণ।

চার দিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে—
চিত্তভূমিতে, ;
হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁওয়া—
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল।
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে।

জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি। (৯)

কবির মনন-সামর্থ্য ও শিল্প-সামর্থ্যের সার্থক প্রকাশ এই কবিতাংশ। এখানে কবি এঁকেছেন একটি ছবি, যা অনন্যসাধারণ, যা বিশিষ্ট। বাক-প্রতিমাগুলিও বিশিষ্ট। 'সাত সমুদ্র বিচ্ছিন্ন' 'ও যে একটা মহাদেশ'। জীবনের রঙ্গভূমিকে কবির মনে হচ্ছে মহাসমুদ্রের বুক থেকে দেখা অতি-দূরের দ্বীপের মতো। এখানে বিশেষ নয়, নির্বিশেষও নয়, সাদা-কালো মিলিয়ে একটা আলোকিত রূপ। ব্যর্থ ও সার্থক কামনার আলো ছায়ায় ভরা আকাশ—সেখান থেকে চিত্তভূমিতে নামে নানা বেদনার রঙিন ছায়া। হাওয়ায় লাগে শীত বসন্তের ছোঁয়া। এ সবই যেন দেখা যায় মহাসমুদ্রের বুকে দূরতর দ্বীপের ছবির মতো। অস্পষ্ট, আভাসমাত্র। যে দূরত্বে দাঁড়ালে এই অস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে, ছবি-আঁকার কৌশলে ও ছবির বৈশিষ্ট্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে সেই দূরত্ব। 'নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে চিত্তভূমিতে'। তা রঙিন ছায়া মাত্র। কবি ইঙ্গিত করেছেন, চিত্তভূমিতে বিলসিত এইসব রূপ জীবনের সব পরিচয় নয়, তাকে ছাড়িয়ে আছে চেতনার নিগূঢ় পরিচয়। তা কোথায়? দূর সমুদ্রের বিস্তারের মধ্যে অদৃশ্য কালো ঢেউয়ের অন্তরালে চেতনার অপ্রকাশিত নিগূঢ় পরিচয় আছে। চিত্তভূমিতে যা দেখা দিয়েছে, তা জলমগ্ন হিমানীর অংশমাত্র। যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আছে অপরিণতি, অপরিস্ফুটতা, অনেক অপ্রকাশ। এই বক্তব্য পরবর্তী অংশে শিল্প-রূপায়িত :

সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস;
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ;
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

কবি শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন :

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি—
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে। (৯)

কবিতা-সূচনায় কবির প্রশ্ন ছিল : মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও কি তার আপন সত্তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারে? এখন কবির প্রশ্ন : এই অপ্রকাশিত মানবসত্তা কার জন্যে, কিসের জন্যে? সৃষ্টির অমোঘ সত্য কবি পরমুহূর্তে উচ্চারণ করেছেন :

এই সব অপরিণতি—
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে—
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি। (৯)

যিনি গুণী তিনি কাজ করেন অপ্রকাশের পর্দা টেনে, যিনি শিল্পী তিনি আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে। একথা কেবল মানব-শিল্পী সম্পর্কে সত্য নয়, জগৎ-শিল্পী সম্পর্কেও সত্য। বিশ্বস্রষ্টার শিল্পরহস্যের 'কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, / নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।'

কবি এ কবিতায়—এবং এই কাব্যে—নিজেকে বলেছেন আলোর প্রেমিক, আবার বলেছেন অন্ধকারের সাধক। প্রথম অভিধাটি বুঝতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়টি অনুধাবনযোগ্য। কবির উক্তি :

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে। (৮)

নাম, রূপ ও মিলের বন্ধনমোচনের কথা কবি স্পষ্ট করেছেন পূর্ববর্তী (৮ সংখ্যক) কবিতায়। তাঁর প্রার্থনা : 'জীবনের অল্প কয়দিনে বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ / দিক আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি।' কবি উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন অন্ধকারে। বিশ্বব্যাপী নির্মল আনন্দের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য-চেতনাকেই শিল্পের ভাষায় কবি বলেছেন 'অন্ধকার'।

নয় সংখ্যক কবিতার শেষ স্তবকে কবি তাঁর মূল প্রশ্নে ফিরে এসেছেন : মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও কি তার আপন সত্তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারে? কবির উত্তর :

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরই হাতে,
কারও চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি।
সবাই রইল দূরে—
যারা বললে 'জানি' তারা জানল না। (৯)

মানবসত্তাকে কি পূর্ণরূপে জানা যায়? কবির নিবেদন, সবটা কোনোদিন জানা যায় না, যাবে না, বোঝা যায় না, যাবে না। মানবসত্তা দুরধিগম্য, 'অপ্রাপ্য, অচেনা'। দূরে দাঁড়ালে, অন্ধকারে অবগাহন করলে এই প্রকাশের লীলাটুকুর মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টার শিল্পরহস্যের তাৎপর্য অনুভব করা যায়। কবি আলোর প্রেমিক, অন্ধকারের সাধক। তিনি বৈরাগ্যের পথিক। মনের অতীতে সেই বৈরাগ্য-ভূমিতে, সেই অন্ধকারের অন্তরে অবগাহন করে কবি আপন সত্তাকে এ কবিতায় অনুভব করতে চেয়েছেন। চিত্তভূমিতে যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আছে অনেক অপরিস্ফুটতা, অনেক অপরিণতি। চিত্তভূমিতে বিলসিত রূপগুলিই জীবনের সব পরিচয় নয়। তাকে ছাড়িয়ে—চেতনার সীমান্ত পেরিয়ে—দূর সমুদ্রের বিস্তারের মধ্যে অদৃশ্য কালো ঢেউয়ের অন্তরালে রয়েছে চেতনার অপ্রকাশিত নিগূঢ় পরিচয়। অন্ধকারে—বিশ্বব্যাপী নির্মল আনন্দের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য-চেতনার অন্ধকারে—অবগাহন করে কবি প্রকাশের লীলাটুকুর মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার অপ্রকাশিত শিল্পরহস্যের তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন।

প্রখর মনন, বিশ্বব্যাপী কল্পনা আর গভীর উপলব্ধির যোগে রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় (৯নং) মানবজীবনের একটি মৌল বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। মানবসত্তার পরিচয়-লাভের প্রয়াস ও তার ব্যর্থতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কাব্য ও দর্শনচিন্তা, একের খাতিরে অপরকে লঘু না করে এই প্রজ্ঞা-উদ্ভাসিত বাণী প্রতিমা-নির্মাণে সাফল্য লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সাফল্য দুরূহ এবং বিরল সাফল্য।

যিনি কবি, যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁকে কি কখনোই সম্পূর্ণ জানা যায়, চেনা যায়? তিনি নিজেই অসম্পূর্ণ ব'লে তাঁর কোনো শেষের কবিতা নেই আমাদের অভিজ্ঞতায়। তাঁর সৃষ্টি সেই ভাসমান হিমানীর মতো—যার বেশির ভাগই আমাদের অজানা। তবু এই অজানা, এই অপ্রকাশের আনন্দ যে আমাদের চৈতন্যের মূল ধরে টান দেয়, তার সার্থক দৃষ্টান্ত শেষ সপ্তক কাব্য।

শেষ

২২

কবিজীবনের উল্লেখযোগ্য তথ্যপঞ্জী

১৮৬১—৭ই মে (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮) সোমবার শেষরাত্রে কলকাতার জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। জননী সারদাদেবী।

১৮৬৮—প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র। পরিবারে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত কাদম্বরী দেবীর বিবাহ।

১৮৬৯—বিচ্ছিন্ন কবিতাচর্চার চেষ্টা।

১৮৭০—নর্মালস্কুলে একবৎসর পাঠ, গৃহে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা।

১৮৭১—বেঙ্গল একাডেমি নামক ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ কিন্তু বিদ্যালয়পাঠে অমনোযোগ।

১৮৭২—কলিকাতায় ডেংগুজ্বরের প্রকোপ হওয়ায় কিছুকাল নগরের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে আত্মীয়স্বজনের সহিত বাস এবং প্রকৃতির সহিত প্রথম স্বাধীন পরিচয়।

১৮৭৩—উপনয়ন, পিতার সহিত উত্তরভারত ও হিমালয় ভ্রমণ, প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় বিদ্যালয় গমন।

১৮৭৪—সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে কিছুকালের জন্য অধ্যয়ন ও পরে পুনরায় নানাভাবে গৃহশিক্ষার আয়োজন; অনুবাদচর্চা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ।

১৮৭৫—হিন্দুমেলায় কবিতাপাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশ। জননীর মৃত্যু। নিয়মিত কবিতা রচনা ও গীতরচনা, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বনফুল কাব্য প্রকাশ।

১৮৭৬—স্কুলে যাত্রা বন্ধ। পত্রিকায়, কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি একাধিক রচনা প্রকাশ।

১৮৭৭—স্বদেশ-প্রেমাত্মক কিছু কিছু গান ও কবিতা রচনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের জন্য গীতরচনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ। ভারতী পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ, প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা।

১৮৭৮—কবিকাহিনী রচনা। বিলাত যাইবার পূর্বে আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাস, আন্না তরখড়ের সহিত পরিচয়। বিলাতযাত্রা, ব্রাইটনের স্কুলে প্রবেশ।

১৮৭৯—লণ্ডনে পড়াশুনা ও নানাস্থানে বাস, কয়েকটি রচনা এবং ধারাবাহিকভাবে বিলাতবাস সম্বন্ধে পত্রপ্রেরণ, ভারতীতে প্রকাশ।

১৮৮০—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও নানা সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ।

১৮৮১—বাল্মীকিপ্রতিভা ও রচনা অভিনয়। আরও কিছু কিছু কাব্য, কাব্য-নাট্য ও গদ্যরচনা। বিলাতযাত্রার পুনরায়োজন ও যাত্রা, কিন্তু মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবর্তন। কিছুদিন চন্দননগরে বাস।

১৮৮২—বৌঠাকুরানীর হাট ও সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের কবিতাবলী রচনা, কালমৃগয়া রচনা ও অভিনয়। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক কবিকে প্রশস্তি-জ্ঞাপন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা, কিছুকাল দার্জিলিঙে বাস।

১৮৮৩—সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাইসন্নিকট কারোয়ার শহরে কিছুকাল অবস্থান, প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনা। ছবি ও গানের পর্ব। মৃণালিনী দেবীর সহিত কবির বিবাহ।

১৮৮৪—কড়ি ও কোমলের কবিতা রচনার পর্ব, নানা ধরনের গীতরচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় মৃত্যু (১৯ এপ্রিল, ৮ বৈশাখ ১২৯১), কবির গভীর শোকবেদনা। তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৮৫—সারস্বতকৃত্যে প্রবলতা, ব্রহ্মসংগীত রচনা, রামমোহন রায় সম্বন্ধে সিটি কলেজ সভায় অভিভাষণ। বালক পত্রিকার দায়িত্বগ্রহণ ও মুকুট, রাজর্ষি প্রভৃতি শিশুসাহিত্য রচনা। কিছুকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান।

১৮৮৬—গীতরচনায় সমান আগ্রহ; জাতীয় কংগ্রেসে স্বকণ্ঠে সংগীত পরিবেশন, প্রথমা কন্যা মাধুরীলতার জন্ম।

১৮৮৭—মায়ার খেলা ও মানসী কাব্যপর্বের সূচনা। সমকালীন সামাজিক কোনো ব্যাপার লইয়া চন্দ্রনাথ বসুর সহিত কবির প্রবল মতবিরোধ।

১৮৮৮—সপরিবারে কিছুকাল গাজিপুরে বাস। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৯—বোম্বাই পুণা ও শোলাপুরে কিছুকাল অবস্থান ও রাজা ও রানী রচনা। শিলাইদহ পদ্মাতীরে কিছুকাল বাস।

১৮৯০—শিলাইদহ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সাময়িকভাবে বাস, শেষের দিকে একমাসের জন্য লণ্ডন গমন।

১৮৯১—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের উপর স্থায়ী ভাবে জমিদারি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ। পদ্মাতীরে ধারাবাহিকভাবে বাসকালে ছোটগল্প ও কবিতার সৃষ্টি।

১৮৯৪—কয়েকমাসের জন্য সাধনা পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ।

১৮৯৬—জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ অধিবেশনে কবি কর্তৃক বন্দেমাতরম্ গান।

১৮৯৮—সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে গৃহাত সরকাবী সিডিশন বিলের প্রতিবাদে টাউন হলে কণ্ঠরোধ প্রবন্ধ পাঠ।

১৯০১—নবপর্যায় বঙ্গদর্শনেব সম্পাদকভার গ্রহণ।

১৯০২—কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৩—মধ্যমকন্যা রেণুকার মৃত্যু।

১৯০৫—পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেব মৃত্যু। কবি-কর্তৃক ভাণ্ডাব পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ ও রাজনৈতিক আলোচনা, স্বদেশী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, কবিব স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশী সংগীতরচনা। ১৬ অক্টোবর কার্জন-কর্তৃক বঙ্গচ্ছেদ ও সেই উপলক্ষে রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তম এবং বিপুল উদ্দীপনা।

১৯০৭—কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু।

১৯০৮—বাঙলা দেশের চারিদিকে জাতীয় উত্তেজনা ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ, গুপ্ত বিপ্লবীদের নানাবিধ প্রচেষ্টা, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব। শান্তিনিকেতনে গঠনমূলক কর্মে কবির আত্মনিয়োগ।

১৯১০—গীতাঞ্জলির সংগীতরচনাব পর্ব, শান্তিনিকেতনে খ্রীস্ট জন্মোৎসব উদ্‌যাপন।

১৯১১—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকপদ গ্রহণ, শান্তিনিকেতনে কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। সম্রাট ৫ম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার। এই বৎসরই কলিকাতায় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গান গীত হয়।

১৯১২—গীতাঞ্জলি-পর্বের গান ও কবিতার ইংরাজি তর্জমা, ১৬ই জুন বিলাত গমন এবং ইয়েট্‌স্ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয়, ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্য সর্বত্র কবির সমাদর। রাজা ও ডাকঘরের ইংরাজি অনুবাদ। ইয়েট্‌সের ভূমিকাসহ ইংরাজি গীতাঞ্জলির গ্রন্থাকারে প্রকাশ। লণ্ডন হইতে কবির মার্কিন দেশে যাত্রা।

১৯১৩—১৩ই নভেম্বর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ, ডিসেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট্ উপাধি প্রদান।

১৯১৪—প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও কবির আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া সবুজ পত্রের প্রকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স্ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সহিত শান্তিনিকেতনের সংযোগ। বলাকার যুগ আরম্ভ।

১৯১৫—গান্ধীজীর প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন। সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে স্যার উপাধি প্রদান।

১৯১৬—জাপান ও মার্কিন মুলুকে ভ্রমণ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯১৮—জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু। বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তিস্থাপন।

১৯১৯—দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত মতবিরোধ, জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজ সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি বর্জন করিয়া লর্ড চেম্স্ফোর্ডের নিকট খোলা চিঠি প্রেরণ।

১৯২০—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে সফর, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কবির স্যার উপাধি ত্যাগের ঘটনায় ইংলণ্ডের সুধীসমাজে কবির প্রতি নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা। আমেরিকা যাত্রা।

১৯২১—পুনরায় ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ, জনসংযোগ, বক্তৃতা, মনীষীদের সহিত আলাপ-পরিচয়, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ।

১৯২২—দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফর।

১৯২৩—পশ্চিম ভারত, আসাম প্রভৃতি ভারতের আরও নানা স্থানে ক্রমাগত পর্যটন। সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার আন্দোলন।

১৯২৪—চীন যাত্রা, চীনে বিপুল কবিসম্বর্ধনা। জাপান ভ্রমণ। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় পেরুর পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থতার জন্য কিছু কাল অবস্থান, রাজধানী বুয়েনস এয়ারিসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ।

১৯২৫—ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং গান্ধীজীর চরকা ও খদ্দরনীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ।

১৯২৬—পুনরায় ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, চেক, অষ্ট্রিয়া, হাংগেরি প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভ্রমণ বক্তৃতা, বিচ্ছিন্ন সাহিত্যসৃষ্টি ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ।

১৯২৭—পশ্চিম ভারত, আসাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বালী, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চলে সফর। কবির চিত্রাঙ্কন-প্রয়াস।

১৯২৯—কানাডা ও জাপান সফর।

১৯৩০—উত্তর ও পশ্চিম ভারত সফর, বিলাতের পথে ফরাসী দেশে। প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির হিবার্ট বক্তৃতা, বিষয় 'মানুষের ধর্ম'। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ ও কবির বিস্ময়। ইউরোপ ঘুরিয়া আমেরিকা আগমন। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কবির চিত্রপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন মনীষীর সহিত সাক্ষাৎকার।

১৯৩১—লণ্ডনে বার্নার্ড শ-র সহিত দীর্ঘ আলোচনা। ভারতে প্রত্যাবর্তন। হিজলী বন্দীনিবাসে বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পীড়িত শরীরেও মনুমেণ্টের জনসভায় যোগদান ও শাসকবর্গের প্রতি কবির ধিক্কার। টাউন হলে কবিসম্বর্ধনার সপ্তাহব্যাপী আয়োজন।

১৯৩২—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থায় উদ্বেগ। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য নিষ্ঠুর দুঃশাসনের প্রতি কবির বিদ্রূপ ও ক্ষোভ কবিতায় সঞ্চারিত। পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। বাস্তবধর্মী আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কবির আগ্রহ, গদ্যছন্দে কাব্যরচনার উদ্যম। জার্মানীতে দৌহিত্র নীতীন্দ্রের মৃত্যু। গান্ধীজীর অনশনের সংবাদে পুণায় কারাগারে গিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ।

১৯৩৩—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম'-বিষয়ক কমলা-বক্তৃতামালা। বোম্বাইয়ে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবিকে সম্বর্ধনা প্রদান। অন্ধ্র ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ, বহুবিধ কর্মে ব্যস্ততা।

১৯৩৪—পুনরায় সিংহল যাত্রা এবং মাসাধিককাল পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, মাদ্রাজে নানাস্থানে বক্তৃতা ও গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা।

১৯৩৫—বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডক্টর উপাধি প্রদান, এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট ভাষণ, লাহোর লখ্‌নৌ হইয়া প্রত্যাবর্তন। শান্তিনিকেতনে শ্যামলী নামক নবনির্মিত মৃন্ময় গৃহে কবির বাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবিসম্বর্ধনা।

১৯৩৬—চিত্রাঙ্গদা অভিনয়গোষ্ঠী লইয়া অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতের নানা স্থানে সফর। দিল্লি পৌরসভা কর্তৃক কবিসম্বর্ধনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডক্টর উপাধিদান।

১৯৩৭—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাঙলায় ভাষণপ্রদান। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতিপদ গ্রহণ। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি ও আলমোড়ায় বিশ্রামগ্রহণ। আন্দামানের রাজবন্দীদের উপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব। উত্তরায়ণে আকস্মিক অসুস্থতা ও কয়েক দিনের জন্য সংজ্ঞালোপ।

১৯৩৮—বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা। বেশ কিছুদিন মংপুতে বিশ্রাম গ্রহণ। ইউরোপ ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমবর্ধমান যুদ্ধায়োজনে কবির উদ্বেগ।

১৯৩৯—পুরীভ্রমণ। মংপুতে গ্রীষ্মযাপন। সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন।

১৯৪০—শান্তিকুঞ্জে গান্ধীজীর সম্বর্ধনা, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডক্টর উপাধিদান। কবির জীবৎকালে শান্তিনিকেতনে শেষ বর্ষা-উৎসব। কালিম্‌পঙে থাকাকালীন গুরুতর পীড়া ও অসুস্থ কবিকে কলিকাতায় আনয়ন, দুই মাস পীড়ার পর শান্তিনিকেতন প্রত্যাবর্তন।

১৯৪১—নববর্ষ উৎসবে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ রচনা। ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ভারতভাস্কর উপাধি প্রদান। শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং কলিকাতায় আনয়ন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮, ইংরাজি ৭ আগস্ট দ্বিপ্রহরে জোড়াসাঁকোয় কবির জীবনাবসান।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী হইতে এই ঘটনাবলীর তালিকা প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৩

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

১৮৭৮—১৯১৯

কবিকাহিনী—প্রথম মুদ্রিত আখ্যানকাব্য ১৮৭৮ (১২৮৫)
বনফুল—আখ্যানকাব্য ১৮৮০ (১২৮৬)
বাল্মীকি-প্রতিভা—গীতিনাট্য ১৮৮১ (১২৮৭)
রুদ্রচণ্ড—আখ্যানকাব্য ১৮৮১ (১২৮৭)
ভগ্নহৃদয়—নাট্যকাব্য ১৮৮১ (১২৮৮)
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র— ১৮৮১ (১২৮৮)
সন্ধ্যাসংগীত—কাব্য ১৮৮২ (১২৮৮)
কালমৃগয়া—গীতিনাট্য ১৮৮২ (১২৮৯)
বউঠাকুরানীর হাট—উপন্যাস ১৮৮৩ (১২৯০)
প্রভাতসংগীত—কাব্য ১৮৮৩ (১২৯০)
বিবিধ প্রসঙ্গ—প্রবন্ধ ১৮৮৩-৮৪ (১২৯০)
ছবি ও গান—কাব্য ১৮৮৪ (১২৯০)
প্রকৃতির প্রতিশোধ—নাট্যকাব্য ১৮৮৪ (১২৯১)
নলিনী—গদ্যনাট্য ১৮৮৪ (১২৯১)
শৈশবসংগীত—কাব্য ১৮৮৪ (১২৯১)
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—১৮৮৪ (১২৯১)
আলোচনা—প্রবন্ধ ১৮৮৫ (১২৯২)
রবিচ্ছায়া—সংগীত-সংকলন ১৮৮৫ (১২৯২)
কড়ি ও কোমল—কাব্য ১৮৮৬ (১২৯৩)
রাজর্ষি—উপন্যাস ১৮৮৭ (১২৯৩)
চিঠিপত্র—পত্রাকারে প্রবন্ধ ১৮৮৭ (১২৯৪)
সমালোচনা—প্রবন্ধ ১৮৮৮ (১২৯৪)
মায়ার খেলা—গীতিনাট্য ১৮৮৮ (১২৯৪)
রাজা ও রানী—নাট্যকাব্য ১৮৮৯ (১২৯৬)
বিসর্জন—নাট্যকাব্য ১৮৯০ (১২৯৭)
মন্ত্রি-অভিষেক—প্রবন্ধ ১৮৯০ (১২৯৭)
মানসী—কাব্য ১৮৯০ (১২৯৭)

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ১ম—ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯১ (১২৯৮)
চিত্রাঙ্গদা—নাট্যকাব্য ১৮৯২ (১২৯৯)
গোড়ায় গলদ—প্রহসন ১৮৯২ (১২৯৯)
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ২য়—ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯৩ (১৩০০)
বিদায়-অভিশাপ—নাট্যকাব্য ১৮৯৪ (১৩০০)
সোনার তরী—কাব্য ১৮৯৪ (১৩০০)
ছোটগল্প
বিচিত্রগল্প
কথা-চতুষ্টয়
গল্পদশক
} —ছোটগল্প-সংকলন ১৮৯৩-৯৬ (১৩০০-১৩০২)
চিত্রা—কাব্য ১৮৯৬ (১৩০২)
চৈতালি—কাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩)
মালিনী—নাট্যকাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩)
বৈকুণ্ঠের খাতা—প্রহসন ১৮৯৭ (১৩০৩)
পঞ্চভূত—প্রবন্ধ ১৮৯৭ (১৩০৪)
কণিকা—ক্ষুদ্র কবিতা ১৮৯৯ (১৩০৬)
কথা
কাহিনী
} —কাব্য ১৯০০ (১৩০৬)
উপনিষদ ব্রহ্ম—প্রবন্ধ ১৯০০ (১৩০৭)
কল্পনা—কাব্য ১৯০০ (১৩০৭)
ক্ষণিকা—কাব্য ১৯০০ (১৩০৭)
গল্পগুচ্ছ—ছোটগল্প-সংকলন ১৯০০—০১ (১৩০৭)
ব্রহ্মমন্ত্র—প্রবন্ধ ১৯০১ (১৩০৮)
নৈবেদ্য—কাব্য ১৯০১ (১৩০৮)
স্মরণ—কাব্য ১৯০২ (১৩০৯)
চোখের বালি—উপন্যাস ১৯০৩ (১৩০৯)
আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ—প্রবন্ধ ১৯০৫-০৬ (১৩১২)
স্বদেশ—কাব্য ১৯০৫-০৬ (১৩১২)
বাউল—গান ১৯০৫-০৬ (১৩১২)
খেয়া—কাব্য ১৯০৬ (১৩১৩)
নৌকাডুবি—উপন্যাস ১৯০৬ (১৩১৩)

বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীনসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, এবং আধুনিক সাহিত্য—প্রবন্ধ ১৯০৭ (১৩১৪)

হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক—প্রহসন ১৯০৭ (১৩১৪)

প্রজাপতির নির্বন্ধ—উপন্যাস ১৯০৮ (১৩১৪)

রাজাপ্রজা, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব ও ধর্ম—প্রবন্ধ ১৯০৮-০৯ (১৩১৫)

কথা ও কাহিনী—কাব্য ১৯০৮-০৯ (১৩১৫)

মুকুট ও শারদোৎসব—নাটক ১৯০৮ (১৩১৫)

শান্তিনিকেতন ১ম-৩য়, বিদ্যাসাগর চরিত্র—প্রবন্ধ ১৯০৯-১০ (১৩১৬)

প্রায়শ্চিত্ত—নাটক ১৯০৯ (১৩১৬)

চয়নিকা—কাব্যসংকলন ১৯০৯-১০ (১৩১৬)

শিশু—কাব্য ১৯০৯ (১৩১৬)

গোরা—উপন্যাস ১৯১০ (১৩১৬)

গীতাঞ্জলি—কাব্য ১৯১০-১১ (১৩১৭)

রাজা—নাটক ১৯১০ (১৩১৭)

শান্তিনিকেতন ৪র্থ-১০ম—প্রবন্ধ ১৯১০ (১৩১৭)

আটটি গল্প ও গল্প-চারিটি—ছোটগল্প-সংকলন ১৯১১-১২ (১৩১৮)

ডাকঘর—নাটক ১৯১২ (১৩১৮)

জীবনস্মৃতি—আত্মস্মৃতি ১৯১২ (১৩১৯)

ছিন্নপত্র—পত্রসাহিত্য ১৯১২ (১৩১৯)

অচলায়তন—নাটক ১৯১২ (১৩১৯)

উৎসর্গ—কাব্য ১৯১৪ (১৩২১)

গীতিমাল্য ও গীতালি—কাব্য ১৯১৪ (১৩২১)

শান্তিনিকেতন—প্রবন্ধভাষণ ১০১৫-১৬ (১৩২২)

ফাল্গুনী—নাটক ১৯১৬ (১৩২২)

ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গ—উপন্যাস ১৯১৬ (১৩২৩)

সঞ্চয় ও পরিচয়—প্রবন্ধ ১৯১৬ (১৩২৩)

বলাকা—কাব্য ১৯১৬ (১৩২৩)

গল্পসপ্তক—ছোটগল্প-সংকলন ১৯১৬ (১৩২৩)

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—প্রবন্ধ ১৯১৭ (১৩২৪)

গুরু—নাটক ১৯১৮ (১৩২৪)

পলাতকা—কাব্য ১৯১৮ (১৩২৫)
জাপান-যাত্রী—ভ্রমণ ১৯১৯ (১৩২৬)
অরূপরতন—নাটক ১৯২০ (১৯২৬)
ঋণশোধ—নাটক ১৯২১ (১৩২৮)
মুক্তধারা—নাটক ১৯২২-২৩ (১৩২৯)
লিপিকা—গদ্যকথিকা ১৯২২ (১৩২৯)
শিশু ভোলানাথ—কাব্য ১৯২২ (১৩২৯)
বসন্ত—গীতিনাট্য ১৯২৩ (১৩২৯)
পূরবী—কাব্য ১৯২৫ (১৩৩২)
গৃহপ্রবেশ—নাটক ১৯২৫ (১৩৩২)
প্রবাহিণী—গানের সংকলন ১৯২৫-২৬ (১৩৩২)
চিরকুমার সভা—নাটক ১৯২৬ (১৩৩২)
শেষবর্ষণ—গীতিনাট্য ১৯২৬ (১৩৩৩)
রক্তকরবী, শোধবোধ ও নটীর পূজা—নাটক ১৯২৬ (১৩৩৩)
লেখন—ক্ষুদ্র কবিতা ১৯২৭ (১৩৩৪)
নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা—গীতিনাট্য ১৯২৭ (১৩৩৪)
শেষরক্ষা—প্রহসন ১৯২৮ (১৩৩৫)
যাত্রী—ভ্রমণ ১৯২৯ (১৩৩৬)
পরিত্রাণ ও তপতী—নাটক ১৯২৯ (১৩৩৫-৩৬)
যোগাযোগ—উপন্যাস ১৯২৯ (১৩৩৬)
শেষের কবিতা—উপন্যাস ১৩২৯ (১৩৩৬)
মহুয়া—কাব্য ১৯২৯ (১৩৩৬)
ভানুসিংহের পত্রাবলী—পত্র ১৯২৯ (১৩৩৬)
নবীন—গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৭)
রাশিয়ার চিঠি—ভ্রমণ ১৯৩১ (১৩৩৮)
বনবাণী—কাব্য ১৯৩১ (১৩৩৮)
গীতবিতান—গীতসংকলন ১৯৩১ (১৩৩৮)
শাপমোচন—গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৮)
সঞ্চয়িতা—কাব্যসংকলন ১৯৩১ (১৩৩৮)
পরিশেষ—কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯)
কালের যাত্রা—নাটক ১৯৩২ (১৩৩৯)

পুনশ্চ—কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯)
দুইবোন—উপন্যাস ১৯৩৩ (১৩৩৯)
মানুষের ধর্ম—প্রবন্ধ ১৯৩৩ (১৩৪০)
বিচিত্রিতা—কাব্য ১৯৩৩ (১৩৪০)
চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী—নাটক ১৯৩৩ (১৩৪০)
ভারতপথিক রামমোহন রায়—প্রবন্ধ ১৯৩৩-৩৪ (১৩৪০)
মালঞ্চ—উপন্যাস ১৯৩৪ (১৩৪০)
শ্রাবণগাথা—গীতিনাট্য ১৯৩৪ (১৩৪১)
চার অধ্যায়—উপন্যাস ১৯৩৪ (১৩৪১)
শেষ সপ্তক—কাব্য ১৯৩৫ (১৩৪২)
সুর ও সংগতি—পত্রপ্রবন্ধ ১৯৩৫ (১৩৪২)
বীথিকা—কাব্য ১৯৩৫ (১৩৪২)
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৬ (১৩৪২)
পত্রপুট—কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩)
ছন্দ—প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
জাপানে-পারস্যে—ভ্রমণ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
শ্যামলী—কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩)
সাহিত্যের পথে—প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
খাপছাড়া—ছড়া ১৯৩৭ (১৩৪৩)
কালান্তর—প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪)
সে—গল্প ১৯৩৭ (১৩৪৪)
ছড়ার ছবি—কাব্য ১৯৩৭ (১৩৪৪)
বিশ্বপরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪)
প্রান্তিক—কাব্য ১৯৩৮ (১৩৪৪)
চণ্ডালিকা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৮ (১৩৪৪)
পথে ও পথের প্রান্তে—ভ্রমণ ১৯৩৮ (১৩৪৫)
প্রহাসিনী ও সেঁজুতি—কাব্য ১৯৩৮-৩৯ (১৩৪৫)
বাঙলাভাষা-পরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৩৮ (১৩৪৫)
আকাশপ্রদীপ—কাব্য ১৯৩৯ (১৩৪৬)
শ্যামা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৯ (১৩৪৬)
পথের সঞ্চয়—ভ্রমণ ১৯৩৯ (১৩৪৬)

নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়—কাব্য ১৯৪০ (১৩৪৭)
আরোগ্য—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৭)
ছেলেবেলা—আত্মস্মৃতি ১৯৪০ (১৩৪৭)
তিনসঙ্গী—ছোটগল্প ১৯৪০ (১৩৪৭)
জন্মদিনে—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৮)
গল্পসল্প—গল্প ১৯৪১ (১৩৪৮)
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, সভ্যতার সংকট—প্রবন্ধ ১৯৪১ (১৩৪৮)

ইংরেজি প্রকাশনা

Tagore for You—Anthology ১৯৬৬ (১৩৭৩)

Angel of Surplus—Anthology ১৯৭৮ (১৩৭৫)

বিষয়-নির্বিশেষে প্রথম প্রকাশের কাল-অনুক্রমে তালিকাবদ্ধ এই গ্রন্থপঞ্জীতে পুনর্মুদ্রণের সময়ে পরিবর্তিত, পূর্বে খণ্ড খণ্ড আকারে কিন্তু পরে একত্রে সংকলিত বা একাধিক গ্রন্থের সংযোজনে নূতন নামে সৃষ্ট কোনো গ্রন্থ ধরা হয় নাই। ছোটখাট মুদ্রিত ভাষণ ইত্যাদিও যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ১৫শ খণ্ড ২৪১ হইতে ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের তালিকা'র সাহায্যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়াংশ এবং রবীন্দ্রভবন মিউজিয়ম-এর ডেপুটি কিউরেটর ড. গৌরচন্দ্র সাহা সংকলিত তথ্যাদি অবলম্বনে প্রণীত।

নির্ঘণ্ট

॥ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ক ॥

॥ সাহিত্য : সংস্কৃতি ও সমালোচনা বিষয়ক ॥

বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি	ড. ক্ষুদিরাম দাস	২৫·০০
কি লিখি ?	যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি	১০·০০
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা	ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫·০০
বাংলা সাহিত্যের কথা	ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস	ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২০·০০
বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়	কবিশেখর কালিদাস রায়	২৫·০০
ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি	অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	১০·০০
সংস্কৃতির রূপান্তর	অধ্যাপক গোপাল হালদার	২৫·০০
বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১০·০০
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমালোচনা	শিবানন্দ	১০·০০
নানা-রকম	অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী	১০·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা	রতনমণি চট্টোপাধ্যায়	১০·০০
শক্তিগীতি পদাবলী	ড. অরুণকুমার বসু	১৫·০০
বাংলার বাউল ও বাউল গান	ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৫০·০০
মহামতি বিদুর	ম. ম. যোগেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্য বেদান্ততীর্থ	১০·০০

॥ জীবনী ও আত্মজীবনী বিষয়ক ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন	রোমাঁ রোলাঁ	১৫·০০
বিবেকানন্দের জীবন	রোমাঁ রোলাঁ	১৫·০০
মহাত্মা গান্ধী	রোমাঁ রোলাঁ	৫·০০
আত্মচরিত	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩০·০০
আত্মচরিত	ঋষি রাজনারায়ণ বসু	১০·০০
সংক্ষিপ্ত আত্মকথা	মহাত্মা গান্ধী	৫·০০
গান্ধী চরিত	ঋষি দাস	১০·০০
মহাত্মা গান্ধী	প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১৬·০০
শ্রীঅরবিন্দের জীবন কথা	প্রমদারঞ্জন ঘোষ	২০·০০
মনীষী জীবন কথা	সুশীল রায়	২০·০০
বার্ণার্ড শ'	ঋষি দাস	১০·০০
লোকমান্য তিলক	ঋষি দাস	৫·০০